১

বটতলার বই

১

বটতলার বই

উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য কুড়িটি বই

অদ্রীশ বিশ্বাস
সম্পাদিত

গাঙচিল

BATTALAR BOI - 1
edited by Adris Biswas

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রক
বর্ণনা ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা ৭০০ ০৩২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

শ্রীশেখর সমাদ্দারকে

সূচি

নিবেদন

সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চার ব্যাপারে ইদানীং একটা ঢেউ এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাবৎ জনপ্রিয় সংস্কৃতি বা পপুলার কালচাব সম্পর্কে উচ্চবর্গীয় মানুষদের একটা উদাসীনতা ছিল, অবজ্ঞা ছিল। তার ফলে ওই সব পপুলার-এর বহু কিছুই সংরক্ষিত হয়নি, আলোচনা তো দূরের কথা। নতুন ধরনের জ্ঞানচর্চা অন্য একটা সমাজের ছবি তুলে আনার জন্য এই জনপ্রিয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। সেখান থেকেই উঠে এসেছে আজকের পৃথিবীর একাধিক নামি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তাত্ত্বিকদের পপুলার কালচারের থিওরি। কখনও সংখ্যালঘু 'অপর'-কে চেনার জন্য, কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে জানার জন্য এই জনপ্রিয়তার তত্ত্ব যাবতীয় জনপ্রিয় চিহ্নকে আজ বিবেচনা করতে বাধ্য করাচ্ছে।

একই ঘটনা ঘটেছে বাংলা ভাষাতেও। উনিশ শতকে নগরায়ণের পর নতুন যে লক্ষণগুলো দেখা গিয়েছিল— শিক্ষার প্রসার, পাঠাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি, ছাপাখানার বিস্তার আর সেই সূত্রে গড়ে ওঠা প্রচুর ছোট-বড় নানা ধরনের বই, যাব একাংশ বটতলার বই নামে বিখ্যাত, আর সেই সব বই সম্পর্কে মেইনস্ট্রিমের প্রায় দুশো বছর ধরে চলে আসা এক ধরনের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। প্রধান-অপ্রধান অধিকাংশ গ্রন্থাগারে এগুলো রাখাই হত না। যেখানে ছিল, যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ছিন্ন মলিন পৃষ্ঠাহীন বাঁধাইহীন কীটদষ্ট ঝুরঝুরে। এখন সেগুলোর প্রতি আগ্রহের দৃষ্টি পড়ায় দেখা যাচ্ছে অনেকাংশই সংরক্ষণের অনুপযুক্ত। বটতলার বই যেগুলো বের হত, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছিল মোটাসোটা, ছবি সংবলিত, বোর্ড বাঁধাই। এগুলোর শক্তপোক্ত বইয়ের মতো দেখতে অবস্থার কারণে তবু কোথায়ও বা সংবক্ষণের জন্য কনসিডার করা হয়েছিল, কিন্তু আর এক ধরনের বই ছিল ষোল-আঠেরো-চব্বিশ পৃষ্ঠার পাতলা ছোট আকৃতির, পিন কিংবা সুতো বাঁধাই করা, পাতলা রঙিন কাগজের মলাটওয়ালা, সেগুলোকে এই ক্ষীণ চেহারার কারণে সংরক্ষণই করা হয়নি। বাঙালি সমাজ থেকে প্রায় পুরোটাই হারিয়ে গেছে। অথচ টিপিক্যাল বটতলার বই বলতে এগুলোকেই বোঝাতো। নানা সামাজিক বিষয়ে সামান্য ওই ক'টা পাতার মধ্যেই চেনা-অচেনা লেখক তাঁদের খেলা দেখাতেন।

কখনও প্রহসন কখনও পাঁচালি কখনও পদ্য কখনও গদ্য কখনও চম্পূতে নকশা লিখে উনিশ শতকের আমজনতার মন জয় করে নিয়েছিলেন। হাজার হাজার কপি বিক্রির ফলে একটা নতুন 'বাজার' দেখতে পেল ব্যবসায়ীরা। আজকে এই সমস্ত লক্ষণ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হচ্ছে। অথচ প্রায় কোথায়ও সংরক্ষিত নেই ওই সব পাতলা টিপিক্যাল বটতলার বই বা উনিশ শতকের সামাজিক নিদর্শনগুলো।

জনপ্রিয় সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজে চার্লস ওয়ালেস ফেলোশিপ নিয়ে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ বটতলার বইয়ের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছি। এই ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। প্রতি খণ্ডে কুড়িটা, দু-খণ্ডে চল্লিশটা বটতলার বই এক সঙ্গে তুলে দেওয়া গেল। এত বড় বটতলার সংগ্রহ এর আগে সম্ভবত আর কখনও বের হয়নি। এর ফলে নিশ্চয় একটা বড় অংশ হারিয়ে যাওয়ার আগে বেঁচে গেল। সেকালের নানা ধরনের সামাজিক লক্ষণ ও জনপ্রিয় বিষয়ের নমুনাগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে উনিশ শতকের জনপ্রিয় মানসিকতার হদিশ পাওয়া যাবে। মানুষ কী পছন্দ করত, কী বিষয়ে কোন ধরনের যুক্তি দিত, কী পছন্দ করত না, তার একটা ছবি মিলবে আজকের পাঠক-গবেষকদের কাছে। পুরনো বানান, বানান ভুল এবং সেকালের বাক্-রীতিসহ যে ভাবে বেরিয়েছিল, একালের পাঠকদের কাছে সে ভাবেই হাজির করা হল। প্রত্যেকটা বইয়ের প্রচ্ছদের নীচে তৃতীয় বন্ধনীতে প্রথম প্রকাশকাল খ্রিস্টাব্দ অনুসারে উল্লেখ করা হল সম্পাদকীয় সংযোজন হিসাবে। আব জনপ্রিয় সাহিত্য ও বটতলার আইডেনটিটি বিষয়ে দীর্ঘ একটা ভূমিকা রইল গোটা পরিস্থিতিটা খানিকটা তুলে ধরার জন্য।

এই সংকলনের সংগ্রহের ব্যাপারে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করেছেন মৌ ভট্টাচার্য। বিপুল গুহ যত্নে ও আনন্দের সঙ্গে প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশাল আর্থিক ব্যয়ভার সত্ত্বেও অণিমা ও অধীর বিশ্বাস প্রকৃত বই-প্রেমিকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দু-খণ্ড প্রকাশ করতে। হরফবিন্যাস করেছেন অমল দত্ত। এঁদের প্রত্যেককে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এক সঙ্গে চল্লিশটা বটতলার সংগ্রহ বের হওয়া নিশ্চয় ঐতিহাসিক ঘটনা, পাঠকদের সমাদর পেলে সেই ঘটনা সার্থক হবে।

অদ্রীশ বিশ্বাস

ভূমিকা

জনপ্রিয় সাহিত্যের বাংলা ভাষার উত্থান বটতলাকে ঘিরে। সস্তা দামে, অনেক সময় দুর্বল প্রোডাকশন বা সস্তার প্রোডাকশনে খ্যাত-অখ্যাত লেখকরা তাঁদের সেল্ফ আইডেনটিটিকে সোসাল আইডেনটিটির সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আজ যাকে আমরা 'বাজার' বলি, উনিশ শতকের সেই বাজারে এল সেল্ফ আর সোসালের এক আশ্চর্য টেক্স— বটতলা। 'আশ্চর্য' এই জন্যই বলা হচ্ছে, সেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আদি যুগে আমাদের সাহিত্যের দুটি ধারা— 'উচ্চ' নন্দনতত্ত্ব মান্যকারি এবং 'অপর' নন্দনতত্ত্ব মান্যকারি হিসেবে যে পথ ধরেছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি বটতলার সূত্রে একটা বিরাট জনমনকে স্পর্শ করল। নব্যশিক্ষিত বাঙালির পাঠাকাঙ্ক্ষাকে মদত জোগাতে— উচ্চ ও অপরের যে জোগান শুরু হয়েছিল কলকাতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট জনপদগুলিতে, তার সেই 'জোগান'-এর উপভোক্তা রূপে কলকাতা ও শহরতলিতে গড়ে ওঠা বাঙালি সমাজ— যারা ইংরেজদের প্রয়োজনে গড়ে তোলা অফিস-কাছারিতে চাকরি করে, নানা ধরনের ব্যবসা ও ছোট ছোট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অথবা জমিদার-পত্তনিদার-ভূস্বামীর কাছে কাজকর্ম, চাষাবাদ, বিক্রিবাট্টার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ যারা ছিল এদেশের নিজস্ব ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তারা এবং যারা আস্তে আস্তে আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ প্রয়োজনের দিকে যাচ্ছিল, আর যারা সচেতন ভাবে বা বাধ্য হয়ে এই ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে গ্রহণ করল, মান্য করতে বাধ্য হল— যাদের ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং বিদেশি শাসন সম্পৃক্ত অফিস-কাছারিতে কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য করে, তারা সকলেই হঠাৎ করে পড়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঢুকে গেল। এর কারণ, বাঙালির চিরকালের নানা জিনিস সম্পর্কে অত্যুৎসাহ— সে জানতে চেয়েছে চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় কিংবা বাজারহাটের সভাসমিতিতে, বৈঠকখানার আলোচনায়, মঠমন্দিরে, ঘরগৃহস্থালিতে, প্রতিবেশী সম্পর্কে, বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে, সমাজের ভালমন্দ, কেচ্ছাকাহিনি সম্পর্কে, যা তার

আকাঙ্ক্ষার স্পেসকে অপরের স্পেসের সঙ্গে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে আদান-প্রদান করবে। ভারতীয়দের মধ্যে এটা বাঙালিদের বিশেষ ভাবে ছিল। এই দেওয়ালে আড়ি পাতা থেকে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ, এক কথায় যাকে বলে মতামত দান— নানা বিষয়ে নানা রকম মতামত দানে তার আগ্রহ বহুকালের। এতদিন যখন ছাপাখানা ছিল না তখন তার অবলম্বন ছিল ওরাল বা মৌখিক ভাবে মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। যখন ছাপাখানা এল তখন সেই সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের স্পেসটা আরও বেশি এককের হয়ে উঠতে পারল। যে কেউ ছাপানো বই একা বসে যখন খুশি পড়তে পারে— তার জন্য তাকে *পাবলিক* হতে হচ্ছে না, *প্রাইভেট* হয়েই সম্ভব হচ্ছে— অথচ সে জানতে চাইছে একটা পাবলিক থিওরি— তার অনুষঙ্গ হয়তো *প্রাইভেট*। ছাপানো বই এই সব সুযোগ দিল— বিশেষত সেলফের সঙ্গে প্রাইভেট-পাবলিকের দেওয়া-নেওয়া, যাকে যে কোনও নব্যশিক্ষিত বাঙালি বলবে পাঠাধিকার। এই সামাজিক ধরন-ধারণ কেচ্ছাকাহিনি উচিত-অনুচিতের সঙ্গে এল পাঠাধিকারের নতুন স্পেস— আমি বই কিনব, পড়ব, জানব— এটা আমি চাইলেই করতে পারি। কারণ বই ছাপা হচ্ছে হাজার হাজার। যখন খুশি কিনে যখন খুশি পড়তে পারি, ভালমন্দ রিঅ্যাক্ট করতে পারি। এই মানসিকতাটাই সমস্ত ধরনের বাঙালির মধ্যে বই পড়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল। সবাই যে বই পড়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হতে চেয়েছিল তা না, বরং অধিকাংশেই তা চায়নি। চায়নি বলেই, তাদের পাঠাকাঙ্ক্ষাটির দিকে তাকালে আজ আমরা সেকালের বিরাট জনমানসের আকাঙ্ক্ষাটা চিনতে পারি। কোনও থিওরিটিক্যাল জায়গা থেকে এটা আসেনি, প্র্যাকটিকাল জায়গা থেকে এসেছে— তারা যা চেয়েছে। ফলে, ডিসায়ারের দিকটাও বোঝা যায়— উচ্চ-নীচ নন্দনতত্ত্বের লড়াই, শ্রেণি অবস্থানের সূত্রেই যে সব সময় গড়ে উঠছে তা নয়, পাঠ অবস্থান আলাদা একটা শ্রেণি যেন গড়ে তুলছে— পাঠক হিসাবে সে কী পড়তে চায় বা চায় না, তার উচ্চ-নীচ সংক্রান্ত চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক ধারণা, যা অনেকে স্বীকার করেন না, কেবল শ্রেণি অবস্থান থেকে বুঝতে চান। ছাপাখানা গড়ে ওঠার ফলে যে শিক্ষা ও পড়ার আগ্রহ, যা নিজেদের ভেতর নতুন স্তর ভেদ তৈরি করেছিল— কোথায় পড়েছে, কী পড়েছে, কতটা পড়েছে, কী শিখেছে, কী মনে করছে, কী বুঝেছে, অনুধাবনের পর তার অবস্থান কোথায়— অর্থাৎ পড়ল বলে এটা হল, না পড়লে হত না। বড়লোক-গরিব নয়, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নয়, শিক্ষার অন্তর্গত

স্তরভেদ, যা আমাদের কাছে এই বিরাট জনগণ বা জনমনকে নতুন ভাবে হাজির করল। উনিশ শতকের বাঙালির সেই নতুন শ্রেণিটাই যেমন মেইনস্ট্রিম জ্ঞান-আধিপত্য তৈরি করল আবার অলটারনেটিভ জ্ঞান পরিসরও নির্মাণ করল। বটতলার সূত্রে আমরা সেই জনপ্রিয় সাহিত্যের নব্যউত্থিত চিহ্নগুলোকে চিনতে পারি। দেখা যাক, বটতলার উত্থান কীভাবে ঘটেছে এবং সেই চিহ্নের ভেতর কোন ইঙ্গিত বা বার্তা লুকিয়ে রয়েছে।

১. বটতলার উত্থান

কলকাতায় উনিশ শতকের প্রথম পর্বেই একাধিক ছাপাখানার অস্তিত্ব নিয়ে শহরবাসীর কৌতুক ও কৌতূহল দেখা গেছে। ছাপার যন্ত্র দেখে মদনবাটিতে স্থানীয় দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ পিয়ার্স কেরি তাঁর কেরিজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২ খণ্ড)-এ জানিয়েছেন সেই সব কৌতূহলী দর্শক ছাপাখানাটিকে বলতে লাগল 'সাহেবদের ঠাকুর'। তা দেখে ভারতীয়রাও মাথা নোয়াতে লাগল। সেই ছাপাখানাই কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালির অত্যন্ত লাভের ব্যবসায় পরিণত হল। খিদিরপুরে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃত যন্ত্র'-এর মালিক বাবুরাম আর লল্লু। বাবুরাম ব্রাহ্মণ, মির্জাপুরের বাসিন্দা। সরকারি প্রেসের সুপারিনটেনডেন্ট ১৮০০ সাল নাগাদ উইলিয়াম কেরিকে একটা চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, কলকাতার ছাপাখানাগুলোয় মালিকরা দু-হাতে টাকা রোজগার করছেন। তাঁদের কারও কারও আয় কাউন্সিলের মেম্বারদের আয়ের সমান। (ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮০৫)। বাবুরামও নাকি ছাপাখানার দৌলতে ক'বছরের মধ্যে কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এদেশীয় মুদ্রক, যিনি নামপত্র প্রথমে ছাপতেন, বাকিরা শেষে ছাপতেন চিরাচরিত পুঁথির অনুকরণে। বাবুরাম বিদেশি বই অনুসরণে সামনে দিতে লাগলেন। এরকম নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি বিখ্যাত। আর তা না করে উপায় কী— একাধিক প্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা অর্থ উপার্জনের ফন্দি-ফিকিরে এসব করতেই হত। এই অর্থ উপার্জন যে 'বাজার' তৈরি করছে বা বাণিজ্য তৈরি করছে তাতে আকৃষ্ট হয়ে শুধু বড়লোকদের প্রেস নয়, স্বল্পবিত্ত মানুষদের প্রেসও বসে গেল। তাঁরা ছাপাচ্ছেন, তাঁদের বই স্বল্পবিত্ত মানুষদের পাঠাকাঙ্ক্ষা মেটাতে বিক্রিও হচ্ছে দেদার। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে বটতলা। চাহিদার উপর দাঁড়িয়ে বাঙালির অলটারনেটিভ

বাজার— যা গ্রাস করে নেয় অচিরেই গোটা বাংলাকে।

সুকুমার সেন 'বটতলার বই' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি কাল আগে শোভাবাজার কালাখানা অঞ্চলে একটা বড় বনস্পতি ছিল। সেই বটগাছের শানবাঁধানো তলায় তখনকার পুরবাসীদের অনেক কাজ চলত। বসে বিশ্রাম নেওয়া হত। আড্ডা দেওয়া হত। গানবাজনা হত। বইয়ের পসরাও বসত। অনুমান হয় এই বই ছিল বিশ্বনাথ দেবের ছাপা। ইনিই বটতলা অঞ্চলে এবং সেকালের উত্তর কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা খুলেছিলেন। বহুকাল পর্যন্ত এই 'বান্ধা বটতলা' উত্তর কলকাতার পুস্তক প্রকাশকদের ঠিকানা চালু ছিল।'[১] ১৮১৮ সাল নাগাদ বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাই বটতলার প্রথম ছাপাখানা। তখন কলকাতায় বাংলা ছাপার জন্য আরও পাঁচটা প্রেস ছিল— মিশন রো-এ গভর্নমেন্ট গেজেট প্রেস, বৌবাজারে ফেরিস কোম্পানির প্রেস, লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের বাঙালি প্রেস এবং পটলডাঙায় লল্লু লালের সংস্কৃত প্রেস। লং সাহেব[২] লিখেছেন, ১৮২১ সালে কলকাতায় চারটে প্রেস ছিল যা দেশীয় লোকের হাতে বাংলা ছাপা হত— হিন্দুস্থানী প্রেস, বাঙালি প্রেস, সংস্কৃত প্রেস ও বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। বিশ্বনাথ দেব নানা ধরনের বই ছাপতেন— বিদ্যালয় পাঠ্য গণিত (১৮১৮) থেকে রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণের চণ্ডী' (১৮২৩)।

মানুষের মধ্যে ক্রমশ পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। ১৮৩০ সালের 'সমাচার দর্পণ' লিখছে, 'এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাংলা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ষোল বৎসরাধিক হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়, যে অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপার কার্যের এমন উন্নতি হইয়াছে।' এই আগ্রহের কারণ বাঙালির পাঠআগ্রহের যে মানসিকতার কথা আমরা বলেছি তা যেমন সত্য, তার সঙ্গে সত্য ব্যবসাও। যদি ব্যবসায়িক ভাবে এই প্রেসগুলো না চলত, না মুনাফা দিত, তাহলে উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের এই রমরমা দেখা যেত না। সেই রমরমার পেছনে গুটিকয় অভিজাত শিক্ষিত রুচিবান পরিবার বা তাঁদের পাঠ গ্রহণের ইচ্ছা একমাত্র সত্য নয়, বরং অনেক বেশি সত্য আপামর জনসাধারণ, যাকে বলে আমজনতা, তাঁদের পাঠ-ইচ্ছা। যার দৌলতে বটতলা গড়ে উঠেছিল।

কোথায় কোথায় বটতলা গড়ে উঠেছিল— সুকুমার সেন লিখছেন, 'ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য ছোট সস্তার প্রেস গড়ে ওঠে— যার চৌহদ্দি ছিল দক্ষিণে

বিডন স্ট্রিট ও নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড, উত্তরে শ্যামবাজার স্ট্রিট এবং পূর্বে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট।... কলকাতায় সস্তা ছাপাখানার স্বর্ণযুগ বা রমরমা ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। তবে সস্তার প্রেস যে কেবলমাত্র শোভাবাজার-চিৎপুরে যেখানে একদা এক বৃহৎ বটবৃক্ষকে কেন্দ্র করে প্রকাশনা ব্যবসা গড়ে উঠেছিল এবং সেই অঞ্চলেই যে বইবাজারও সীমায়িত ছিল সে কথা ভাবলে ভুল হবে। সত্যি কথা বলতে কী, সস্তার ছাপাখানা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল: কুমারটুলি, শোভাবাজার, বালাখানা, আহিরীটোলা, দর্জিপাড়া, গরাণহাটা, হোগলকুঁড়ে, সিমলে, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান, বড়বাজার, আমড়াতলা, শিয়ালদহ, কসাইটোলা (কসিটোলা), কলুটোলা, চুনাগলি, মিশ্রিগঞ্জ, জান (জন) বাজার, ট্যাঙ্ক স্কোয়ার (ডালহৌসি স্কোয়ার), সেকরাপাড়া, ইটিলি। বস্তুত শহরের উত্তরপূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলে যেখানেই দেশীয় লোকদের বাস এবং কারবার ছিল সে সব জায়গাতেই এই ধরনের প্রেস ছিল।'[৩]

এই 'দেশীয় লোকেদের বাস এবং কারবার' তথ্যটিকে আমরা বলতে চাই— নগরায়ণ, যা সুকুমার সেন বলেননি, তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল বটতলার জাগরণ। যেখানেই নগরায়ণের সুযোগ ঘটেছে সেখানেই বাইরে থেকে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। নানা ধরনের কাজকর্মের প্রয়োজনে, যা নগরায়ণের অংশ বা অঙ্গাঙ্গী। সেখানে গ্রাম থেকে যেমন লোক গেছে, এই নগরাঞ্চলের আদি লোকজনরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাদের সকলে মিলেমিশে একটা নতুন ধরনের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিচ্ছে— তাতে গ্রামীণ মানসিকতা আছে আবার নাগরিক বৈশিষ্ট্যও আছে। ফলে বটতলা গড়ে ওঠার সঙ্গে সেই মিশ্র আইডেনটিটির প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাওয়া গেছে। সেটা স্বাভাবিক কিন্তু নতুন— যেহেতু পাশ্চাত্য অর্থে নাগরিকতার প্রচলন এর আগে ঘটেনি, এই নতুনতর নাগরিকতার চাহিদা মেনে বটতলার উত্থান। আধুনিকতার সঙ্গে এটা যতটা সম্পর্কিত নয়, ততটাই নাগরিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিকতার তথাকথিত আলোকায়নকে বরং সে অনেক সময় চ্যালেঞ্জ করেছে। ভারতীয় থাকার চেষ্টা করেছে যা আমরা পরে জায়গামতো আলোচনা করব। বটতলার সূত্রে পাওয়া নাগরিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেস ও প্রকাশকের ঠিকানায়— নামপত্রে ও প্রচ্ছদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা করে বড় হরফে 'কলিকাতা' লেখা। অনেক সময় বই সংগ্রহের ঠিকানা হিসাবে কিংবা ছাপাখানার ঠিকানা হিসাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

'কলিকাতা' শহরের যোগ জানানোর চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, 'জৈগুণের পুঁথি'তে লেখা— 'চিৎপুর রোড আছে সর্বলোকে জানে। দুই শত ছয়চল্লিশ নম্বর ভবনে। তার সঙ্গে বিদ্যারত্ন যন্ত্র পরিষ্কার। গোলাম তিতুর যায় প্রেশী জমাদ্দার। সেই প্রেশে এই পুথি সংশোধন দ্বারে। মুদ্দাঙ্কিত হৈল পুনঃ উত্তম অক্ষরে। আবশ্যক হবে যার আসিবে হেথায়। লয়ে যাবে ভক্তিভাবে মজিবে মজায়।।'[৪] এই নির্দেশের উপরে বড় টাইপে 'কলিকাতা'। মজায় মজার জন্য মজার শহর কলিকাতার একটা চেহারা নানা ধরনের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস', কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ইত্যাদির সূত্র ধরে। গ্রাম, আধা মফঃস্বল কিংবা শহরের মধ্যে থাকা উৎসাহী পাঠক— যারা সেই মজার কলিকাতার রঙ্গরস আদি চমৎকৃতকারী তথ্য ও আনন্দের ভাগ চায়— তাদের সেই আগ্রহটা কিন্তু নাগরিক নতুন দৃষ্টান্তের প্রতি, যার সঙ্গে যুক্ত আধুনিকতা— তবে মূলত নাগরিকতা, তার সমাজ, মানুষজনের অদলবদল, যা তারা গ্রাম-মফঃস্বলে দেখে না, পুরনো কলকাতায় যখন তথাকথিত নগরায়ণ শুরু হয়নি, তখনও দেখেনি— তারা সেই নাগরিক আমোদটা পেতে চায়— তার জন্যই এই বটতলার উত্থান আর বটতলার বইতে সেই কলিকাতার সোচ্চার অবস্থান। কলকাতায় ছাপানো বইয়ের প্রতি লেখকদেরও দুর্বলতা ছিল, সেই দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ত বহু বইয়ের নামপত্রে। যেমন, শ্রীতাজদ্দিন মহাম্মদ 'হালতন্নবি' বইয়ের নামপত্রে লিখেছেন— 'কলিকাতা হরিহর প্রেস প্রথমবার ছাপাইলাম। চিতপুর রোড বটতলা ১১৮ নং ভবন। সন ১২৮০ সাল।'[৫] অথবা 'দেবীযুদ্ধ' (১২৮৩) গ্রন্থের নামপত্র জুড়ে বহু তথ্য দেওয়া, তার মধ্যে 'কলিকাতা' সবচেয়ে বড় হরফে লিখে— 'শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা আপার চিৎপুর রোড শোভাবাজার ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত' জানিয়ে দেওয়া। কখনও ইংরেজি নামপত্রে একই কায়দায় বড় হরফে 'Calcutta' লেখা। লেখক-পাঠক-প্রকাশক-মুদ্রকদের মধ্যে এই ভাবেই গড়ে ওঠা নতুন নগরজীবন ও তাদের বিচিত্রতার প্রতি হাতছানি বা আকর্ষণ যে এর পেছনে লুকিয়ে ছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। যখন বর্ধমানে ছাপা হচ্ছে অথবা ঢাকাতে, তখনও একই কায়দা— তবে হরফ সবচেয়ে বড় দেখা যাচ্ছে কলকাতার ক্ষেত্রে। নগরগুলির প্রতি টান যেমন, কলকাতার প্রতি টান তার চেয়ে বেশি। কলকাতার বটতলা তাই আলাদা বার্তা বহন করছিল জনমানসে, জনপ্রিয়তার চাহিদায়। বৃহত্তর জনগণের অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে

উসকে দিচ্ছিল এই নাগরিক হাতছানি, যার শব্দে যাবতীয় অপ্রাপ্তির মন যেন পরিতৃপ্ত হচ্ছিল, 'কলিকাতা' উচ্চারণে পাঠকের সামাজিক নাগরিক দৌরাত্মকে গ্রহণ করে।

২. 'বাজার'-এর উত্থানে বটতলার ভূমিকা

'কলিকাতা' নগরকে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নতুন ভাবে একটা 'বাজার'কে হাজির করেছিল বটতলা। শুধু বটতলা নয়, উনিশ শতকের বই ব্যবসায় নানা ধরনের বই বের হওয়া এবং উচ্চশিক্ষিত থেকে নব্যশিক্ষিত বাঙালির চাহিদা মেটাতে সেই সব বিচিত্র বিষয়ের বই বাণিজ্যিক সাফল্যও অর্জন করেছিল। আশিস খাস্তগির লিখেছেন, 'লেখক বই লিখছেন আর সে বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে, এমনটি উনিশ শতকের আগে ভাবা যায়নি।'[৬] যখন ভাবা গেল, তখন তার সাফল্য বটতলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটা শীর্ষ স্পর্শ করেছিল, যার হিসাব দেখলে আন্দাজ করা যাবে কতটা বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছিল বটতলা সংশ্লিষ্ট বই ব্যবসা—

১৮০১-৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বই প্রকাশের বার্ষিক হার:

	১৮০১-১৭	১৮১৮-৪৩	১৮৪৪-৫২
ইতিহাস	০.৫৩	১.৮৮	৫.৪৪
জীবনী	০.২৩	০.৭৭	১.০০
ধ্রুপদী গল্প	০	০.৩৮	২.৬৭
কাহিনি	০.০৬	১.১১	২.৪৪
গদ্য	০.০৬	১.৩৮	২.৬৭
পদ্য	০.১৮	১.১৫	৭.২২
নীতিকথা	১.০০	৩.১৫	৫.৬৭
পুরাণকথা	৪.৫৩	৬.১১	১৬.৭৮
বৈদিক	০.৪১	২.১১	১০.৬৭
বৈষ্ণব	০.১২	০.৭৭	৫.৭৮
খ্রিস্টান	০.৮৮	৬.৫০	১০.৫৫
মুসলমানি	০.৩৫	০.২৭	২.৬৭
ডাক্তারি	০	০.৫৪	২.০০
সাধারণ বিজ্ঞান	০.১২	৩.৯২	৬.৩৩

আইন	০.১২	২.৬৫	৪.৭৮
ভূগোল	০	০.৫৪	০.৮৯
অভিধান ও ব্যাকরণ	১.৬৫	৬.০৪	৯.৮৯
মোট	১০.২৪	৩৯.৩১	৯১.৮৯

সূত্র: যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য[৭]

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮১৭ সালে মোট বই প্রকাশের হার ১০.২৪ শতাংশ, ১৮৪৩ সালে সেটা ৩৯.৩১ শতাংশ এবং ১৮৫২ সালে ৯১.৮৯ শতাংশ। অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে বই প্রকাশের হার বেড়েছে নয় গুণ। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, বই প্রকাশনের ওই প্রথম পর্যায়ে বাজারের এই সাফল্য দেখে নিশ্চয় অনুমান করা যায় এটা কেবলমাত্র উচ্চবর্গের বই কেনার মধ্যে দিয়ে সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও বই কেনার মধ্যে দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছিল।

'বাজার' গড়ে ওঠার সমর্থন মেলে রেভারেন্ড জেমস লং-এর দেওয়া হিসাব থেকেও। সেখানে ধরা পড়েছে এক বছরে বিক্রি হওয়া বইয়ের বিপুল সংখ্যার হিসাব—

১৮৫৭ সালে বিক্রি হওয়া বইয়ের হিসাব:

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা	বিক্রির সংখ্যা
পঞ্জিকা	১৯	১৩৬,০০০
জীবনী ও ইতিহাস	১৫	২০,১৫০
খ্রিস্টান	৮	৯,৫৫০
নাটক	৮	৫,২৫০
শিক্ষা	৪৬	১৪৫,৩০০
যৌনতা	১৩	১৪,২৫০
কাহিনি	২৮	৩৩,০৫০
আইন	৫	৪,০০০
বিবিধ	১২	১৮,৩৭০
পুরাণ ও হিন্দুধর্ম	৮৫	৯৬,১৫০
নীতিকথা	১৯	৩৯,৭০০
মুসলমান	২৩	২৪,৬০০

সাধারণ বিজ্ঞান	৯	১২,২৫০
সংবাদপত্র	৬	২,৯৫০
সাময়িকপত্র	১২	৮,০০০
সংস্কৃত	১৪	১৫,০০০
মোট	৩২২	৫৭১,৬৭০

সূত্র: জেমস লং[৮]

আর একটি হিসাব থেকেও জানা যাচ্ছে বইয়ের বার্ষিক প্রকাশ সংখ্যা এবং পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণের সংখ্যা। চাহিদার জায়গাটা কেমন ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে এই সংস্করণের তালিকা দেখে। ফলে 'বাজার' গড়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যে এই ধরনের চাহিদার সারণি অনায়াসে বুঝিয়ে দেয় কোন বিষয়ে বাঙালির পড়ার আগ্রহ কীভাবে উনিশ শতকের বই-সংস্কৃতিতে একটা ভিন্ন ধারণা স্থাপন করতে পেরেছিল। সে ভিন্ন ধারণা হল, বই কোনও 'পবিত্র' অবাণিজ্যিক উপাদান নয়, পণ্য হিসাবে লাভজনক অত্যন্ত 'বাজার'-সার্থক উপাদান।

১৮৫৩ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে বই প্রকাশ ও সংস্করণের হিসাব:

সাল	নতুন বই	পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ	মোট
১৮৫৩	১১৬	৪৭	১৬৩
১৮৫৪	১১৯	৪৯	১৬৮
১৮৫৫	১০৬	৮৩	১৮৯
১৮৫৬	৭১	৫৫	১২৬
১৮৫৭	২৪০	৫১	২৯১
১৮৫৮	৯৪	৬৪	১৫৮
১৮৫৯	১১৬	৪৪	১৬০
১৮৬০	১০৭	৬৯	১৭৬
১৮৬১	১৩২	৭০	২০২
১৮৬২	১৭২	৮৫	২৫৭
১৮৬৩	২৪৪	৯৭	৩৪১
১৮৬৪	১৬০	৮৪	২৪৪
১৮৬৫	২১৯	১৮৫	৪০৪

১৮৬৬	৯৫	৬৭	১৬২
১৮৬৭	১৭৭	১১৪	২৯১

সূত্র: যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য[৯]

'বাজার' যখন গড়ে ওঠে তখন তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। শুধু বাজারের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যাবে, যে জিনিসের চাহিদা আপামর জনসাধারণের মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং বিক্রির ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতা আছে, সেটা এক সঙ্গে অনেকগুলো দোকান কিংবা নির্মাতারা অবস্থান করবে, যাতে ক্রেতা একই সঙ্গে অনেকগুলো তুলনামূলক ভাবে বিচার করে কেনার জায়গা পায়। যেমন, বটতলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। বইয়ের জোগান তখন ছাপাখানাই দিত। ছাপাখানাগুলো গড়ে উঠছে যূথবদ্ধ ভাবে। এক সঙ্গে অনেকগুলো এক জায়গায়। হেঁটেই যাতে ক্রেতা চলে যেতে পারে অন্য দোকানে। এটা 'বাজার'-এর জায়গা থেকেই সংঘটিত হয়। দূরে দূরে দোকান থাকলে সেটা প্রতিযোগিতার 'বাজার' গড়ে তুলতে পারে না। ১৮৫৮ সালে কলকাতার ছাপাখানা গড়ে ওঠার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে কুমারটুলি, গরানহাটা, আহিরিটোলা, চিৎপুর রোডের এই অঞ্চলটায় সংঘবদ্ধ হতে দেখা গেছে! দূরে পটলডাঙায় ও বৌবাজার স্ট্রিটে তুলনায় কম অংশ একগুচ্ছ ছাপাখানার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। দশ বছর বাদে ১৮৬৭ সালে বিডন স্ট্রিট, কলুটোলা, বৌবাজার ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থলে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে, শিয়ালদহে একই বকম ভাবে যূথবদ্ধ ছাপাখানার প্রবণতা ও পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যটাই বাজারের তত্ত্বকে আর এক ভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

৩. বটতলার বইয়ের বৈশিষ্ট্য এবং জনপ্রিয়তার শর্তপূরণ

বটতলার বইয়ের যে নিজস্বতা, তার সঙ্গে জনপ্রিয়তার শর্ত ভীষণ ভাবে জড়িত। যে কোনও বইয়ের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। বই প্রকাশ থেকে বিজ্ঞাপন, বিক্রি ও আনুষঙ্গিক সব কিছুই জনপ্রিয়তার সমকালীন দাবিকে স্বীকৃতি জানিয়ে। কেমন ছিল সে সব যা জনপ্রিয়তার শর্তকে পূর্ণ করতে করতে একটা নিজস্ব জগত গড়ে তুলেছিল, সেগুলি হল—

১. বিষয়বস্তু

২. ছবি

৩. ভাষা
৪. দাম
৫. বিপণন
৬. বিজ্ঞাপন

৩.১ বটতলার বইয়ের বিষয়বস্তু

জনপ্রিয় সাহিত্যের একই সঙ্গে দুটি লক্ষণ দেখা যায়— বিষয়বস্তু হিসাবে সে চিরাচরিতকেই পছন্দ করে, আবার সমসাময়িক বা অভিনবকেও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। এই বাইনারি রূপটির বাইরে সামাজিক অবস্থানে আর অন্য কিছুই থাকে না যাকে সে ওই দুইয়ের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেনি। সবই সেই দুই গণ্ডিতে আবদ্ধ। সেখান থেকেই আমরা চিনতে পারি বটতলার সাহিত্যকে। বটতলার বিষয়বস্তুতেও একই রকম ভাবে এই দুইয়ের সম্মিলন দেখা গেছে। একদিকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ইত্যাদি ছেপেছে; যা চিরায়ত বাজার-পরীক্ষিত টেক্সট, যার বিক্রি স্টেডি। আবার অন্য দিকে নানা ধরনের নকশা প্রহসনের মধ্যে দিয়ে সমকালকে ধরার চেষ্টা করে গেছে— তার সামাজিক বিতর্ককে, যৌন কেলেঙ্কারি, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, ফিরিঙ্গিপ্রীতি, আধুনিক সময়ের ফল হিসাবে বউকে ভজনা করে মাকে অবহেলা ইত্যাদি নানা রকম নীতিনিষ্ঠ বিষয়বস্তুকে ধরতে চেয়েছে বটতলা। আবার চিরায়ত বিষয়গুলোকে কখনও কখনও নিজের প্রয়োজন মতো ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছে। যেমন, 'দেবীযুদ্ধ' বইটায় রয়েছে বেদ পুরাণ স্মৃতি শাস্ত্র থেকে মঙ্গলচণ্ডীব্রত, পদ্মপুরাণ, বাণব্রত, শিবরাত্রি, গঙ্গাস্তব প্রভৃতিকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সমকালীন দাবি মেনে সম্পাদনা করে পদ্যছন্দে অনুবাদ। এই বই যেন উনিশ শতকের বৃহত্তর জনসমাজের প্রয়োজনে রচিত। সেই বৃহত্তর জনগণ ভারি ভারি শাস্ত্র পড়তে রাজি নয়, পড়ার পক্ষে তৈরিও নয় অনেক সময়। তাই তাদের প্রয়োজনীয় মেড ইজি। অথচ বিষয়বস্তু চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মীয় টেক্সট নির্ভর। একই রকম ভাবে চিরায়ত সাহিত্যিক টেক্সটকেও সমকালীন করে গড়ে নিয়েছে বটতলা। যেমন, 'বত্রিশ সিংহাসন' ১২৮৩ সালে চিৎপুর রোডে বটতলা ৩১৯ নং ভবনে চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত কালীপ্রসন্ন কবিরাজ প্রণীত, সচিত্র এই বইটিও হুবহু অনুবাদ নয়। তাই অনুবাদিত শব্দের বদলে 'প্রণীত' লেখা নামপত্রে। আবার অনেক

সময় হুবহু অনুবাদের চেষ্টাও দেখা গেছে— 'Thé Tales of Thousand and one Days' অনূদিত হয়েছে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র দ্বারা 'সচিত্র একাধিক সহস্র দিবস' নামে ১৮৮৪ সালে। হিন্দি ভাষায় রচিত গোলেহরমুজ-এর কেতাব অনুবাদিত হয় ১২৮৫ সালে।

উল্টোদিকে বটতলা বিখ্যাত হল তার অভিনব বিষয়বস্তুর বইপত্র বের করে যা অন্য কোনও উচ্চরুচির উচ্চবর্গের ছাপাখানা বা প্রকাশক বের করেননি। তাদের কাছে এসব ছিল হীন ব্যাপার। উচ্চমার্গীয় নয় বলে বটতলার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা অপরত্বের। তাদের জ্ঞান-আধিপত্য দিয়ে বটতলাকে 'অপর' করে রেখেছে। আর বটতলা তার মতো করে বিকশিত হয়েছে, বিশেষত যাবতীয় বিস্তার ঘটিয়েছে অন্য শ্রেণির বইপত্র প্রকাশ করেই। শ্রীপান্থ তাঁর বইতে লিখেছেন, 'সত্যি বলতে কী, বিষয় বৈচিত্র্যে বটতলার কোনও তুলনা নেই। ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য সংগীত, নাটক, কাহিনি, যাত্রার বই (পরে থিয়েটারেরও), পঞ্জিকা, সাময়িকপত্র, শিশুপাঠ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, অভিধান, ভাষাশিক্ষা, কারিগরিবিদ্যা— এমন কোনও বিষয় নেই যা ছিল বটতলার কাছে অজানা। সংস্কৃত, ফরাসি, উর্দু, ইংরেজি— নানা উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন বটতলার লেখক ও প্রকাশকরা।... বটতলা সেদিক থেকে সাধারণ বাঙালির কাছে যেন এক খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয়, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ওপেন ইউনিভার্সিটি।'[১০]

নানা বিষয়সহ গড়ে ওঠা এই ওপেন ইউনিভার্সিটির খোঁজ রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন, 'আকাশপ্রদীপ'-এর 'যাত্রাপথ' কবিতায় সে কথা লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা/দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা/আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট/দিদিমায়ের মতোই যে বলি-পড়া ললাট।/মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দর এক কোণে/দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে।' লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বটতলা ব্যবহারের রীতির মধ্যে একটা 'অপরত্ব'র পরিচয় রয়েছে, আলমারির তাক থেকে সাবধানে পেড়ে আনা বই নয়, বটতলা বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখা মলিন মলাটের বই, তা সে 'রামায়ণ'ই হোক আর 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। বিশেষত তথাকথিত ভদ্রবাড়িতে এই বই ব্যবহারের মধ্যে একটা চাপিয়ে দেওয়া উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। সেটার সঙ্গে কখনও ঔপনিবেশিক নীতি-নিষ্ঠ সমাজের যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে আবার হয়তো বর্ণ ও শ্রেণিগত দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতিও কেউ কেউ খুঁজে পেতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকেই তার উদাহরণ টানা যাক, 'চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ এবং কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।' এই 'রামায়ণ' যে বটতলায় ছাপা, তার প্রমাণ আমরা 'আকাশপ্রদীপ'-এর লেখায় আগেই উল্লেখ করেছি। চাকরবাকর মহলের বইপত্র হিসাবে বটতলার অস্তিত্বকে এইভাবে অগ্রাহ্য করা, নস্যাৎ করা, অসম্মান করার মধ্যেই শ্রেণি অবস্থান ধরা পড়বে— আমরা বাবু, তোমরা অধঃস্তন। তোমরা বটতলা পড়। আমরা পড়ি না। পড়লেও ঠাকুমা বালিশ চাপা দিয়ে পড়েন। আর রবি মায়ের ঘরের বারান্দার এক কোণে গিয়ে দিনের ফুরনো আলোয়, নাকি প্রায় অন্ধকারে এই বই পড়েন। এই চাকর মহলের বই, বালিশ চাপা দেওয়া বই, অল্প আলোয় কোণে গিয়ে পড়ার বই বটতলা, তার সূচনালগ্ন থেকেই শ্রেণি বৈষম্যের অসম্মান অর্জন করে এসেছে। 'রামায়ণ' পাঠের মধ্যে তো সেভাবে অসম্মান থাকতে পারে না, হয়তো বটতলার অন্যান্য বিষয়গুলো— যা অশ্লীলতার ছাপ্পা কিংবা সামাজিক বিতর্কের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নিজেই তর্ক-বিতর্কের হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য এই 'ছুৎমার্গ' তৈরি হয়েছিল। সেটাও এক ধরনের ভিক্টোরিয়ান মানসিকতা, যা পুরো সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া কালচারাল হেজিমনি। তার রেশ এতটাই যে ভদ্রবাড়িতে সেটা 'রামায়ণ' হলেও, বালিশ চাপা দিয়ে রাখতে হয়। অনেকে বলেন, বালিশ চাপার কারণ মাথায় ধর্মগ্রন্থ রেখে পুণ্যার্জন। না, তা নয়, তাহলে রবি কোণায় গিয়ে পড়বে কেন, চাকর মহলের সঙ্গে একাত্ম করে এই বইকে হাজির করবেন কেন? সেখানে ওই অবজ্ঞাটাই ধরা পড়েছে বড় বাড়ির, আভিজাত্যের, উচ্চ-রুচির, উচ্চ-নন্দনতত্ত্বের।

১৮৫৫ সালে রেভারেন্ট জেমস লং বাংলা বইয়ের একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন, সেখানে ১৪০০ বইয়ের হদিশ আছে, তার মধ্যে অজস্র বটতলার বই।[১১] শ্রেণিবদ্ধ ভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করে লং পুরো তালিকাটি বানিয়েছেন কয়েকটা পর্বে— (১) শিক্ষা বিষয়ক বই, (২) পঞ্জিকা-সাময়িকপত্র-সাহিত্য-পাঁচালি-আদিরসাত্মক বই, (৩) ধর্মবিষয়ক বই ইত্যাদি। এ নিয়ে সন্দেহ নেই যে ধর্ম বিষয়ক বইই বটতলার বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। তার মধ্যে হিন্দু ধর্ম বিষয়ক, মুসলমান ধর্ম বিষয়ক, এমনকী খ্রিস্ট ধর্ম বিষয়ক বইও।

খানিকটা লঙের তালিকা থেকে, খানিকটা নানা বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে আমরা বটতলার বইয়ের যে বিচিত্রতার সন্ধান পাই তা উল্লেখযোগ্য। যেমন, গদ্য-পদ্য

মিলিয়ে— কামিনীকুমার, কন্দর্পকৌমুদী, কৌতুক-সর্বস্ব নাটক, খোশ গল্পসার, শুক-বিলাস, শুক-সংবাদ, যোজনগন্ধা, পারস্য ইতিহাস, অমরকোষ, গোলদেওগান্ধার, ইংরেজি পাঠ, হস্তমালিক, ভাষা দ্রব্যগুণ, রসমঞ্জরী, হাতেমতাই, লালমন কেচ্ছা, চাহার দরবেশ, মন কেচ্ছা, বদমাএস জব্দ, বেশ্যা গাইড, বেশ্যা বিবরণ, বাহাবা চৌদ্দ আইন, ডেঙ্গু জ্বরের পাঁচালী, একেই বলে পোল, আশ্বিনে ঝড়, ড্রেনের পাঁচালী, আকালের পুঁথি, দুর্ভিক্ষ চিন্তামণি ইত্যাদি। এই নমুনা উল্লেখে রয়েছে সমকালীন শিক্ষা বিষয়ক বই, রেফারেন্স বই, ১৮৬৭ সালে যৌনব্যাধি দমনের জন্য যে আইন চালু হয় সেই নিয়ে বই, হাওড়ার পোল নিয়ে বই, ১৮৬৪ ও ৬৭ সালে যে বিধ্বংসী ঝড় হয়েছিল তা নিয়ে বই, দুর্ভিক্ষ নিয়ে বই, আরও কত কী! অনেক সময় এমন হয়েছে— কেউ একটা বই লিখলে তাকে নস্যাৎ করে অন্য কেউ আর একটা বই লিখলেন। তাকে নস্যাৎ করে আর একজন। জবাব দিলেন প্রথমজন। এভাবেই একটা সোসাল স্পেস তৈরি করেছিল, যা মেইন স্ট্রিমের সাহিত্যে গণতান্ত্রিক ভাবে ছিল না। লেখক ও পাঠকদের মধ্যে এই সোসাল স্পেসটার বিনিময় ঘটানোই যে কোনও জনপ্রিয় সাহিত্যের লক্ষণ। জনপ্রিয় সাহিত্য চায় জনবিতর্ক, জনরোল, জনতরঙ্গ। এ কাজটা মেইন স্ট্রিমের সাহিত্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়। করেওনি। সামগ্রিক ভাবে বটতলার চরিত্রটাই এমন ছিল যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই তর্কবিতর্কটা বহুমাত্রিক ভাবে করতে পারা তাদের পক্ষে সুলভ, সহজবিস্তারী এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ছিল। বহু অর্থ ব্যয় করে সাধারণ মানুষদের পক্ষে কলম ধরা বা পুস্তিকা বের করা সম্ভব ছিল না। বটতলার নিজস্ব চরিত্রটাই সেটা করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ বটতলা নিজে হয়েছিল ফ্লেক্সিবল, তাই বহু জনগণকে নিয়ে তার বিষয়বস্তুর পক্ষে-বিপক্ষে মুভ করাটা তারই স্বার্থরক্ষা করেছে। কেন্দ্র ও প্রান্তের দূরত্ব তৈরি করতে দেয়নি। কখনও লেখক কেন্দ্র হয়ে যে বক্তব্য বলেছে, তাকে কাউন্টার করে প্রান্তের পাঠক বা নতুন লেখক পুস্তিকা লিখেছেন। তখন তিনি হয়ে উঠেছেন তার প্রান্তের জায়গা থেকেই কেন্দ্র। বা কেউই চূড়ান্ত অর্থে কেন্দ্র বা প্রান্ত হয়নি। একে অপরকে কাউন্টার করতে করতে এগিয়ে গেছে।

৩.২ বটতলার বইয়ের ছবি

জনপ্রিয়তার সঙ্গে ইমেজ ভীষণ ভাবে জড়িত। বৃহত্তর জনমন অনেক সূক্ষ্মতা নিয়ে বুঝতে চায় না, বরং সে ছবির মধ্যে দিয়ে তার বোঝাবুঝির রাস্তাটা খুঁজে পেতে

চায়, মিলিয়ে নিতে চায়। তাই, যদি কোনও বইতে ছবি থাকে তবে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠার একটা টুলস ব্যবহার করল বলা যায়। এতে বইটার পক্ষে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সহজ হয়। আমাদের ট্র্যাডিশনে পুঁথি চিত্রিত হত। পুষ্পিকা পুঁথিতে কাঙ্ক্ষিত ছবির সঙ্গে একদা বাঙালি পাঠক পরিচিত ছিলেন। পটচিত্রে কিংবা ব্রতকথার আলপনায় যে টেক্সট, সেটা ওরাল পদ্ধতিতে প্রচলিত ছিল। তার সঙ্গে ছবির প্রাধান্য আমাদের শ্রুতিতে একটা ভিশুয়াল সাপোর্ট দিত। অর্থাৎ, কানকে মনে রাখানোর জন্য চোখকে একটা ইমেজ দেওয়া। ইমেজ স্মৃতির পক্ষে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল, মনে রাখার সহায়ক। সেই সাইকোলজিতেই আমরা বেড়ে উঠেছি, যার একটা উনিশ শতকীয় নিজস্ব 'বুম' বা বিস্তার ঘটল বটতলার বইয়ের ছবি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। 'বুম' এই জন্যই বলতে চাই— বহু ধরনের বই, বিবিধ ধরনের চিত্রণের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হত। কখনও রঙিন। তার জন্য দক্ষ কাঠখোদাই চিত্রকররা সে সব এনগ্রেভ করতেন। পরে দস্তার উপরে ব্লক বানিয়ে ছাপা হত ছবি। একমাত্রিক সলিড রেখা নির্ভর ছবি থেকে হাফটোন বা শেড ব্যবহারের অসামান্য দক্ষতা দেখানো অলঙ্করণকে ক্রমশ জায়গা করে দিল বটতলা। সেই ছবির সূত্রে বটতলার ছবির নিজস্ব ঘরানা গড়ে উঠেছিল। ভাল ছবিসহ বটতলার বইয়ের দামও অন্যান্য সাধারণ ছবিওয়ালা বইয়ের চেয়ে বেশি নয়। মুনাফা বেশি। সব মিলে তাই ছবি হয়ে উঠেছিল বটতলার সংস্কৃতিতে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা— একটা 'বুম'।

১৮১৬ সালে কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেসে ছাপানো ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ যে ছটি ছবি ছিল সেটাই বাংলা বইতে প্রথম ছবির ব্যবহার। দুটি ছবিতে শিল্পীর নাম আছে— রামচাঁদ রায়। কিন্তু বটতলার ছবির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে আরও ১৫ বছর পর— ১৮৩১ সাল নাগাদ। তারপর প্রচুর বই বের হয়েছে যাতে ছবি যুক্ত হয়ে আলাদা মাত্রা অর্জন করেছে। অনেক সময় বইয়ের বিজ্ঞাপনে 'সচিত্র' কথাটি উল্লেখ করা হত। বিক্রির সঙ্গে নিশ্চয় এর যোগ ছিল। 'কালী কৈবল্যদায়িনী' (১৮৩৬), 'ভাগবদ্গীতা' (১৮৩৬), 'হরপার্বতীমঙ্গল' (১৮৫১), 'অন্নদামঙ্গল' (১৮৫৭), 'পঞ্চদশী' (১৮৬২) ইত্যাদি বহু বইতে ছাপা হল ছবি। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই আমরা বেশ কিছু খোদাই শিল্পীর নাম পাচ্ছি যাঁরা বটতলার বইতে ছবি এঁকেছেন— রামচাঁদ রায়, রামধন স্বর্ণকার, কাশীনাথ মিস্ত্রি, গোবিন্দচন্দ্র রায়, গোপীচরণ স্বর্ণকার (কমুলিটোলা), হীরালাল কর্মকার

(বটতলা), হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, পঞ্চানন কর্মকার (হোগল কুড়িয়া), তারিণীচরণ দাস, বীরচন্দ্র দাস (আহিরিটোলা), কার্তিকচন্দ্র বসাক, কার্তিকচন্দ্র কর্মকার, গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, নিত্যলাল দত্ত (কখনও বানান নৃত্যলাল)। নিত্যলাল দত্তর নিজের ছাপাখানা ছিল দত্ত প্রেস। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের আঁকা একটি ছবির নীচের লেখা— 'এই রকম হরেক ছবি কলিকাতায় ছাপা হইতেছে যাহার দরকার হয় আসিয়া লইবেন।' আবার কৃষ্ণচন্দ্রের ছবিতে লেখা, 'মোং শোভাবাজারে চূড়ামণি দত্তের পাড়ায় ২৭নং বাটিতে ও বটতলার দক্ষিণ রাওজীর দোকানে মোং কলিকাতা ও শ্রীরামপুরের হরেক রকম ছবি পাইবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃত।' এই কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চানন কর্মকারের জামাই মনোহরের ছেলে। মনোহর যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন তখন সেখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্র সচিত্র পঞ্জিকা প্রকাশ করেছেন। সেই ছবিও নিজেই আঁকতেন।

এই সব নামাঙ্কণের পেছনে ছিল এদের বাজার ধরবার আকাঙ্ক্ষা। কার আঁকা ছবি এবং কোথায় পাওয়া যাবেব ভিত্তিতে ক্রেতা খোঁজ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে সেই ছবি বা বটতলার কাঠখোদাই কিনবেন। কারণ, প্রচলিত কালীঘাটের পটচিত্রে, যা মেদিনীপুরের পটুয়ারা উনিশ শতকের শুরুতেই কালীঘাটে এসে (বর্তমান মন্দির তৈরি হয় ১৮০৯ সালে) জীবিকার্জনের তাগিদে বসবাস করতে শুরু করে এবং কালীঘাটের পটচিত্র জনপ্রিয় হয়। তার দাম ছিল বটতলার ছাপা ছবির কয়েক গুণ বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ দেবদেবীর ছবি কিনতে গিয়ে দামের সুবিধার কারণে কালীঘাটের বদলে বটতলার ছবিকেই বেছে নিতেন বেশি। আর উইলিয়াম আর্চার কালীঘাটের পটের সঙ্গে বটতলার কাঠখোদাইয়ের মিলও খুঁজে পেয়েছেন। এই সময়ে দুটো শিল্পধারা চর্চিত হচ্ছিল। ১৮০০ সাল থেকে তিনি কালীঘাটের পট খুঁজে পাচ্ছেন। ১৮১৬-তে আমরা বাংলা বইয়ের প্রথম অলঙ্কৃত 'অন্নদামঙ্গল' পাচ্ছি। তারপর থেকে বটতলার বইতে যে ছবি এল— তার সঙ্গে আমাদের দেশীয় পটচিত্রের যোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও আর্চার কালীঘাটের পটে পাশ্চাত্য চিত্রকলার ছায়া দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এ দেশীয় গবেষকরা দেখিয়েছেন, এই ধারণা ভুল। কালীঘাটের পট দেশীয় ভাবে গড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে আর্চার কথিত পাশ্চাত্য প্রভাবের মিলগুলো প্রাক-ঔপনিবেশিক শিল্পকলাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

আসলে পপুলার আর্টের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যেই হয়তো কিছু কিছু মনোভঙ্গির সাদৃশ্যের কারণে প্রকাশগত সাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। একই রকম ভাবে, একই সামাজিক চাহিদায় আমাদের এবং ইংল্যান্ডের পপুলার আর্ট গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে গবেষণা করে ১৯৫১ সালে Lambert, Margeret, Marx লিখেছেন 'Many cheap prints, in wood or copper engraving, were sold for framing and hanging on walls. In protestant England, biblical scenes were very common, whereas in the Catholic countries of the continent we find various patron saints and martyrs, much of this religious literature being intended for sale to the pilgrims sporting subjects are very common both here and abroad... There are scenes from everyday such as the cries of London. echoed in France by the cries of Paris.'[১২] আমরাও বটতলার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি এ কথার সঙ্গে আমাদের ছবির অমিল বিশেষ নেই। আমরাও হাতে রং করতাম ছবি, ওরাও তাই করত— 'The populars began to be coloured towards the end of th eeighteenth century, in brilliant water colours-applied by hand, at first in detail and later in broad, sweeping stencils. As the nineteenth century progresses, the colours become stronger and more violent.'[১৩] বটতলার ছবিতেও স্টেনসিল ব্যবহার ছিল বা রং ব্যবহারও একই রকমের। এত সব কিছু টেকনিক্যালি আলোচনার কারণ, আমাদের দেশের সঙ্গে ওদের দেশের 'পপুলার আর্ট' গড়ে ওঠায় সরাসরি কোনও প্রভাব না থাকলেও, প্রকাশগত দিক থেকে, নির্মাণশৈলীতেও এই যে সাদৃশ্য, তা বুঝিয়ে দেয়, জনপ্রিয়তার মন ও চাহিদা সব দেশেই অনেক কিছুই সৌসাদৃশ্যময়। তারই ফলে সে দেশে ছাপা বই, চ্যাপবুক— ছোট ছোট ছবি সম্বলিতই হোক আর আলাদা ভাবে কাঠখোদাই, ধাতুখোদাই— তাতে বটতলার মতোই বিষয়গত ঐক্য ছিল, বাজারগত ঐক্য ছিল।

দামের দিক থেকে সস্তার ফলে বটতলার ছবি যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তেমনি ছাপা ছবি হওয়ার কারণে কালীঘাটের পটের রং বাঁচিয়ে রাখার যে ঝক্কি তা থেকে মুক্ত ছিলেন সাধারণ মানুষ। তাছাড়া কালীঘাটের পট কালীঘাটে গিয়ে কিনতে হত মূলত। যদিও Hana Kinizkova 'The Drawings of the Kalighat

style' (Prague, 1975) বইতে বোঝাতে চেয়েছেন, কালীঘাট শুধুমাত্র কালীঘাটেই সীমাবদ্ধ ছিল না, একটা স্কুলিং হিসাবে শহরের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু, নামের মধ্যে কালীঘাট থাকার কারণে কালীঘাটের কাছাকাছি থাকার যে দায়বদ্ধতা ছিল, তা বটতলার চিত্রকরদের ছিল না। ফলে তারা অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছিল বসতির দিক থেকে। ফেরিওয়ালারা তাদের ছবি নিয়ে ফেরি করত। বইতে করে সে ছবি অনায়াসে পৌঁছে যেত, যে পাঠক ছবিপ্রিয় নয় তার কাছেও। ছবি দেখে আকৃষ্ট হয়ে সেই অনাগ্রহী পাঠক যখন আগ্রহী হত তখন সেও কিনত অথবা আলাদা করে কাঠখোদাই ধাতুখোদাই না কিনে বইয়ের ছবি সংরক্ষণ করত। একথা বলার মধ্যে দিয়ে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি— নাগরিক জনপ্রিয় চিত্রকলার চর্চা হিসাবে কালীঘাট থাকলেও বটতলা অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। জনগণের কাছে বটতলার ছবি পৌঁছেছিল অনেক গভীর ভাবে। এর ফলে ছাপাই ছবির যা বাজার তৈরি হচ্ছিল তাকে উৎসাহিত করতে ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র উদ্যোগে 'দি ক্যালকাটা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। সেখানে কাঠখোদাই শেখানোর ওপর জোর দেওয়া হত। বিদেশ থেকে মি. ফাউলার নামে একজন খোদাই কাজ জানা শিক্ষক আনা হয় ছাত্রছাত্রীদের পাশ্চাত্যপ্রথায় আরও ভাল করে খোদাইচিত্র শেখানোর জন্য। চাহিদা না থাকলে এটা করা হত না, কালীঘাট নিয়ে কিন্তু করা হয়নি। ১৮৬৪ সালে এই শিল্প স্কুলটি যখন সরকারি আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয় তখনও সেখানে কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই শেখানোয় জোর দেওয়া হয়েছে। আরও পরে যখন কলেজ হল, সেখানেও একই ভাবে খোদাই ছবি শেখানোয় আলাদা জোর ছিল। এ সবই আসলে বটতলার সূত্রে যে 'বাজার' তৈরি হচ্ছিল এবং মানুষ গ্রহণ করছিল নানা ধরনের খোদাই ছবিকে, তার উদাহরণ। কেমন ছিল সেসব ছবি— আমরা একটু সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বুঝে নেব।

বটতলার ছবিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (১) দেবদেবী বা ধর্মসংক্রান্ত ছবি এবং (২) মানুষ বা অধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক ছবি।

সামাজিক অস্থিরতা অসন্তোষের ফলে মানুষের মধ্যে দেবদেবী নির্ভরতা দেখা দিয়েছিল। কখনও সেই দেবদেবী দুষ্টের দমনকারী আবার কখনও তিনি বরাভয় রূপে। রাম রাবণ নিধন করছে (হীরালাল কর্মকারের আঁকা, 'রামায়ণ' বইতে ১৩৩৫)। বিশালাকার কৃষ্ণবর্ণ রাবণ, যেন অন্যায়ের প্রতিমূর্তি— তাকে বধ করছে রাম, লক্ষ্মণ।[১৪] সতীর দেহ মাথায় নিয়ে মহাদেব— নিত্যলাল দত্তর ছবি ছাপা

হয়েছিল ‘দেবীযুদ্ধ’ (১২৮৩) বইতে।[১৫] কিংবা ওই বইতেই শিল্পীর নাম ছাড়া কালকেতুর শিকার করার ছবিতে তির মারতে উদ্যত কালকেতু, পিছনে তরবারি হাতে সঙ্গী। ছবিগুলোতে ক্রোধ, হিংসা, রিরংসা কাহিনির দিক থেকে যতটা ছবির মধ্যে কিন্তু ততটা নয়। কারণ বাঙালির নিজস্ব জীবনযাত্রায় সেই রিরংসা নেই, যা তার অস্থিরতার প্রশান্তির কারণ হতে পারে। তাই বাঙালির জনমনস্তত্ত্বের মতো করেই এসব ছবির ক্রোধ, হিংসা, রিরংসাও তাদের মাত্রা বদলে ফেলেছে।

বরং দেখা যাবে বটতলার ছবিতে বরাভয় রূপ। বা দেবদেবীদের শান্ত-সৌম্য-অহিংস চেহারা। রাশি রাশি ছবি সে রকম যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অসুবিধা হয় না, বাঙালি ব্যক্তিগত জীবনে যত অস্থিরতাতেই থাক, তার পপুলার ইমেজে সেই দুশ্চিন্তা সঞ্চারিত করেনি, অন্তত দেবদেবীদের ক্ষেত্রে। এর কারণ হয়তো বাঙালির দেবদেবী চর্চায় প্রচলিত বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রতি নিষ্ঠা; শাক্ত চর্চাকারীরাও কালীকে ভয়ঙ্করী রাখেননি— গৃহস্থ মা মেয়ের দ্যোতনায় সামাজিক প্রয়োজনের বিচারে বদলে ফেলেছেন। রাধাকৃষ্ণ এঁকেছেন পঞ্চানন কর্মকার— সখী পরিবৃত, প্রশান্তির রূপ, আশ্চর্যজনক ভাবে দুই সখী রাধাকৃষ্ণের আকৃতির চেয়ে বড়ও, যা ধর্মীয় বিশ্বাসে হওয়ার কথা নয়। কেন হল? পপুলারের এটাও একটা লক্ষণ, জনগণের স্পেসটাকে গুরুত্ব দেওয়া— সখীরা সেই জনগণের স্পেস শেয়ার করছে।[১৬] ১২৬২ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকায় শিল্পী পঞ্চানন দাসের গুটোনো পটের রীতিতে আঁকা নবজাত কৃষ্ণকে বাসুদেব নন্দালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন একটা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে কাহিনির প্রয়োজনে যেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে সাধারণ মানুষে ভরিয়ে দিয়েছেন শিল্পী। ওই একই ভাবে জনগণের জায়গাটা দেখানোর জন্য। এতদিন উচ্চবর্গের নির্দেশে পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব সাধারণ মানুষরা সে ভাবে ঢুকতে পারেনি, এবার তাদেরই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। তারা ঢুকে পড়ছে ছবির মধ্যে— না হলে ছবি যারা কিনবে তারা কীভাবে বুঝবে যে পুণ্য অর্জনের ফল কী? ফল দেখে, ছবি কিনবে। ছবিতে আছে মানে, স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সর্বত্র তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।[১৭] সেটাই যেন অন্য ভাবে ধরা পড়ে গেছে ‘দেবীযুদ্ধ’ (১২৮৩ বঙ্গাব্দ) বইয়ের বেণীমাধব দে পঞ্চানন কর্মকার খোদিত কৈলাশে হরপার্বতীর ছবিতে। কৈলাশ তো সাধারণ মানুষের কাছে প্রকারান্তরে স্বর্গই (‘স্বর্গের কী বা দূর কৈলাশেতে বাকি’, শিবমঙ্গল)। সেই কৈলাশে হরপার্বতীর সঙ্গে দুই সাধু ও একজন সাধারণ মানুষ

গাছের উপর উঠে বসেছে। সে ব্যাধ হতে পারে, পথিক হতে পারে, পাগল হতে পারে— কমন ম্যান সে। তাকে অন্তর্ভুক্ত করেই খোদাইচিত্রের নিজস্বতা অর্জন করেছে বটতলার ছবি— হয়ে উঠেছে পপুলার আর্ট।

এই পাবলিক স্পেসটাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে সামাজিক বিষয় নিয়ে আঁকা ছবিগুলোয়। সমসাময়িক বিষয়, যা সংবাদপত্রের অন্তর্গত বিতর্কিত কিংবা অনুসন্ধানমূলক— সেগুলোকে বিষয় করে লেখকরা নকশা, প্রহসন রচনা করেছেন গদ্যে পদে। আর তার ভিত্তিতে আঁকা ছবি বটতলার কাঠখোদাই-ধাতুখোদাইয়ের নতুন দিক তুলে ধরেছে। যেমন, পুজো উপলক্ষে বটতলা রঙ্গব্যঙ্গাত্মক পুজো পুস্তিকা বের করত। এগুলোর দাম হত সামান্য। তার একটির মলাটে লেখা—

ছোট বউ প্রাণপ্রিয়সী
শাড়ী চেয়েছে বারাণসী।
পূজায় বেধেছে বিষম দাঙ্গা।
দুই সতীনের রক্তগঙ্গা।
দুই বিয়ের কেমন মজা।
আজ বাদ কাল দুর্গা পূজা।
দেখে অবাক পাড়াশুদ্ধ
দুই সতীনের মল্লযুদ্ধ।
শ্রীযুত বাবু হোঁৎকারাম বিরচিত।[১৮]

মাঝখানে ছবি— দুই সতীন ঝাঁটা হাতে চুল টেনে মারপিট করছে। সমসাময়িক সতীন সমস্যা, বহুবিবাহ একটা আলোচ্য ব্যাপার ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল বড়লোকরা। সাধারণ মানুষ সব সময় চায়, সেই অজানা বড়লোকদের বাড়ির সতীন সমস্যা, দুর্ভোগ যেন জানা যায়। বিক্রিও হত দেদার। এই ছবিতে বটতলা তার পাবলিক স্পেসটাকে সরাসরি ব্যবহার করতে পেরেছে।

'পাসকরা মাগ' (১৩০৯) রাধাবিনোদ হালদারের লেখা সামাজিক প্রহসন— যার মূল লক্ষ্য পড়াশোনা শেখা মেয়েরা— তাদের সমালোচনা। কারণ, তাদের পড়াশোনার ফলেই সংসারধর্ম নষ্ট হয়, পতির দুর্ভোগ হয়, 'পাপ' হয়, এমনকী এমনও ভাবা হত স্বামী মারা যায়। এই ভাবার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক ক্ষমতা

বিন্যাসের দ্বন্দ্ব যুক্ত ছিল। কার হাতে ক্ষমতা থাকবে, কোন পুরুষ— পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নাকি প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত— নাকি দুইয়ের সমাহারে গড়া পুরুষ! তারা যে যেমন সামাজিক অবস্থানে বাস করে তার নিরিখে এই পাশ করা মাগের মূল্যায়ন হবে। এতদিন মেয়েরা পাশ করেনি, এবার মেয়েরা পড়ছে, পাশ করছে, সেটা সামাজিক অবস্থানে একটা নতুন ঘটনা, সে ঘটনায় আলোড়িত বাংলাদেশ। 'পাসকরা মাগ'-এর প্রচ্ছদে লেখা— 'স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল।/পতি হয় পায়ের তল।।'[১৯] উপরে ছবি উলঙ্গিনী নারীর— যেন লাজলজ্জাহীন নষ্টা মেয়ে সেই পাশকরা মাগ। বটতলার ছবি আমাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়াটা পৌঁছে দিল, যা সামাজিক, সমকালীন এবং লিঙ্গবৈষম্যের দৃষ্টিকোণে আঁকা।

'সচিত্র লজ্জতনেচ্ছা'[২০] বইয়ের ছবিতে শিল্পীর নাম নেই— কালীঘাটের রীতিতে কাঠখোদাই পাওয়া যাচ্ছে— বাবু ও বিবি। এ ছবি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, বাইরের মেয়েকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার প্রতিনিধি নয়, প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে এই ছবি। আবার মোহন্ত ও এলোকেশীর বিতর্কে যখন সমাজ সরগরম তখন কুলবধূ বনাম ধর্মগুরুর কেচ্ছা— পাবলিক স্পেসের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক চাহিদার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৩ সাল নাগাদ, তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরি মহারাজের দর্শন করতে এসে নজরে পড়ে গেল গ্রামের কুলবধূ এলোকেশী। তার বর থাকত শহরে। সেই সুযোগে জমে উঠল মোহন্ত এলোকেশীর সম্পর্ক। বর বাড়ি ফিরে এলোকেশীকে খুন করল। শাস্তি হল দ্বীপান্তর আর ব্যভিচারের দায়ে জেল হল মোহন্তর। এই ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গেল উনিশ শতকের গ্রামগঞ্জে শহরে নগরে। প্রচুর নাটক প্রহসন লেখা হল (অন্তত ৩৪টির তালিকা পেশ করেছেন শ্রীপান্থ তাঁর 'মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ' বইতে)। আঁকা হল কালীঘাটের পট— সেগুলো দেখতে পাওয়া যায় উইলিয়াম আর্চারের 'কালীঘাট ড্রইংস' (১৯৬২) বইতে। আর বটতলার কাঠখোদাই-এর নমুনা মিলবে। আমরা দুটি লিথোগ্রাফের সন্ধান পাই যাতে 'উঃ! মোহন্তের এই কাজ!!'[২১] (১২৮০ বঙ্গাব্দ) শিরোনামে শুয়ে থাকা সরলা এলোকেশী এবং পলায়নোদ্যত মোহন্তর পা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর ফুল-মালা-চুরি-হার ত্যাগিনী বিবেকদংশিতা সরলা এলোকেশীকে আর একটি ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পীর নামহীন এই রঙিন লিথোগ্রাফটাই বলে দেয়, বহু নাম করা শিল্পীদের সঙ্গে অনামী খোদাইকররাও এই ধরনের সামাজিক ঘটনায় ছবি তৈরি করেছিলেন। তাঁদের এই আগ্রহের একদিকে যেমন ছিল

সামাজিক স্পেসটাকে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নিজের কীর্তিকে সমকালীনতায় দেখা অন্য দিকে বাজারের প্রয়োজনে চাহিদা অনুসারে মুনাফা অর্জন করা। বাজার চাইছিল জনপ্রিয়তার যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য— সেই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠল রাশি রাশি মোহন্ত-এলোকেশীর বটতলা চিত্র-কাহিনি।

নানা ধরনের নারী-চিত্র আঁকার প্রবণতা ছিল। মূলত কাম আকাঙ্ক্ষা থেকে এগুলির চাহিদা ছিল নানা বয়সি বাঙালি পুরুষসমাজে। একে আমরা বটতলার যে 'অশ্লীল' বইপত্রের ধারা তার অনুসরণে দেখতে পাই। বাঙালি জীবনের এক দিকে প্রভুত্ববাদ, অন্য দিকে স্বাধীনতার ঔপনিবেশিক আইডিয়া, মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই বাঙালি পুরুষ নিজেকে ওই লেখা ও ছবির মধ্যে দিয়ে মনের খোরাক মেটাতে চেয়েছে। ভিক্টোরিয়ান ধারণা তাকে সেই স্বাধীনতা দেয়নি, কিন্তু পাশ্চাত্য মানে স্বাধীন, যৌনতায় উদার এমন একটা রটনার মধ্যে দিয়ে নব্যযুবকরা গেছে— তাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতোষণে চিত্রিত হয়েছে নানা নারীচিত্র। ১৩১৫ সালে প্রকাশিত 'সচিত্র রতিশাস্ত্র'[২২] বইতে সে রকমই একটি নায়িকাচিত্র সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিল। এরা কেউ বাৎসায়ন কথিত নারী শ্রেণি অনুসারী নয়। কারণ, সে ভাবে সমাজ নেই। সমাজ যে ভাবে আছে, সেখানে নারীরা যে ভাবে রয়েছে সেই সব পোশাক, অলংকার, ঠাঁটবাটসহ বটতলা তার নায়িকাচিত্র রচনা করেছে। স্টুডিওতে বসা ফটোগ্রাফ যেন। আঁকা ছবিতে সে রকমই ফুলদানি, টেবিল, টেবিল ক্লথ, মেঝে, চেয়ার ইত্যাদি। নতুন উদ্ভুত ফটো তোলার কায়দাকে অন্তর্ভুক্ত করে সে আরেক ধরনের মাধ্যমের মিশ্রণকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। ফটোগ্রাফ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে যেন বটতলাও নিজের প্যাটার্ন বদলায়।

কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের এক টাকায় উপন্যাস সিরিজের একটি উপন্যাস 'বিয়েবাড়ি'[২৩]। তার অন্তর্গত রঙিন হাফটোন ছবি ছাপতে শুরু করে পরবর্তীকালের বটতলা। দেখা যায় সিনেমার সেটের মতো একটি রেলিংওয়ালা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নায়িকা। একই রকম ভাবে আহিরিটোলা কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের এক টাকা সিরিজের উপন্যাস 'রাজরাণী'[২৪] থেকেও একটি রঙিন হাফটোন ছবি মেলে, যেখানে ওই ধরনের স্টুডিও চিত্রের মতো রিয়ালিস্টিক ঢঙে আঁকা ঘোড়ায় চড়া রানি. যদি বটতলায় প্রথম যুগের আঁকা কাঠখোদাই থেকে এই হাফটোনের ছবিগুলো ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে— বৃহত্তর পৃথিবীতে টেকনোলজিক্যাল উন্নতির ফলে ছবির জগতে যত ধরনের

অদলবদল ঘটেছে, বটতলা ধারাবাহিক ভাবে তাকে অনুসরণ করে গেছে। বাইরের প্রভাবকে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখেনি।

৩.৩. বটতলার বইয়ের ভাষা

বটতলার ভাষা জনপ্রিয়তার অন্যতম একটা কারণ। যথাসম্ভব চলতি ভাষাকে ব্যবহার করে আটপৌরে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক ভাষা-মেজাজটাকে ধরতে চেয়েছে বটতলা। তার ফলে সমকালীন বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণের সুযোগ বেড়েছে। বাঙালির যে নব-উত্থিত শিক্ষিত অংশ অথবা স্বল্প-শিক্ষিত, তারা সকলেই যে সাহিত্য বিষয়ে জটিলতায় বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়, বরং ভাষাগত ভাবে উল্টো বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন। জনপ্রিয়তার সঙ্গে যে জনভাষার যোগ, তার মনস্তত্ত্ব প্রধানত দাঁড়িয়ে থাকে ভোক্তার ভাষা-ক্ষমতা বা ভাষা-অধিকারের উপরে। চমস্কি মনে করেন,[২৫] এই ভাষা-গ্রহণটা উচ্চশিক্ষিত প্রস্তুত পাঠকদের মতো নয়, তাঁরা অজানা শব্দ ও ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়, সেই ভাষাটা তারা জেনে নেয়—শব্দ-বাক্য-অর্থ জানার প্রবণতা তাদের শিক্ষার অর্জন পথের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, বৃহত্তর জনমানসে ভাষার সেই নতুনত্বের প্রতি অনধিকার ভয় কাজ করে। সে ভাবে, এই নতুন ভাষা-পৃথিবীটা তার জন্য নয়, বরং তাকে বিপর্যস্ত করার জন্য। তখন সে নিজেই প্রত্যাখ্যান করে ওই সাহিত্য বা টেক্সটকে। যা তার বোধগম্য তা গ্রহণীয়, এই তত্ত্ব মেনে জনপ্রিয় সাহিত্যের ভাষা গড়ে ওঠে। যেহেতু তা বোধগম্য, অনেক বেশি তাদের ব্যবহার্য ভাষার কাছাকাছি, যথাসম্ভব বোধগম্য, কথ্যভাষার প্রতি অতিনিষ্ঠ, তাই জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সমধিক।

এই ভাষা তারতম্যটা ধরা পড়বে যদি আমরা বটতলার সমসাময়িক কালে অন্য কোনও টেক্সট-এর পাশে বটতলার ভাষাকে মিলিয়ে পড়ি। কতটা ভাষা ও অর্থগত তারতম্য তাদের মধ্যে ভাষা-ক্ষমতা আধিপত্য তৈরি করে তার উদাহরণ পাব। প্রথমে ১৮৩১ সালে রচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববিবি বিলাস' থেকে 'প্রথমতো নবযুবতী কামিনীর সহিত দূতীরূপা নাপিতিনীর সাক্ষাৎ' উপশিরোনাম অংশের অন্তর্গত—

> স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় পিতা রক্ষক ও যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষক অতএব স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোনকালেই অপ্রসিদ্ধ এমতে যে কাল

পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে কুমারী বাস করেন তৎকালে পিতার রক্ষণাবেক্ষণে শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় বর্দ্ধিতা হয়েন এবং কৌমারাবস্থায় ইন্দ্রিয় দোষ সম্ভাবনায় অসম্ভাবনা প্রযুক্ত নির্দ্দোষে নির্ম্মল সুশীতল ধবল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র চরিত্রে কালযাপন করেন পরন্তু যৌবনোপক্রমে ক্রমে ক্রমে মদন রাজার রাজ্যরূপে নারী শরীরে যৌবন দূত প্রবিষ্ট হইয়া অশান্ত দুর্দ্দান্ত রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজাশাসনাভয়ে অধৈর্য্য হয়ে পরে ঐ মহাপ্রতাপী রাজা যুবতী নগরীতে প্রবল দল বলসমভিব্যাহারে আক্রমণ করাতে বড়ই উৎপাত ঘটে তখন যুবতী ক্ষণমাত্রে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন না সর্ব্বদা পতির নিকট রাজার উৎপাত জন্য বেদনা বেদ করেন।

এই দীর্ঘ তৎসম শব্দবহুল বাক্যের অর্থ উদ্ধার করাই বেশ কঠিন এবং অনাগ্রহের ছিল তাদের কাছে। এর মধ্যে যে রচনাকারের জ্ঞান-ক্ষমতা আধিপত্য আছে, সেই আধিপত্যের দ্বারা নিজের স্বাতন্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া আছে, দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে আমি তোমাদের চেয়ে উচ্চ, সেটাকে বটতলা নস্যাৎ করে দেয়। উচ্চভাষাকে অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে সে নিজের ভাষার একটা কাউন্টার ডিসকোর্স বা জগত গড়ে তোলে, যে জগতকে অন্যেরা মানে না। অশিষ্ট, কাঁচা, উচ্চরুচির নয় বলে নস্যাৎ করে। সেই নস্যাতের নস্যাৎ, যা বটতলার লেখালিখিতে বহু ভাবে হয়েছে। ১২৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্যারিমোহন সেন রচিত ১৬ পৃষ্ঠার একটি প্রহসন থেকে সাধু কী ভাষায় কী বক্তব্য রাখছে দেখা যাক—

ইহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কলিকাতা কি মজার স্থান, পূর্ব্বে শুনেছিলাম যে, কলকাতায় গেলে লোকে অবস্থা ফিরে যায়, তাহা আজ ঠিক মিলিল। কালের কি গতি, কিছুই বোঝা যায় না, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গিয়েছে, জুয়াচুরি, প্রতারণা, মাতলামি, এই সকল দিন দিন বাড়চে, কলির করুণাময় ক্রমে ক্রমে এই সকল যে ঘটবে, এত আমাদের শাস্ত্রের লিখন। আর এ সকল কার্য্যে অবশ্য সুখ থাকবে, তা না হলে সহর শুদ্ধ লোকেই কেন মুগ্ধ হয়েছে, ফলতঃ ধর্ম্মপথে আর সুখ নেই আজকাল ধর্ম্মপথে থাকলেই যেন দুঃখ এসে অমনি ধরেছে, আমি ক্রমে ক্রমে সাধুর পথে যাব স্থির করেছিলাম, দূর হউক আর সাধুত্বে কাম নাই, সহরের ভাবগতিক দেখে আমার মনে কেমন কেমন করিতেছে। একবার সহরের মজা লুটে দেখিই না কেন।[২৬]

পড়লেই বোঝা যাচ্ছে এর ভাষা-সাবলীলতা, যতি চিহ্নের ব্যবহার, আটপৌরে শব্দের অনায়াস প্রয়োগ, ভাষাগত তথাকথিত সংস্কার না-মেনে ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাকে ব্যবহার করার লক্ষণ— সবই দেখতে পাওয়া যায়। বৃহত্তর জনমনে এর গ্রহণের কারণ কতটা সঙ্গত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বরং আমরা দেখাতে চাই, বিষয়গত ভাবে এই ভাষা-কাউন্টারটি জনমনে গড়ে উঠেছিল বলেই তা ভাষাগত ভাবে সম্ভব হয়েছিল। কেমন সেটা? সাধু কিন্তু এই প্রহসনে আর সাধু থাকছে না। সাধুও তো ধর্মগত ভাবে ক্ষমতা-কেন্দ্র নির্মাণ করে, তার যে ধর্মীয় বন্দোবস্ত, শাস্ত্র ও সমাজ যাকে গড়ে তুলেছে এবং রক্ষা করে চলেছে— সাধুরা সেই ব্যবস্থাটাকে যেমন দেখাশোনা করে, সমাজও তাদের দেখাশোনা করে। এই দেখাশোনাটা বেশ সম্পৃক্ত। সাধুরা কখনওই তাই ওই ধর্মীয় ক্ষমতা-কেন্দ্রের যে সুযোগ-সুবিধা তাকে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসে না। সেটাই তার অস্ত্র, ব্যবহার করে অন্যদের শাসন, শোষণ করে। অথচ এখানে সেই উচ্চমার্গীয় সাধুর ধারণাটা ভেঙে গেল। সাধু এই প্রহসনে এক লম্পটের সঙ্গে বেরিয়েছে কলকাতা শহরের রাঁড়-ভাঁড়ের মজা দেখতে। দেখে মজে গেছে। ঠিক করেছে এই মজা সে আরও লুটবে সাধুগিরি বাদ দিয়ে। এই সাধুত্বের প্রতি বিরাগ এবং কনফেশন— সেটা ভাল না, শহরের মজা ভাল— এই নমুনা বটতলা ছাড়া আর কোথাও নেই। বটতলাকে সামাজিক অধঃপতনের টেক্সট হিসাবে উচ্চবর্গের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার, কিন্তু বটতলাই হল সেই সত্য-দর্পণ যেখানে সমাজের মুখোশ-পরা মিথ্যা ছবিটা নয়, মুখোশহীন আসল রূপটা ধরা পড়েছে। সেটা প্রধান ধারার লেখক-পাঠক-বুদ্ধিজীবীদের ভাল লাগেনি। বটতলা তা মান্য করেনি। সে তার পথে চলেছে। আসলে ওই সাধুর যে নিজস্ব ক্ষমতা-কেন্দ্রটাকে কাউন্টার করতে পারা, যা এক ধরনের সেল্ফ-কাউন্টারও, তাইই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে করে গেছে বটতলা— বিষয়ে এবং ভাষায়।

পূর্বোক্ত 'রাঁড় ভাঁড়...' রচিত হয়েছে ১২৭০ বঙ্গাব্দে, ইংরাজি ১৮৬৩ সালে। তখন ১৮৫৬ সালের অশ্লীলতা আইন চালু হয়ে গেছে। অথচ সাধু লম্পটকে বলছে, রাঁড় ভাঁড়ের কলকাতার মজা লুটতে চান তিনি, সাধু হয়ে থাকতে চান না— অশ্লীলতার আইনকে চ্যালেঞ্জ করলেন এই প্রহসনে সাধু— নাকি লেখক, যা সেকালের অশ্লীলতা বিতর্কের অন্যতম ঘটনা।

৩.৪. বটতলার বইয়ের দাম

বটতলার বইয়েব লক্ষ্য ছিল দাম কম বাখা— অনেক বিক্রি করে সেই কম দামের ঘাটতি ব্যালেন্স করা। আর তাতে সম্পূর্ণ ভাবে সফল বটতলা। উনিশ শতকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার দাম ছিল বটতলার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশি। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে খোঁজ করলেই দেখা যাচ্ছে ব্যয়বহুল ছিল কাগজ এবং ধাতু নির্মিত হরফ। এদের জোগান তত ছিল না। ধাতুর হরফ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সমানে চলছিল। তার ফলে যে সমস্ত হরফ শিল্পী বা কারিগর তাদের (কর্মকার পদবিধারী দেখে বোঝা যায় তাঁরা কামারের কাজ করতেন) পেশার বাইরে গিয়ে অথবা ধাতুকে ব্যবহার করে এতদিনের প্রচলিত পেশাকে এক্সটেন্ড করে হরফ নির্মাণ করছিলেন, তাঁদের দরও সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশি হাঁকছিলেন। যথেষ্ট মিস্ত্রি না থাকায় কয়েকজনকে দিয়ে অনেক কাজ করতে হচ্ছিল। এর ফলে সময়সাপেক্ষ হচ্ছিল এবং ব্যয়বহুলও হয়ে উঠেছিল ছাপাখানার সাজঘরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। কাগজ মিলত তিন ধরনের। তাদের গুণমান অনুযায়ী দাম হত। ভাল মানের কাগজের জন্য ভাল দাম দিতে গিয়ে বইয়ের দাম বেড়ে যেত। আমরা দেখছি, কাগজের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা দেখাচ্ছে সেকালের প্রকাশকরা— এর কারণ, ছাপাখানার নানা ধরনের অনিশ্চয়তা। যেহেতু ছাপার ব্যাপারে কালি, গ্যালি, পাটা ও মেশিনের ভার বহন করতে গিয়ে কাগজেব মোটা সারফেস উল্টো পিঠে ছাপার রেশ না তুলতে পারে। দেখা যাচ্ছে সেই ভাল কাগজের দাম বেশি। পাওয়া যাচ্ছে আরও কম। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ৪০টি ভাষায় দু'লক্ষ বারো হাজার বই প্রকাশ করেছে। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত মিশনের ১০ম কার্যবিবরণে বলা হয়েছে মোট সাতচল্লিশটি ভাষায় ধর্মপুস্তক ছেপেছেন ওঁরা। ১৮১৮ থেকে ১৮২২-এর মধ্যে কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটিকে তাঁরা এক ডজন বই সরবরাহ করেছেন। প্রিন্ট অর্ডার সাতচল্লিশ হাজার নয়শো ছেচল্লিশ কপি। এত বিপুল পরিমাণ বইয়ের কাগজ আনতে গিয়ে তাঁদের কালঘাম ছুটে গেছে। ওই কার্যবিবরণী থেকেই জানা যাচ্ছে— ভাল কাগজ আনতে এবং ছাপাতে তাঁদের বারবার অপেক্ষা করতে হয়েছে। যেমন হয়েছে পঞ্চানন কর্মকারকে হরফশিল্পী হিসাবে পাওয়ার পর পঞ্চানন মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে গিয়ে। অত ভাল কাজ আর কেউ জানতেন না। পঞ্চানন যা করবেন, যখন করবেন, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সে ভাবেই ছাপতে হয়েছে। নয়তো বিলেত

থেকে হরফ বানিয়ে আনতে প্রচুর খরচ। ১৭৯৫ সালে উইলিয়াম কেরির যে বাংলায় বাইবেল ছাপার ইচ্ছা হয়েছিল, তার জন্য বিদেশ থেকে হরফ আনতে খরচ পড়বে জানানো হয়েছিল ১৮ শিলিং প্রতি হরফ। ৫৪০ পাউন্ড কমপক্ষে। দশ হাজার বই ছাপাতে দরকার ৪৩৭৫০ টাকা। সেই সময় পঞ্চানন এসে বাঁচান। তাঁর তৈরি হরফ পিছু খরচ এক টাকা চার আনা।

এই তারতম্য সত্ত্বেও বাংলা বইয়ের দাম কিন্তু এতটা কমানো সম্ভব হত না সামগ্রিক খরচের নিরিখে। সেই খরচ কমানোর পথ বদলে ফেললেন বটতলার প্রকাশকরা। তাঁরা ভাল কাগজের বদলে চলতি কাগজ দিয়ে শুরু করলেন। কম দামি কাগজ, সুলভ ছিল মূলত সংবাদপত্রের জন্য ব্যবহৃত কাগজ— বইয়ে দিতেই অনেকে তার গুণমান নিয়ে নাক সিঁটকালেও খরচ এতটাই কম হল যে দামও কম রাখা সম্ভব হল। অধিকাংশ বইয়ের মলাট হত আরও পাতলা রঙিন কাগজে। খরচ আরও কম। কখনও বাঁধাই হত। তার মান অথবা খরচ, মেইন স্ট্রিমের বইয়ের তুলনায় কম করা হত বলে অন্যান্য বাঁধাই বইয়ের চেয়ে সেটার দাম কমই হত।

বটতলার বইয়ের সঙ্গে বই ব্যবসার একটা বিপুল বিস্তারি, বহু লোকজনের পেশা হয়ে ওঠা একটা কর্মকাণ্ড হওয়ার ফলে তাদের বিক্রি বেশি হত এবং অল্প অল্প করে সকলেই এমন একটা টাকা হাতে পেল, যা সব মিলে চলনসই। মালিকরা অনেকেই ধনী ছিলেন। এদের খরচ কমানোর ঝোঁক এত তীব্র ছিল যে অনেক সময় লেখক শিল্পী কারিগরদের টাকা পর্যন্ত দিতেন না। হরফের আকালও মিটে গিয়েছিল। কলকাতায় তখন প্রচুর ছাপাখানা। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে টিকে থাকার। তার জন্য দাম কম করার প্রতিযোগিতা। এই দাম কমের কারণে সাধারণ মানুষ এতদিন যে বই কিনতে পারত না, সেটা সে পারল। কিনল। এই সম্ভাবনা আরও কেনার দিকে নিয়ে গেল। অর্থাৎ উনিশ শতকে অর্থবান বাবুরা ছাড়াও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির যে বই কিনতে পারার ইচ্ছে, তার পেছনে আছে বটতলার বইয়ের দাম কম রাখার বাস্তবতা। নতুন একদল ক্রেতা তৈরি হল। এরা দাম কম বলেই হতে পারল, এদের অন্য কোনও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা নেই যাতে কিনতেই হবে। এই কিনতে পারার মতো দাম বটতলাকে জনপ্রিয় করেছে। ভোক্তা যা পছন্দ করছে তাকে ভোক্তার অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দাম রাখায় সে তা অর্জন করতে পারছে। এর ফলে বটতলার বইকে ঘিরে একটা অর্থনীতিও চালু হয়েছে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে। শুরু হয়ে গেছে নকল বই ছাপানো। যে বইয়ের বিক্রি বা কাটতি

বেশি তাকে গোপনে ছাপিয়ে ফেরিওয়ালা দিয়ে বিক্রি করিয়ে লাভের গুড় পুরোটাই হজম করা। তার জন্য বই রেজিস্ট্রি করা এবং সেই রেজিস্ট্রেশনের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া এটা ঠিক বই। তাছাড়া নকল না কিনে, বইতে দেওয়া ঠিকানা থেকে কেবলমাত্র বই কেনার আর্জি, এক সময় অধিকাংশ বইয়েই দেখা যাচ্ছে। আসল হোক কিংবা নকল— বটতলার বইয়ের দাম— এই বাজার আকর্ষণী পরিস্থিতিটার জন্য ভীষণ ভাবে দায়ী। 'বসাক অ্যান্ড সন্স, ১২৭নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, কলকাতা', থেকে প্রকাশিত (পঞ্জিকা ১৯২৬) থেকে একটা বিজ্ঞাপন উল্লেখ করা যাক, 'এরূপ লক্ষাধিক বিষয়পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য অধিক হওয়া উচিত কিন্তু দরিদ্র বঙ্গ দেশ তাহা বহনে অক্ষম বলিয়া ৬৲ টাকা মাত্র ধার্য্য হইল— আবার বহুল প্রচার জন্য গ্রাহকগণ অল্প দিন মাত্র ২২৷৷০ আড়াই টাকায় পাইবেন।'

৩.৫. বটতলার বইয়ের বিপণন

বিপণনের ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা বটতলার বইয়ের ক্ষেত্রে একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ছাপানো বই ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দোকানই ভরসা। প্রকাশকরা বটতলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মূলত উত্তর কলকাতার। কখনও বা মধ্য কলকাতায় তাঁদের বিস্তার। আমরা আগেই বলেছি প্রচ্ছদে 'কলিকাতা' লিখে দূরের পাঠককে নাগরিক মহার্ঘ্য হিসাবে উপস্থাপনের সাইকোলজি ছিল। তার ফলে দোকানের ঠিকানাও কলকাতার। সঙ্গত ভাবেই তার সঙ্গে পাঠকের ভৌগলিক দূরত্ব অনেক। গ্রাম-মফঃস্বলের পাঠকের কাছে সহজে মিলবে না। সে যেহেতু সচরাচর কলকাতায় আসে না, তার পক্ষে ওই বই কলকাতার দোকান থেকে সংগ্রহ করা সহজ নয়। তখন উপায় বের করলেন বটতলার বই ব্যবসায়ীরা।

বইওয়ালা—ফেরিওয়ালার মতো বই বিক্রি করার আইডিয়া বাংলায় প্রথম এল এই বটতলার হাত ধরেই। একজন ফেরিওয়ালা ব্যাগে বই নিয়ে, কাঁধে ব্যাগ, হাতে বই— গাড়ি ধরে চলে গেলেন মফঃস্বলে, গ্রামে— অন্যান্য জিনিসের মতো বইও ফেরি করে বিক্রি করতেন তাঁরা। প্রচুর বিক্রি হত। যাঁরা কখনওই বই কেনার কথা ভাবেননি, তাঁরাও বই কিনতেন। এঁরা ধার-রাকিতে বই বিক্রি করতেন, কারণ ক্রেতা-বিক্রেতা পরিচিত। ফলে, পাঠকদের সুবিধা হত আরও। বাড়ির মা-বউরা কিনতেন, বিধবা পিসি-মাসিরা কিনতেন, বাচ্চারা কিনত, বড়কর্তারাও কিনতেন আগ্রহ নিয়ে। পাঁচালি, ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ,

আইন, শিক্ষা বিষয়ক বই থেকে শুরু করে ভোজবাজি, তন্ত্রমন্ত্র, উপন্যাস, সামাজিক প্রহসন, নাটক, কাব্য-কবিতা সবই ভীষণ ভাবে বিক্রি হত। বিয়ের সিজনে বটতলার বইয়ের সঙ্গে আলতা, সিঁদুর, সুগন্ধী তেল ফ্রিতে দেওয়ার স্কিমও সেকালের ক্রেতাদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্র করে তুলেছে। চাহিদা অনুসারে অর্ডার যেত কলকাতায়। চাহিদা বুঝে নতুন বই নির্বাচন করা হত। সেই নতুন বই আবার এঁরাই নিয়ে যেতেন। মোবাইল সেলিং সিস্টেম— ঘুরে বিক্রির একটা বিরাট দল বটতলার বইকে জনপ্রিয় করেছে, বটতলার অর্থনীতিতে নিজেদের বেঁচে থাকার উপায় বের করেছে।

৩.৬. বটতলার বইয়ের বিজ্ঞাপন

বটতলার বইয়ের জনপ্রিয়তার পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান বটতলার বিজ্ঞাপনের। মূলত পঞ্জিকা এবং প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে তারা এক ধরনের প্রচার চালাত, যা প্রচলিত ধারার একদম উল্টো চিত্র। প্রচলিত ধারায় শিষ্ট ভাষায় শিষ্ট বিজ্ঞাপনের চল ছিল। তা ছাপা হত প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। বটতলা কিন্তু প্রধান ধারার সাময়িকপত্রে খুব কমই বিজ্ঞাপন দিত। তার টার্গেট রিডারের যোগ ওই সব পত্রপত্রিকার সঙ্গে ছিল না। ছিল পঞ্জিকার সঙ্গে। বিপুল বিস্তৃত জনসাধারণ তার লক্ষ্য। ঘরে ঘরে ব্যবহৃত পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন দিলে অবশ্যই 'মাস' ও 'ক্লাস' উভয়ের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। সেই সুযোগটাকে ব্যবহার করত বটতলা। কোনও পাওয়ার সেন্টার গড়া নয়, প্রচলিত পাওয়ার সেন্টারগুলোকে ভেঙে দিয়ে যাবতীয় মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে থেকে রচনা করত এইসব বিজ্ঞাপন। সেখানে বিস্তারিত ভাবে পাঠক আকর্ষণের বয়ান রচিত হত— বিচিত্র টাইপোগ্রাফিতে নামাঙ্কণ ও প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করে তৈরি হত এইসব বিজ্ঞাপন। এর নমুনা প্রধান ধারার বিজ্ঞাপনে মেলে না। আমরা এবার কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখব কীভাবে গড়ে তোলা হত এর নিজস্ব বয়ানটা—

সেকালের বিখ্যাত জনপ্রিয় ডিটেকটিভ লেখক পাঁচকড়ি দে'র বই প্রকাশ করত 'পাল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ৭নং নবকৃষ্ণ দাঁ লেন, (বি) জোড়াসাঁকো, পো. বড়বাজার, কলিকাতা।' পাঁচকড়ি দে'র উপন্যাসের ছকে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করে। তাদের রূপ-বুদ্ধি-রহস্যময়তাকে ব্যবহার করে পাঁচকড়ি দে যা লেখেন, তাকে বিজ্ঞাপিত করা হয়। অর্থাৎ মহিলা-কেন্দ্রিকতাকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞাপন

রচিত হয়। বটতলার বিজ্ঞাপন সেই আকর্ষণের কথা সরাসরি বলে। 'মনোরমা' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 'কামাখ্যাবাসিনী সুন্দরীরা প্রেমোন্মাদিনী হইয়া জগতে কি না করিতে পারে? তাহারই ফলে সেই কামিনীর কোমল করে এক রাত্রে পাঁচটি গুপ্ত নরনারী হত্যা।' অথবা 'মায়াবী' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনের ভাষা, 'মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, স্ত্রীলোক একবার ধর্ম্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে তখন তাহাদের অসাধ্য কর্ম্ম আর কিছুই থাকে না।' এই বিশ্বাস সামাজিক ভাবে প্রচলিত মতকে স্বীকার করে পাঠকের কাছে জানানো হয়, 'ঘটনার পর ঘটনা-বৈচিত্র্য বিস্ময়ের উপর বিস্ময়-বিভ্রম রহস্যের উপর রহস্যের অবতারণা— পড়িতে পড়িতে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়।' যা পছন্দ করবে জনগণ তাকে ব্যবহার করে রহস্য উপন্যাস লেখাতেই বটতলার ঝোঁক। যেমন পাঁচকড়ি দে'র বিখ্যাত উপন্যাস 'নীলবসনা সুন্দরী'— আবার মহিলার তাস ব্যবহার করলেন, সঙ্গে নীলবসনা। রহস্যে ভরা বাতাবরণ। 'ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ নাই, যাহাতে একটা না একটা অচিন্তিত পূর্ব ভাব অথবা কোনও চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্র বিকাশে পাঠকের বিস্ময় তন্ময়তা ক্রমশ বর্দ্ধিত না হয়।' একদিকে ফর্ম, অন্য দিকে উনিশ শতকের মতোই বিশ শতকের প্রথম পর্বে যেভাবে নারীকে কেন্দ্র করে আপামর পাঠকের অজানা রহস্য কল্পনা, তাকে ব্যবহার করেই কনটেন্ট গঠিত হচ্ছে বারবাব। বরং আরও তীব্র ভাবে যেমন 'জীবন্মৃত রহস্য' উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লেখা, ''মায়াবী' উপন্যাসের নারী দানবী জুমেলিয়াকে দেখিয়া চমকিত হইলে চলিবে না। আরও দেখুন, এই 'জীবন্মৃত রহস্যের' জুলেখা আরও কি ভয়ঙ্করী। এই জুলেখা সাহসে, প্রতাপে, কৌশলে, চাতুর্য্যে, শঠতায়, দম্ভে, গর্বে কোনও অংশে সেই সর্ব পরাক্রমশালিনী জুমেলিয়ার অপেক্ষা কম নহে। এই প্রলঙ্করী নারী-নাগিনী জুলেখার কার্য্যকলাপ আরও অদ্ভুত আরও চমৎকার আরও ভীষণ-ভীষণ হইতেও ভীষণতর।'

আরও একটা উপন্যাসের বিজ্ঞাপন একই ধরনের— 'পরিমল' নামের সেই উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লেখা— 'নারীর রূপতৃষ্ণা ও বিষয় লালসায় মানব কিরূপ দানব হইয়া উঠে।' সঙ্গে ছাপা হয়েছে ছবি— দু' দুটি খুনের পর ছুরি ধরা এক মহিলাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চালাচ্ছে দুই পুরুষ।

'রঘু ডাকাত' উপন্যাসের নীচেই ছাপা হয়েছে 'মৃত্যু-রঙ্গিনী' নামে একটি বটতলার উপন্যাসের বিজ্ঞাপন, 'এই উপন্যাসের নায়িকা সুন্দরী যথার্থই মৃত্যুরঙ্গিনী বটে! এই রমনী পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; নর হত্যা নারী হত্যা স্বামী হত্যা হত্যার

উপরে হত্যা। এই রমনী সাহসে, প্রতাপে কোনও অংশে রঘু ডাকাতের কম নহে। ইহাকে মেয়ে রঘু ডাকাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'

এ ভাবে নানা বিজ্ঞাপনের মধ্যে থেকে একটা আকর্ষণ আগ্রহের বয়ান আমরা পাই, যা মেয়েদের প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ, রহস্যময় টান, তাকে ব্যবহার করা। এটা বটতলার ঘুরে ফিরে বহু বিজ্ঞাপনেরই লক্ষ্য। একে আমরা বটতলার বিজ্ঞাপনের অকপটতা বলতে পারি। সে তার চাহিদা নিয়ে অকপট, ঘোমটাহীন, স্পষ্ট বাক্। তার যা মনে হয়েছে, সে তাই রচনা করেছে, তাতে যথার্থ অর্থেই সমাজমন ফুটে উঠেছে। এই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু, ভাষা, উপস্থাপনা রীতি থেকে আমরা সমাজমন চিনছি। যেমন, ধরা যাক 'উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা' বইয়ের বিজ্ঞাপনে সেই মেয়েরাই টার্গেট, তবে অন্য সামাজিক স্তরে 'বড় ঘরের বড় কথা, যুবতী সুন্দরীর গুপ্তপ্রণয়, কুলটা ও বিধবার অভিসার প্রভৃতি ভীষণ ঘটনাবলি পাঠে স্তম্ভিত হইবেন; প্রণয় ও ভালবাসার এমন চিত্র আর নাই।' সামাজিক ভাবে এই গোপন আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রে এল গুপ্তপ্রণয়, কুলটা ও বিধবার প্রেম। অর্থাৎ সামাজিক অন্যায় বা অনুচিতের প্রতি লোভ, যা করা উচিত নয়, তা করলে কেমন লাগে তার ঘটনা পড়া, পড়ে মনের তৃপ্তিবোধ করা, অবচেতনের সীমা লঙ্ঘন করা। যা অন্য মেয়ে করেছে, পাঠক পারেনি, এবার সেই পাঠ-অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে চায়, কোনও সামাজিক শাসন দিয়ে নয়, অর্থাৎ নিজেদের ভেতরেই যে আর একটা মানুষ, যে এই অনুশাসন মানে না, তাকে তৃপ্ত করে বটতলার বই, বটতলার বিজ্ঞাপন।

ঔপনিবেশিক ভার বহনের দায় ছিল না বটতলার কিন্তু নানা অনুষঙ্গ এসে ধরা দিয়েছে শাসকের সঙ্গে সঙ্গে বটতলার বইয়ের বিজ্ঞাপনেও। সেগুলো আমাদের চাহিদাকে তৈরি করেছে, তাদের ডিরেকশন বা অভিমুখ রচনা করেছে। যেমন, 'সরল ইংরাজী শিক্ষা' বইয়ের বিজ্ঞাপন ভাষা— 'এখন ইংরাজি ভিন্ন গতি নাই। তিন মাসে নিজে নিজে ইংরাজি লিখিবার ও শিখিবার ৩১২ পৃষ্ঠার সচিত্র চূড়ান্ত গ্রন্থ।'[২৭] একই বিষয়ে শ্রীশরচ্চন্দ্র শীল (১৫/৩ নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, পোস্ট বাগবাজার, কলিকাতা) প্রকাশন বিজ্ঞাপন করছে 'ইংলিস টিচার বা ইংরাজী পণ্ডিত' বইয়ের 'এই পুস্তক দ্বারা অতি অল্প দিনে ইংরাজিতে কথাবার্তা বলা, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সমুদয় বিষয় সুন্দররূপে শিক্ষা করিতে পারা যায়।' আবার 'কার্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদার্সের সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরি (৪৪ নং নিমু গোস্বামী লেন, পোস্ট বিডন

স্ট্রীট, কলিকাতা)' জানাচ্ছে— 'ইংরাজী ভাষা শিক্ষা' বইয়ের বিজ্ঞাপনে— 'ইংরাজি কাঁচা লেখা, পাকা লেখা, টানা লেখা, ইংরাজি রচনা ইত্যাদি যাহা যাহা ইংরাজ রাজ্যে আবশ্যক, তাহা সকলই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।' আমরা এই বিজ্ঞাপনগুলো থেকে উনিশ-বিশ শতকের ঔপনিবেশিক আইডেনটিটির পরিচয় দেখতে পাচ্ছি। একটা সামাজিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যা ভারতীয় অদলবদল সংক্রান্ত আইডেনটিটির বদল, তার রূপরেখা মিলছে এইসব বিজ্ঞাপনের আহ্বানে অথবা প্রত্যাখ্যানে। আমরা তার পরস্পর বিরোধী কিছু উদাহরণ দেখে বুঝে নেব এই সংশয়ে বাঙালির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গ্রহণ-বর্জন অথবা এদেশে ওদেশের মান্যতা বিষয়ে কী ধরনের দৃষ্টিকোণ ছিল।

'বৃহৎ জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত' (বসাক অ্যান্ড সন্স) বইয়ের ভিতর পাওয়া যাবে এদেশীয় চাহিদার যাবতীয় রকমফের। যথা, 'সংসারে গ্রহ, ফাঁড়া, বিপদাপদ, শনি, কার না আছে? ইহা সেই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের শুভাশুভ গণনা, পঞ্জিকা গণনা, কোষ্ঠীগণনা, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, বৃষ্টিগণনা, কার্য্যসিদ্ধি, নষ্টদ্রব্য উদ্ধার, বিবাহ, বন্ধ্যা ও পত্নীহীনযোগ, সুখদুঃখ এবং হাত দেখা, মনের কথা বলা, প্রশ্ন গণনা, স্ত্রীভাগ্য, গ্রহ শান্তি ও দৈববাণী গণনা, গর্ভস্থ সন্তান গণনা, রোগ ও তাহার ভোগ নির্দেশ, দৈবশান্তি প্রভৃতি জ্যোতিষের কোনও বিষয়ই বাকি নাই...' সবই এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এ সবই সম্পূর্ণ ভাবে বাঙালির অথবা ভারতীয় চাহিদার অন্তর্গত। এখানে মানা হয়নি পাশ্চাত্যের দাবি···

আবার 'ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় যৌবন পাঠ্য গ্রন্থ', 'যৌবন পথে' (বসাক অ্যান্ড সন্স)-র আইডিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাশ্চাত্যের সেক্স গাইড-এর ধারণা। বিজ্ঞাপনেও সে ভাবেই ভোক্তাকে আকর্ষণের কথা লেখা হয়েছে— 'ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে রমণীরা যে উপায়ে ইচ্ছা মতো ৫/৬ বৎসর অথবা ততোধিক সময় অন্তর সন্তান উৎপাদন করে— কি উপায়ে ও কিরূপ নিয়মে গর্ভ হয়' নমুনা মিলবে এই গ্রন্থে। পাশ্চাত্যের যে 'মডেল' যৌন ধারণা তাকে অনুসরণ করে জীবন উপভোগ। এই ধরনের বই প্রচুর বেরিয়েছিল বটতলা থেকে। যৌনতার প্রতি মানুষের যে গোপন আকাঙ্ক্ষা, অথচ সমাজে তা নিয়ে প্রকাশ্য চর্চার সুযোগ নানা সামাজিক অনুশাসনের ফলে কম, তারই সুযোগ নিয়ে এই জাতীয় বই, অধিকাংশ প্রকাশকই বের করতেন। সচিত্র হতেই হবে। চিত্রের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের কামনাকে পরিতৃপ্ত করবে। এই ধরনের বই বিক্রিও হত প্রচুর। তবে এই বিজ্ঞাপনে আলাদা ভাবে

'ইউরোপ আমেরিকা' উল্লেখ করে যে 'মডেল' ধারণার কথা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা অন্যান্য বিজ্ঞাপনে এত সরাসরি দেখা যায়নি।

আমরা 'টি সি দাস অ্যান্ড কোং; ৮২ নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা' প্রকাশিত একটি অদ্ভুত ধরনের উপহার দেওয়ার বইয়ের বিজ্ঞাপন পাই, যাতে আবার আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় মেলে। তখন কলের গান খুব জনপ্রিয়। সেই রেকর্ড-সঙ্গীতের বই একাধিক ছিল। এ বই তা নয়, তবে তার আকর্ষণকে অবলম্বন করে গড়ে তোলা। 'রেকর্ড কাকলী'— 'ইহা সৌন্দর্য্যের ঝরনা-আনন্দের খনি— মনের মতো প্রিয়জনকে উপহার দিবার পুস্তক। গায়ক গায়িকা, নর্ত্তকী, অভিনেত্রীগণ ও কবিগণের ফটো— সুন্দরীর মেলা!! মূল্য দেড় টাকা।'

এই ধরনের বই আসলে সমকালীন পুরুষের যে নারীর ধারণা, তার আকাঙ্ক্ষার মডেল হিসাবে— সেই নারী কেমন হবে— 'সুন্দরী' অথবা 'সতী সাধ্বী পতিব্রতা'— এরই পথ ধরে আসে। ফলে বটতলার বিজ্ঞাপনে অবধারিত ভাবে সেই সব নীতিশিক্ষামূলক বই দেখতে পাওয়া যায়, যাতে পাঠককে আকর্ষণ করা হয়, নারীর সচ্চরিত্র ও গুণবতী হয়ে ওঠার কৌশল শেখানোর মতো 'মহান' দায়িত্ব নিয়ে। এগুলোকে আমরা আমাদের সমাজের ঔপনিবেশিক সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ বলতে পারি। আমাদের মেয়েরা কেমন এবং কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ক দ্বিধা। এক দিকে 'দিদিমার রূপকথা', 'মহিয়ষী ভারতীয় নারী', 'নারীর পুরাণ', 'পৌরাণিক মহিলা'র মতো একটা ভারতীয় মডেল, অন্য দিকে 'স্ত্রীর সহিত কথোপকথন' (প্রফুল্লকুমার ধর প্রণীত 'প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, জীবনের অবলম্বন, রুগ্ন শয্যার সহায়, শয্যাগুরু সহধর্মিনীর সহিত ফুলশয্যার দিন হইতে আলাপ করিয়া, কিরূপে প্রেম স্থায়ী হইবে ও চিরদিন সুখে কাটিবে এবং স্বামী-স্ত্রীর শিখিবার ও স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা ও সুগৃহিণী করিবার সমুদয় বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।'), 'স্বামী স্ত্রী' (ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। 'সতী সাধ্বী অন্য নাম রমণী তোমার'— বসাক অ্যান্ড সন্স), 'গৃহস্থ জীবন' (টি সি দাস অ্যান্ড কোং। 'কর্মী ও গৃহীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়') প্রভৃতি বইতে অন্য একটা মডেল, যা এদেশীয় পুরুষকে তাদের বশ্যতাঅর্জনকারী নারীর ধারণা দিয়ে সাংসারিক শান্তির খোঁজ দিচ্ছে। এই বিজ্ঞাপনগুলো সেই গড়ে তোলা ধারণার নারীকে টোপ হিসাবে রেখে পুরুষদের বলে, এই বই নিজে পড়ুন এবং স্ত্রীকে পড়তে দিন। বিশেষত স্ত্রীকে পড়তে দিলে তাদের ঘর-সামলানো সতী শান্তি গৃহকর্ম নিপুণা নারীর চাহিদা মিটবে।

ধর্ম বিষয়ক বই, রান্নার বই, ডাক্তারি শিক্ষার বই (যেখানে অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি থেকে ঝাঁড়ফুক পর্যন্ত থাকত), ইন্দ্রজাল, গান লেখা, গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি মজার বই প্রচণ্ড চাহিদা নিয়ে বহু সংস্করণ বের হয়েছে নানা বটতলার প্রকাশনী থেকে। তবে সামাজিক নকশার প্রতি আকর্ষণ সেকালের মানুষদের বাড়তি চাহিদা যে ছিল তা বহু নকশার প্রকাশে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বোঝা যায় বসাক অ্যান্ড সন্স-এর একটি বিজ্ঞাপন পড়ে। সেখানে বাঙালির সামাজিক আগ্রহের সমস্ত স্তরকে স্পর্শ করে, ভাল ও মন্দের নীতিজ্ঞানে সেই সামাজিক অদলবদলকে চিহ্নিত করে, মূল্যায়ন করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 'কলিকাতা রহস্য' (ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ) 'কলিকাতা শহরের চমকপ্রদ নক্সা বিষদরূপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বড় ঘরের ঘরোয়া কথা, গুপ্তকথা, গুপ্ত রহস্য, কুহকিনীর কুহক লীলা, বিধবা চরিত্র, কপট প্রেম, পাশব বৃত্তি, ষড়যন্ত্র, পাপের গগনভেদি হাহাকার, মেয়েচুরি, জাল, জুয়াচুরি, খুন, হত্যা, বকধার্ম্মিকের ভণ্ডামি, থিয়েটার, নাচগান, রাজা জমিদার, চোর ডাকাইত, বদমাইস, লম্পট, গুণ্ডা প্রভৃতির সম্যক চিত্র দেখিবার পক্ষে ইহাই দর্শন স্বরূপ। আবার গুণীর গুণপনা, সতীর পতিভক্তি, নিস্বার্থের স্বার্থত্যাগ, সুশিক্ষার ফল, পবিত্র প্রণয়, প্রভৃতি নানাবিধ সদগুণ রাশি এই গ্রন্থে একাধারে চিত্রিত হইয়াছে।'

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিজ্ঞাপনের মধ্যে ভাল-মন্দ, এমন বাইনারি ডিভিশন গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু মন্দ আগে— তাদের সম্যক তালিকার পর ভালর ছোট্ট তালিকা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ জনমনস্তত্ত্বে লুকিয়ে থাকা অপরাধ অন্যায়— পাপের প্রতি লোভকে অনুধাবন করেই বিস্তারিত ভাবে সেই তালিকা বানিয়েছেন প্রকাশক। বটতলা জানে কীভাবে পাঠক বা ভোক্তাকে আকর্ষণ করতে হবে। দেশীয় গুপ্তবিদ্যা থেকে বড় মানুষের কেচ্ছা ছুঁয়ে পাশ্চাত্য নবোদ্ভূত থিয়েটার গান ইত্যাদির কাহিনিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটা মিশ্র বহুমুখী সামাজিক দ্বন্দ্বকে ধরতে চেয়েছেন লেখক— ধরাতে চেয়েছেন প্রকাশক। পাঠকও ধরতে দ্বিধা করেননি। চতুর্থ সংস্করণ হয়েছে। ক্রমশ চতুর্দশ হয়ে চতুর্বিংশে পৌঁছাতে বটতলাকে বেশি বেগ পেতে হয় না। বহু বই তার চেয়েও বেশি সংস্করণ হয়েছে।

পাঠকের দায় বইয়ের কাছে পৌঁছানো, এই সত্য না মেনে, বইকেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে গেছে বটতলা। প্রকাশকরা বিজ্ঞাপনে বারবার লিখেছেন, 'চিঠি দিলে নিজ ব্যয়ে পুস্তক তালিকা পাঠাইয়া থাকি সম্পূর্ণ

বিনামূল্যে।' (বসাক অ্যান্ড কোং) রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে পঞ্জিকার পাতা জুড়ে। আট-দশ পাতার ক্যাটালগ, যার মধ্যে লাল কিংবা সবুজ রঙের ছাপা। বিজ্ঞাপন থেকে ক্যাটালগ সর্বত্রই ভিপিতে বই পাওয়ার নিশ্চিত সুযোগের কথা বলা আছে দূরের পাঠকদের জন্য। সব মিলে বটতলা তার বিজ্ঞাপনের জন্য, গণসংযোগ তত্ত্বের যাবতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠক আকর্ষণের জন্য এবং প্রকাশকের দায়দায়িত্বসহ বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজনে একটা ধারাবাহিক দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে গেছে।

বইয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, সেকালের ছোট ছোট দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কিনে পাঠককে ঠকতে হয়েছে— বইয়ের পাতা নেই, চিরায়ত ধর্মগ্রন্থ সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি। সেই প্রতারণার দ্বিধা কাটিয়ে পাল ব্রাদার্স বিজ্ঞাপনে 'বিশেষ কথা' শিরোনামে আলাদা জোর দিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের নিকটে যে কোনও পুস্তক গ্রহণ করুন একটুও ছাড়-বাদ পাইবেন না... আমরা কখনও নকল পুস্তক দিই না, সুতরাং কাহাকেও ঠকিতে হয় না; সেজন্য শহর মফঃস্বলের সকলেই সর্বাগ্রে আমাদিগকে অর্ডার দিয়া থাকেন।' ভোক্তার কাছে শুধু পৌঁছানো নয়, ভোক্তার ভয়কে দূর করে আস্থার সঙ্গে পৌঁছানোর পেশাদারিত্বও অর্জন করতে চাইছে বটতলার এই ধরনের বিজ্ঞাপন। বারবার জানিয়েছে 'নকল হইতে সাবধান, যাহারা আমাদিগের পুস্তক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহারা কলিকাতার... ঠিকানাস্থ অঞ্চলে সন্ধান করিলে পাইবেন।' নতুন গড়ে ওঠা নাগরিক সংস্কৃতি এবং তার নাগরিক মন যে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য চায়, পেশাদায়িত্ব চায়, তাকে স্বীকৃতি দিয়েই গড়ে উঠেছিল বাঙালির সবচেয়ে বিস্তৃততর বটতলার বই ব্যবসা।

৪. বর্তমান সংকলনের বটতলার বই প্রসঙ্গে

এই সংকলনের সবচেয়ে পুরনো দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬২ সালে। এই ১৮৬২-৬৩ সালেই কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বের হচ্ছে। আর এই দুই সালে, বিশেষত ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত প্রচুর বটতলার বই, যার কারণ হয়তো হুতোমের বইটি বের হওয়া, আমাদের এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৮৬৩ সালের ১৯টি বই। দুটি ১৮৬২ সালের, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ১৮টি। একটি সময়কাল উল্লেখহীন, সেটি তাই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষতম রচনা হিসাবে রাখা হয়েছে। মোট ৪০টি বইকে

কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ২০টি বই ১৮৬২-৬৩ সালে প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডের একটি বই ১৮৬৩ সালের, বাকি ১৮টি ১৮৮৫ সালের মধ্যে রচিত। একটির সাল উল্লেখ নেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডেও ২০টি বই সংকলিত হয়েছে।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের দুটি বইয়ের একটি হল— লোকনাথ নন্দী রচিত 'ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল' (১৭৮৪ শকাব্দ, তখন ইংরাজি সাল লেখার প্রচলন খুব কম ছিল, মূলত শকাব্দ ও বঙ্গাব্দই লেখা হত প্রকাশকাল হিসাবে)। ৬ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি সাইজ। সামাজিক-পারিবারিক দুর্গতি দূর করতে অনেক সময় অবতারের মতো কেউ আবির্ভূত হন, পরে দেখা যায় সে ভণ্ড প্রতারক। তখন সাধারণ মানুষের হাতে তিনি শাস্তি পান, জয় হয় সত্য-ন্যায় ও শুভবোধের। বটতলার বইতে নানা সময় সাধারণ মানুষের 'শুভ-অশুভ', 'মঙ্গল-অমঙ্গল', 'ন্যায়-অন্যায়' বোধ নিয়ে রূপক কাহিনি গড়ে তোলা হয়। আড়ালে থাকে সমসময় বিষয়ক ইঙ্গিত। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে নকল বই না কেনার বিজ্ঞপ্তি এবং শেষ পৃষ্ঠায় লেখকের সিলমোহর। অনেকটা আজকের দিনে হলোগ্রাম লাগিয়ে বিক্রি করার মতো।

এই সংকলনে সামাজিক বিষয়ে বই বের হওয়ার যে প্রচলন ছিল, সেই ধারা মেনে একাধিক সমাজ-সম্পর্কিত বই যেমন আছে, তেমনি আছে সেকালের নতুন উদ্ভূত বিষয় কেন্দ্রিক বই, যা পপুলার কালচারের বৈশিষ্ট্য। বলা যায়, এই সংকলনে সেটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে— নানা নতুন বিষয়, যা এর আগে ছিল না বা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়নি, সেই সব বটতলার বইকে সামনে আনা। সামাজিক বিষয় বটতলার বৃহত্তর অংশ হিসাবেই আছে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে নানা সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় কীভাবে বটতলায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মানুষের আগ্রহে ও জনপ্রিয়তায়। যেমন, হাসির বই 'কৌতুক শতক'। প্রচলিত ছিল হাসির নাটক-কবিতা-নকশা। কিন্তু শুধু চুটকি বা মজার সংকলনেব কোনও ধারণা ছিল না। ১৮৬২ সালে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট হাসির গল্প বা চুটকিকে একত্র করে হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই সংকলনটি বের করেন। এই বইটি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছি এই কারণেও যে এটাই সম্ভবত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম কৌতুক-গ্রন্থ। আজকে যে মজার চুটকি বিষয়ে নানা বইয়ে বাজাব ছেয়ে গেছে তার প্রথম নিদর্শন 'কৌতুক শতক'। সেদিক থেকে এটা একটা ঐতিহাসিক বই। অন্যদিকে, এই বইতে যে ধরনের মজার কাহিনি আছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেকালেও

রোগের মত ওষধি।

প্রথম অঙ্ক।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ পাল কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ৶১০ আনা।

'রোগের মত ওষধি' বইয়ের প্রচ্ছদ

হিউমার ও স্যাটায়ারের প্রচলন ছিল, যা উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে হাসিয়েছিল। সামাজিক বিদ্রূপ আছে, সাহসী ভাবেই আছে। তবু, উনিশ শতকে ব্যক্তি আক্রমণের একটা প্যাটার্ন ছিল, একে অপরের বিরুদ্ধে নিন্দা-মন্দ-খেউর-কুৎসা, সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে সংযমের সঙ্গে আক্রমণ করা হয়েছে। বলা যায়, কড়া বিদ্রূপ কম, হিউমার বা নির্মল হাস্যরস বেশি। সবাইকে খুশি করতে যেটা জরুরি। আজও যত কৌতুকের বই বের হয়, সেই প্রথম বইয়ের আদর্শ অনুসরণ করে হিউমারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বটতলার বই তখন থেকেই আসলে 'বাজার'-এর ধারণাটা এভাবে আমাদের সামনে নিয়ে আসছিল। কোনও মার্কেট সার্ভে ছাড়াই বটতলা মার্কেটের সাইকোলজি নির্ভুল ভাবে বুঝতে পারছিল।

শতাধিক হাস্যরসাত্মক গল্প সংগ্রহ বের করার পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করলেও এই সংকলনে তার অনেক কম গল্প সংকলিত হয়েছে। জনপ্রিয় হলে পরবর্তী সংস্করণে একশো মাত্রাটি স্পর্শ করবেন এমন ঘোষণা সত্ত্বেও আর দ্বিতীয় খণ্ড বা দ্বিতীয় সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদিও এটা যে জনপ্রিয় হয়েছিল সেটা বোঝা যায়, পরের বছরই কলকাতা থেকে হুবহু একই সংস্করণ বের হয়। এটাও একটা ঘটনা। উনিশ শতকে বটতলার বই প্রথম দিকে শুধু কলকাতা থেকে বের হলেও পরবর্তী কালে ওই ধরনের বহু বই অন্য জায়গা থেকে বের হয়। বটতলা হয়ে গিয়েছিল একটা আইডেনটিটি। সেই আইডেনটিটি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গা, বর্ধমান কৃষ্ণনগর বহরমপুর হুগলি মেদিনীপুর ইত্যাদি নানা জেলা শহর থেকে বের হয় একাধিক বইপত্র। আর বের হয় ঢাকা থেকে। অবিভক্ত ভারতের ঢাকা তখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। 'কৌতুক শতক' এই সংকলনের একমাত্র বই, যেটি বেরিয়েছিল প্রথমে ঢাকা থেকে। পরের বছর কলকাতা থেকে। হরিশ্চন্দ্র ঢাকায় বাস করতেন। ঢাকা থেকে তাঁর বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল বটতলা। যেমন, একটি বই অমিতব্যয়িতার কুপ্রভাব নিয়ে রচিত এবং বিখ্যাত হয়েছিল— 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (সুলভ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৬৩, ২৬ পৃষ্ঠা), বাঙালি বিধবাদের নিয়ে রচিত কাব্য 'বিধবাবঙ্গাঙ্গ না' (ঢাকা, ১৮৬৩, পৃ. ৮২), বিধবা বিবাহের সমর্থনে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি স্বাক্ষর দিলেও ওই নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি, এই নিয়ে প্রহসন, 'ম্যাও ধরবে কে?' (ঢাকা, ১৮৬২, পৃ. ৬০), বিধবা বিবাহের সপক্ষে নাটক, 'শুভস্য শীঘ্রং' (বেঙ্গলি প্রেস, ঢাকা, ১৮৬২, পৃ. ৩৫)।

রঁাড়ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা।

প্রথম ভাগ।

বাঁচ মহেশ্বর পুর নিবাসী

শ্রীপ্যারিমোহন সেন

প্রণীত।

কলিকাতা।

শীলএণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭০।

'রাঁড়ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা' বইয়ের প্রচ্ছদ

বটতলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম একজন মহেশ্চন্দ্র দাস দে। একক ভাবে ২০টি এবং যৌথ ভাবে একটি, মোট ২১টি বইয়ের লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা গেছে তাঁকে। এই সংকলনে তাঁর চারটি বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৭৮৫ শকাব্দ, ১৮৬৩ খ্রি.), 'কিসে নাই কি পান্তা ভাতে ঘি' (১৭৮৫ শকাব্দ, ১৮৬৩ খ্রি.), বেশ্যা সম্পর্কে রচিত 'পড়-বাবা আত্মারাম' (১৮৬৩ খ্রি.) এবং নেশা বিষয়ে, 'নেশাখুরি কি ঝকমারি' (১৮৬৩ খ্রি.)। অনেক লেখক ছিলেন যাঁরা দু'চারটে বিষয়ে একাধিক বই লিখেছেন। আবার অনেকে বহু রকম বিষয়ে প্রচুর বই লিখেছেন। মহেশ্চন্দ্র দাস দে এই দ্বিতীয় গোত্রের লেখক। সমাজকে বাঁকা ভাবে দেখা এবং সংস্কারের মানসিকতায় অন্যায় অনাচারকে তুলোধোনা করা। বটতলার লেখকরা, বিশেষত এই ধরনের পাতলা টিপিক্যাল বটতলার বইয়ের লেখকরা নানা সামাজিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন, বিতর্ক তৈরি করতেন এইসব বইয়ের মাধ্যমে। মহেশ্চন্দ্রের বিষয় ও অভিমত সেই ধরনের সুযোগ বারবার তৈরি করেছে।

বটতলার ছোট আকৃতির বইগুলোর নাম প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে রাখার প্রচলন ছিল। বোঝা যায় বৃহত্তর বাঙালি সমাজে প্রবাদ খুব জনপ্রিয় ছিল। যে কোনও সামাজিক সমস্যাকে প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে চিহ্নিত করলে, ওই প্রবাদের প্রচলিত মনস্তত্ত্বর সঙ্গে জনসাধারণের মানসিকতা মিলে যায় বলে সেটা প্রবল ভাবে গৃহীত ও জনপ্রিয় হয়। ওই সামাজিক সমস্যাকে প্রবাদের অন্তর্নিহিত যে সমালোচনা ও টিপ্পনী, তার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করার ফলে গ্রন্থনাম হিসাবে সেগুলি পড়ার আগেই জনপ্রিয় হয়ে যায়। এই গ্রহণযোগ্যতার জনমনস্তত্ত্বটাকেই ব্যবহার করতেন বটতলার লেখকরা।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উনিশ শতকে নানা ধরনের বিষয়ে বটতলার বই লিখে, বহু লেখককে বই বের করার টাকাপয়সা দিয়ে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আপনার মুখ আপনি দেখ' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল হুতোমী ঢঙে কলকাতার ইংরাজি কেতার মানুষজনকে বাঁকা ভাবে ধরেছিলেন বলে। নব্য ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ বিরক্ত ও বিব্রত ছিল। ভোলানাথের এই আয়না দর্শনে সাধারণ মানুষ খুব উল্লসিত হয়। ভোলানাথ ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'হুতোম প্যাঁচা মহাশয়ের অনুগামী হইয়া লেখনী ধোরে এই... পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম; ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আমি লক্ষ্য করি নাই।' আবার সুকুমার সেন জানিয়েছিলেন, 'অনেক জোড়াতালি থাকিলেও ভোলানাথের

ECHHA. By ANON. A Dialogue. 8vo. pp. 14, ved. *Calcutta*, 1862. 1s.

শুনেছ?

হনুমানের বস্ত্রহরণ!!

একটী উপকথা মাত্র।

অজ্ঞতা কুসংস্কার প্রবল যাহারা
নিয়ত উথলে তার দুঃখ পারাবার॥

—০০—

হিতৈষী জানায়ে লোক করিতেছ ছল।
আকাশে চরিল মীন ত্যজিয়া কমল!!

কলিকাতা

সাহসযন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭০

মূল্য /১০ আনা মাত্র।

'শুনেছ? হনুমানের বস্ত্রহরণ!!' বইয়ের প্রচ্ছদ

যিনি লক্ষ্য অর্থাৎ কেন্দ্রিয় চরিত্র যিনি তিনি যে কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা বইটি খুঁটিয়া পড়িলে বোঝা যায়।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ, ২ খণ্ড, পৃ. ২০৭) এই সংকলনে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত একটি বই অন্তর্ভুক্ত হল— 'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' (১৮৬৩)। কেবলমাত্র সামাজিক বিষয় নিয়েই তিনি লিখতেন। এই বইটির বিষয় যুবতী কন্যার সঙ্গে ধনবান বৃদ্ধের বিয়ে। কন্যা বিক্রয় সমস্যা সেকালের করুণ একটি ব্যাপার। অসম বয়সী বিয়ের লোভে অর্থবান বৃদ্ধ পাত্র অর্থ ব্যয় করে কনেপক্ষের মুখ বন্ধ করে রাখে। কোনের মা কাঁদে সেই অসহায়তায়, দারিদ্রের কারণে টাকার পুঁটলি বাঁধেন তিনি।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের যে বইগুলো জনপ্রিয় সেগুলোর মধ্যে বহু সংখ্যক বইয়ের লেখক নাম একটা ছদ্মনাম। মুন্সী নামদার ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। সুকুমার সেন জানিয়েছেন এই তথ্য, 'মুন্সী নামদার সম্ভবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২ খণ্ড, পৃ. ১০৯) ছদ্মনাম গ্রহণের প্রচলনও সেকালে প্রবল ছিল। বিশেষ ভাবে বিতর্কিত সামাজিক বিষয়ে লেখালিখির কারণে। ছদ্মনামে লিখলে এবং বিরোধিতা করলে কেউ ধরতে পারবে না, মূল মানুষটিও অকপটে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন। সে ভাবেই মুন্সী নামদার ছদ্মনামে অকপটে লেখা চারটি বই আমরা নির্বাচন করেছি, যার দুটি এই খণ্ডে ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত বলে, আর বাকি দুটি অন্য খণ্ডে পরবর্তী কালে প্রকাশিত বলে। 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' এবং 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ'— যেখানে সেকালের রক্ষণশীল সমাজের মেয়ে দেখাটা ধরা পড়েছে। 'ভাল মেয়ে' 'খারাপ মেয়ে'র একটা সেট ধারণা ছিল। সে ভাবেই রক্ষণশীল সমাজ তাদের চেনা মেয়েদের দেখতে চেয়েছে, চিনতে চেয়েছে। যখন এদেশে রেনেসাঁর ভাবধারায় একদল মহিলা শিক্ষিত হয়েছে তখন সেই ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় সমকালীন মানসিকতা ও ভাবধারা লড়াই চালিয়েছে। সেই লড়াইটা কেমন ছিল ভাল করে জানতে চাওয়া হয়নি। যেহেতু উল্টোদিকটাই দেখা দস্তুর ছিল। এই বইগুলোর মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাবো সেই রক্ষণশীল সমাজটাকে, যেখানে সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার তর্কটাকে বটতলা কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরে লড়াই চালিয়ে গেছে। ওই সমাজ পরিবর্তনের উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণের ঠেলায় সে যখন আদরে আমন্ত্রণ পায়নি, তখন আরও প্রবল ভাবে নিজের বিপরীত অবস্থান নিয়ে সে সবের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে। আধুনিকতা আসার নানা বন্দোবস্তের দিকে তাকিয়ে সে সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন

তুলেছে, মেনে নিতে পারেনি। বটতলা সেই বিকল্প বয়ানটাকে হাজির করে বারবার। ফলে, বটতলার রক্ষণশীলতা অনেক সময়ে ভুল হলেও সেটা ছিল তার উনিশ শতকীয় আত্মপরিচয়ের অস্ত্র, যা নিয়ে সে লড়ে গিয়েছিল।

মেয়েদের যখন অপছন্দ করেছে বটতলা তখন দুই সতীনের ঝগড়া থেকে পড়াশোনা শেখা এবং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা অবধি অপছন্দ করেছে। এ ব্যাপারে সে অকপট। তার নারী বিষয়ক ধারণার সঙ্গে এসব মেলেনি। পছন্দ না করে সে বরং সন্দেহ করেছে এ সবের। ভেবেছে অগ্রগতির এই ধারণা টিকবে তো, নাকি শেষ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেবে এদেশের সমাজ কাঠামোকে। ফলে, রচিত হয়েছে 'হুড়্কো বউয়ের বিষম জ্বালা' (১৮৬৩), 'লুক্‌য়ে পিরীত কি লাঞ্ছনা' (১৮৬৩), 'রোগের মত ওষধি' (১৮৬৩) নামের নানা অসঙ্গতি বিষয়ক বটতলার বই। সামাজিক অসঙ্গতিকে বুঝতে চেয়েছে, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে পপুলারের জায়গা থেকে। তারই আর একটা রূপ ধরা পড়েছে বেশ্যা বিষয়ক টেক্সট— 'বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী' (১৮৬৩)-তে। বটতলার দেখার সঙ্গে ইউরোপীয় দেখার মিল নেই। পাশ্চাত্য যে খোলামেলা ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রচলিত করতে চেয়েছিল, প্রাচ্যর জায়গা থেকে বটতলা তার দুর্ভোগ দুর্দশা ও যন্ত্রণাকে বড় প্রকট করে দেখিয়েছে। বলা যায়, প্রাচ্যর পপুলার চেতনা দিয়ে এগুলোকে এক্সপোজ করে দেওয়া হয়েছে। আবার নারীর নানা লাঞ্ছনায় মুখর হয়েছে। বাল্যবিবাহের পীড়ন, বিধবাদের দুর্গতি নিয়ে তাই একাধিক বটতলার বই দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষীরোদগোপাল মিত্রর লেখা 'বাল্যবিবাহ উচিত নয়' (১৮৬৩) সে রকমই একটা বই, যেখানে সমস্যা বিষয়ে অভিমতটাই পোস্টারের মতো করে বইয়ের নামকরণে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনও দ্বিধা নেই। বহু বটতলার বই এভাবেই পপুলারের মন-মানসিকতাকে ধরেছে, আবার বৃহত্তর জনসাধারণকে ভাবাতে চেয়েছে।

'বাল্যবিবাহ উচিত নয়' বইতে ক্ষীরোদগোপাল মিত্র লিখেছেন সেই সমাজ-সচেতন বটতলার বিখ্যাত লেখক পরোপকারী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহের কথা— 'শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আমার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।' প্রচ্ছদে লেখা, 'শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা বিবেচিত ও সংশোধিত হইয়া প্রণেতার আদেশানুসারে প্রথমবার মুদ্রিত হইল।' ফলে, এই বইটি ভোলানাথ বিষয়ক বিশেষণের প্রামাণ্য উদাহরণ হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামের মানুষ মফঃস্বলের মানুষ এমনকী ছোট ও মাঝারি যত শহর ছিল সে সবের মানুষদেরও লক্ষ্য ছিল একটাই শহর— 'কলিকাতা'। যে কলিকাতায় নানা মজা নানা ঘটনা নানা আকর্ষণ আর বৈচিত্র্য। অফিস-কাছারি ট্রামগাড়ি বড় বড় বাড়ি হাওড়া ব্রিজ প্রভৃতি বিস্ময়কর নানা ব্যাপার। নানা জায়গার লোকজন আর ঠক জোচ্চোর বেশ্যা সাধু মিলেমিশে বিচিত্র অবস্থান। এসব নিয়ে স্বল্পালোকিত মানুষজনের প্রবল উৎসাহ। এসবের টান এবং সংশয় নৈতিকতা পিছুটানের ঐতিহ্যও কম নয়। সব মিলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা উনিশ শতকের ব্যাপক পরিমাণ সাধারণ মানুষ যারা জানতে চায় কলকাতা শহরের প্রকৃত পরিচয়। সেই কলকাতা শহর নিয়ে একাধিক বটতলার বই বেরিয়েছে। নতুন গড়ে ওঠা শহরের সত্যি-মিথ্যা নিয়ে, আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে। সাধারণ মানুষের এইসব নিয়ে প্রবল আগ্রহ, স্কুল কলেজ সভাসমিতি বিষয়ক বই তো রামমোহন বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্ররা লিখছিলেন, অন্য দিকটা, বলা যায় কাউন্টার কালচারের দিকটা ধরল বটতলা, সে লিখল 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা' (১৮৬৩) নামের অত্যাশ্চর্য বই। পপুলারের দিক থেকে কলকাতা দেখানো। বটতলার নানা উদাহরণের মধ্যে এটা অন্যতম প্রধান একটি বই।

কলকাতা শহর নিয়ে যদি আগ্রহ তৈরি হয় তাহলে তার অন্তর্গত উনিশ শতকীয় নতুন একটি লক্ষণ ছিল ইয়ং বেঙ্গল্ দলের উত্থান। এদেশীয় ভাবধারায় বিশ্বাসীরা তাঁদের পছন্দ করতেন না, ওঁরাও পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনযাপনের অবস্থান থেকে ওই দেশীয় ভাবধারায় বিশ্বাসীদের প্রাচীনপন্থী অনাধুনিক বলে বিবেচনা করতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে তারুণ্য আর ইংরাজি শিক্ষার নতুন বিশ্বাস এমন একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দিয়েছিল যে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন কলকাতা শহরের 'নতুন নবাব'। বটতলা ইয়ং বেঙ্গলের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেনি। ব্যঙ্গ করে বই লিখেছে, 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব' (১৮৬৩)।

ঔপনিবেশিক শাসনে তৈরি হওয়া সরকারি অফিস কাছারিতে প্রচুর শিক্ষিত বাঙালি চাকরি করতে ঢোকে। বিশাল কেরানিকুল তৈরি হয়। তার সঙ্গে অন্যান্য যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের লোক নিয়োগ করে বা অফিস চালায় তাদেরও ছুটির দিন সরকারি ছুটির দিনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয় শনিবার এবং রবিবার। বাঙালি এভাবেই নতুন একটা বিষয় পেল— সপ্তাহান্তিক ছুটি। এই ছুটির ধারণাটা এভাবে ছিল না। ইংরেজদের এ দেশে এসে প্রচলন করা। ফলে, প্রচুর মানুষের কাছে

এই শনি ও রবিবার আলাদা ভাবে আমোদ বিলাস ফূর্তির একটা প্রতীক হয়ে ওঠে। এই দু'দিন মানে এভাবে ছুটি কাটানো। কেউ যাচ্ছে কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি, কেউ যাচ্ছে ময়দানে হাওয়া খেতে, কেউ যাচ্ছে নেশা করতে, কেউ যাচ্ছে সোনাগাছি, কেউ যাচ্ছে জুড়িগাড়িতে গঙ্গার পাড়। এই দু'দিনের জন্য আলাদা সাজ আলাদা বন্দোবস্ত। আলাদা খরচ। প্রচুর অর্থ উড়ছে। বাঙালি নতুন লব্ধ ছুটির দিন উপভোগ করছে। বটতলা এই বিশেষ ব্যাপারটা দেখতে পায় এবং মানুষের উদ্দীপনার সঙ্গে মেতে ওঠাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমর্থনে-সমালোচনায় তুলে আনে। উইক এন্ড নিয়ে সে রকমই দুটো বই 'কি মজার শনিবার' (১৮৬৩) এবং 'হদ্দ মজা রবিবার' (১৮৬৩) সংকলিত হল। প্রথম বইটি শুরু হচ্ছে টিপিক্যাল বটতলার কায়দায়, যেখানে বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে একটা সামাজিক ছবির ভেতর ঢুকে পড়ছেন লেখক— 'ধন্য কল্কেতার সহর ধন্য শনিবার।/বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যাবাহার।।' আর দ্বিতীয় বইটি শেষ হচ্ছে উইক এন্ড অবসানের আক্ষেপসহ— 'এ দিকেতে রবিবার হল পরিশেষ।/চুকে গেল বাবুদের অশেষ আয়েস।।/তাড়াতাড়ি ধরাচূড়া পরিধান করি।/অফিসেতে যান সবে স্মরিয়া শ্রীহরি।।' এখন এই উইক এন্ড অভ্যেসে পরিণত হয়েছে, উনিশ শতকে সেটাই ছিল বটতলার লেখকদের কাছে এবং উনিশ শতকের আমজনতার কাছে অভিনব ব্যাপার। সেই বিস্ময়ের নথি এই দুটো বই সংকলিত হয়েছে।

আর একটি বিস্ময় এবং বিস্ময়ের নথি হল মুনসী আজিমদ্দীন প্রণীত 'কি মজার কলের গাড়ি' (১৮৬৩)। সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেলগাড়ি নিয়ে বিস্ময় এবং সে গাড়ি দেখতে যাওয়ার ধুম। দ্রুতগামী এই বিশাল যান দেখে সকলেই স্তম্ভিত। বইয়ের শুরুতে লেখা, 'বানিয়েছে রেল রোডের গাড়ি ধন্য সাহেব কারিকর।/এখন বিশ্বকর্ম্মার পূজা ছেড়ে ঐ সাহেবকে পূজা কর।।' এই বিস্ময়বোধ থেকে উচ্চারিত স্তুতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোটা বইটার বিষয় হয়নি। বিষয় হয়েছে এদেশীয় নরনারীর গাড়ি দেখার পরিকল্পনা ও রেলগাড়ি দেখা। প্রাচীন মন ও নবীন যানের দ্বন্দ্ব। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের টানাপোড়েন। উনিশ শতকের পালাবদলের আবিষ্কার বিষয়ে আনন্দ। সাধারণ মানুষের মন-মানসিকতা ও ব্যবহারিক জীবনের একটা ছবি ধরা পড়ছে এখানে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চয় খুঁজে পাবেন, কীভাবে শাসকের প্রয়োজনকে সেকালের ভারতবাসী অগ্রগতির সিঁড়ি বানিয়েছিল, সেই বিষয়ক উনিশ শতকীয় দ্বন্দ্ব।

মূল বইয়ের নানা সাইজ। কখনও ৬×৪ ইঞ্চি, কখনও ৬১/২×৪ ইঞ্চি আবার কখনও ৪×৩ ইঞ্চি মিনি সাইজের বই সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশই সস্তার কাগজে ছাপা। মলাট কখনও ওই বডি পেপারেই, কখনও রঙিন কাগজে। মূলত, সবুজ হলুদ নীল গোলাপি আকাশি লাল রঙের কাগজ। বাইরের প্রচ্ছদে নক্সাদার ফ্রেম। নানা সাইজের হরফে বইয়ের বিবরণ লেখা। ভেতরের পৃষ্ঠায় নম্বর দেওয়া কখনও মাথার ওপর মাঝখানে, অথবা কোনায়। আবার কখনও নীচের মাঝখানে, অথবা কোনায়। সেকালে শেষ পৃষ্ঠায় কিংবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'বিজ্ঞাপন' নামে যেটা থাকতো সেটা আসলে লেখক প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ অথবা নিবেদন। আজ যাকে বিজ্ঞাপন বলে, সেটা কখনই নয়। এই আলোচনা আগেও হয়েছে। বিজ্ঞাপনে বলা থাকত নকল বই না কিনে আসল বই কেনার কথা। চোর ধরে দিলে পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা থাকত। অনেক বইতে শেষে থাকত শুদ্ধিপত্র। দাম হত এক আনা থেকে চার আনা। ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ত। কখনও দেখা গেছে বইয়ের দাম ছাপানো নেই, অথচ লেখা আছে কোথায় খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। অনেক সময় জনহিতার্থে পাতলা বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। আবার অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী দাম ঠিক করে বিক্রি করা হত বলে দাম উল্লেখ থাকত না। সমস্ত ধরনের বই-ই এখানে সংকলিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় টিপিক্যাল বটতলার যাবতীয় উদাহরণ দু'মলাটে একত্রিত হল।

তথ্যসূত্র

১ বটতলার ছাপা ও ছবি, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৫৩

২. A Descriptive Catalogue of 1400 Bengali Books and Pamphlets, Rev. J. Long, 1855. এই তথ্যই রয়েছে Returns relating to the publishing in the Bengali Language in 1857, Rev. J. Long, 1859. সুকুমার সেনের লেখা Early Printers and Publishers of Calcutta, Bengali Past and Present, January-June 1968 প্রবন্ধ জানিয়েছে 'In North Calcutta the first printing press and publishing house, so far as I know, was Biswanath Dev's at Sobhabazar. It was a good press with old fashioned types and its publication were varied from school arithmatic (1818) to Kavi Kankan's Chandi (1823) edited by Ramjay Vidhyasagar'.

৩. কলকাতার আদি মুদ্রাকর ও প্রকাশক, সুকুমার সেন, ১৯৬৮, বটতলার ছাপা ও ছবি, আনন্দ, ২০০৮, পৃ ৬৭

৪. ছৈয়দ ছামেজা কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত 'জৈগুণের পুথি', বটতলা, শ্রীপান্থ, আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯৭, বইতে ব্যবহৃত ছবি নং ২৫
৫. বটতলা, শ্রীপান্থ, আনন্দ, ১৯৯৭, ছবি নং ২৬
৬. উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বাজার, আশিস খাস্তগির, মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই, স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদিত, অবভাস, ২০০৭, পৃ. ৪৭
৭. বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা (১৭৪৩ থেকে ১৮৫২), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯৯০, অনুসারে তাপ্তি রায় সাবণিটি তৈরি কবেছেন 'Disciplining the Printed Text: Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali Literature' প্রবন্ধে
৮. Returns relating to the Publishing in the Bengali Language in 1857, Rev. J. Long. 1859 অনুসারে তাপ্তি রায় নির্মিত সারণি, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে
৯. মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি (১৮৫৩-১৮৬৭), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩, অনুসারে তাপ্তি রায় সারণিটি তৈরি করেছেন পূর্বোক্ত প্রবন্ধে
১০. বটতলা, শ্রীপান্থ, আনন্দ, ১৯৯৭, পৃ. ২২
১১. Returns Relating to native Printing Presses and Publications in Bengal Extracted from the selections of the Records of Bengal Government, Rev. J. Long, Calcutta, 1855.
১২. English Popular Art, Lambert, Margeret, Marx, London, 1951.
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১৪. বটতলার ছাপা ও ছবি, সুকুমার সেন, আনন্দ, ২০০৮, ছবি নং ৬৬
১৫. বটতলা, শ্রীপান্থ, আনন্দ, ১৯৯৭, ছবি নং ১৯
১৬. বটতলার ছাপা ও ছবি, সুকুমার সেন, আনন্দ, ২০০৮, ছবি নং ৮২
১৭. প্রাগুক্ত, ছবি নং ২২
১৮. বটতলা, শ্রীপান্থ, ছবি নং ৬৩
১৯. প্রাগুক্ত, ছবি নং ৬৮
২০. বটতলার ছাপা ও ছবি, ছবি নং ৫৯
২১. প্রাগুক্ত, ছবি নং ৭২, ৭৩
২২. বটতলা, শ্রীপান্থ, ছবি নং ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২
২৩. প্রাগুক্ত, ছবি নং ৭৯
২৪. প্রাগুক্ত, ছবি নং ৮০
২৫. Language Society Power, Noam Chamski, Society Journal, London, 1991.
২৬. রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা, প্যারিমোহন সেন, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫
২৭. বসাক অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা, পঞ্জিকা, ১৯২৬।

ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল।

শ্রীলোকনাথ নন্দী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা।

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৪।

যাঁহার এই পুস্তক প্রয়োজন হইবেক তিনি বড় বাজারের শিবতলার গলিতে ১।৯ নং শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ী নন্দীর ভবনে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ০ আনা মাত্র।

[1862]

সতর্কতার বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি এই পুস্তক আমার নামের মোহর ব্যতীত দেখিতে পাইবেন তিনি চোরাও বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিবেন না এবং যদি অনুগ্রহ্ করিয়া আমার নিকটে আনিতে পারেন তবে পুরস্কার পাইতে পারিবেন।

শ্রীলোকনাথ নন্দী।

ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল

পুরাকালে চম্পানদীর তীরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে কতিপয় লোক বাস করিতেন এবং একজন কৃষ্ণবর্ণ মহাবীর্য্যবান দৈত্য ঐ গ্রামে রাজারন্যায় কর্ত্তৃত্ত করিতেন এবং তাহার বিকটাকার মূর্ত্তি ও অনিষ্টাচরণ দেখিয়া সকলে কম্পান্বিত কলেবরে বৎসরান্তে তাহার ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন, সেই পূজা তাহার জন্মদিনে হইত। যদ্যপি কেহ অর্থাভাবে তাহার পূজা দিতে অক্ষম হইতেন তবে ঐ কর্ত্তার আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না, একেবারে সেই রাত্রিযোগে আসিয়া ঐ গরীব দুর্ভাগার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক গ্রামের সমস্ত লোকের গৃহ ভগ্ন করিত। এরূপ উপদ্রবে (কিকরে) সকলেই আপনাদিগের পরিবারগণকে অর্দ্ধভোক্তা করিয়া বৎসরান্তে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া তাহার সেই পূজা নির্ব্বাহ করিতেন। এই অনিষ্টাচরণের জন্য গ্রামের লোকসকল একত্র হইয়া তাহাকে "ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল" বলিয়া পদবি দিয়াছিলেন।

পয়ার।

অনন্তর সাবধানে শুন বিবরণ।
দৈবে এক রাত্রে ঝড় হইল যখন॥
ভয়ঙ্কর ঝড় দেখি কাঁপে সর্ব্বজন।
তাতে পুনঃ ভোঽ শব্দ ডাকে ঘনে ঘন॥
এতেক্ দেখিয়া তবে সকলেতে কয়।
আসিছেন ঐ বুঝি মড়ল মহাশয়॥
বোধ হয় কোন লোক পূজে নাহি তাঁরে।
তজ্জন্য আসিতেছেন ঘর ভাঙ্গিবারে॥
এতেক দেখিয়া (রাম) উচ্চৈশ্বরে কয়।
কিদোষ আমার হে মড়ল মহাশয়॥
পূজা আমি দিয়াছি হইল দিনত্রয়।

কিহেতু ভাঙ্গিছ তবে আমার আলয়।।
নতুবা কি দেখিয়াছ মম অপরাধ।
অতএব আসিতেছ করিয়া প্রমাদ।।
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে লাগে মম ত্রাস।
অতএব তজ্জন্য হইতেছি হতাশ।।
তাতে যদি সন্তুষ্ট না হয়েন আপনি।
কল্য পুনঃ পূজা দিয়ে আসিব আপনি।।
শ্যাম। কি আর দেখিছ দাদা পড়িলা সঙ্কটে।
ঐ যে দেখ আসিতেছে মড়ল নিকটে।।
ভাঙ্গ২ বলি ঐ ভো২ শব্দ করিছে।
ওদিগ ভাঙ্গিয়া দেখ এদিকে আসিছে।।
কি হবে উপায় বল কি হবে উপায়।
"ভাঙ্গাগাঁয়ের মড়ল" এযে বড় দায়।।
মড়ল না হন তিনি মরণ যে হন।
আসিছেন দণ্ড হস্তে করিতে দলন।।

নবীন নামে শ্যামের পুত্র। হাঁবাবা ওটা কেগা বেটা রাত হলেই এসে উপদ্রব করে, ওবেটার জন্যে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় না, বাবা ও একজন বইত নয় তোমরা গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া ওবেটাকে বধ করিতে পারনা?

শ্যাম। চুপ্ বেটা চুপ্ এখনি শুনতে পাইলে
যমের দক্ষিণ দ্বারা দেখাইয়া দিবেন।

প্রসন্নময়ী শ্যামচাঁদের স্ত্রী।

পয়ার।

অবোধ বালক তুমি কিছুই না জান।
কিহেতু বলছ বাপু সভা বিদ্যমান।।
শুনিতে পাইলে সে করিবে ছার খার।
লাভহতে বধিবেক জীবন তোমার।।

তখন হইব আমি পাগলিনী প্রায়।
মাবলে ডাকিবে কেবা হায় হায় হায়॥
অন্ধের যষ্টি যেমন তুমি এক পুত্র।
কষ্টে তোরে বাচানু ফেলিয়া মল মূত্র॥
তাহার উচিত ফল এই কিরে হয়।
নিরাশ্রয়ী করে যাবি কহিয়া নির্দ্দয়॥
কখন বলো না বাপু এমন বচন।
তাহাহলে হারাইব মম প্রাণ ধন॥

নবীন। কেন মা বল্লেকি পাপ হয়, না তবে বলিবনা?

প্রসন্ন। না বাপু পাপ নয় এগ্রামের যে রাজা সে অতি দুর্দ্দান্ত তাহার বিপক্ষে যদি কেহ কোন কথা বলে, আর সে যদ্যপি শুনিতে পায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, একেবারে হুহু শব্দে আসিয়া ঘরসামেত সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিবে এবং গুম গাম করিয়া ভাদ্রমাসের তালের ন্যায় কিল মারিবে বাপু সে একটি২ কিল নয় কাল বল্লেই হয়। তাহার একটি কিল খাইলে সদ্য সদ্য রক্ত বমী করিয়া যমপুরে যাইয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়।

নবীন। সে বেটা৩ বড় দুর্দ্দান্ত মা সে বেটাকে কি কেও বধ করিতে পারেনা, আচ্ছা আমি বধ করিব (এই বলিয়া) এক গাছা বেত্র আনয়ন পূর্ব্বক হস্তে লইয়া দৌড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে তাহার মাতা আসিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বেত্র ফেলিয়া দিলেন ও নানা প্রকার সদ্বাক্য দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

নবীন। আচ্ছামা আমাকে যাইতে দিলেনা আমি বড় হয়ে লুচি সন্দেশ খাইয়া গাত্রে শক্তি হইলে বেটার যে, যেখানে আছে সকলকে একেবারে নির্ম্মূল করিব এই আমার প্রতিজ্ঞা রহিল।

প্রসন্ন তাহার স্বামীর দিগে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক।
ওগো শুন্‌চো তোমার ছেলে কি বলিতেছে?

শ্যাম। হাঁ শুনেছি বেটার "আঁড়ে নাই কাঁড়ে আছে" উনি এই বয়েসে সেই অসুরটাকে বধ করিতে চান। আবার বল্‌ছেন লুচি সন্দেশ খেয়ে গাত্রে শক্তি হইলে বেটাকে বধ করিব, বলে "কিসে নাই কি পান্ত ভাতে ঘি" আমরা ঐ দুষ্টের জ্বালায় অন্ন খেতে পাই না উনি লুচি সন্দেশ খাইবেন "ইস বেটার জাঁক দেখ"।

প্রসন্ন। (স্বগত)এমন দুষ্টের রাজ্যে করেছি বসতি।
যেখানেতে শস্য যুক্তা নন বসুমতি॥
অন্ন খাইতে পাই না কোথা পাব লুচি।
এ দুষ্টের রাজ্যে আর নাহি হয় রুচি॥
কি করিব হায় হায় কোথায় বা যাই।
কোথা গেলে সুখ পাব ভাবি আমি তাই॥
পুন বয় হয় পাছে দুষ্ট টের পায়।
তাহলে মারিবে কিল কিহবে উপায়॥
কোথা ওহে পরমেশ জগৎ সৃজন।
নিত্য নির্ব্বিকার তুমি নিখিল কারণ॥
বিপদে পতিত হয় মানব যখন।
শ্রীমধুসূদন বলে ডাকে ঘনে ঘন॥
অবশ্য বিপদ হতে সেই মুক্ত হয়।
অহল্যাকে উদ্ধারিলে দিয়ে পদদ্বয়॥
ভয়ঙ্কর কংসাসুরে করিলে নিধন।
এদুঃখ হইতে মোরে করহ মোচন॥

হায় জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কবে সেই আমাবস্যার রজনীর ন্যায় যে দুঃখ সকল, দূরীভূত করিয়া সুখরূপ পূর্ণ শশিকে ষোড়শ কলার সহিত উদিত করিবেন, হায় আমাদিগের কি দূরদৃষ্টি, সন্তানের খাদ্য লালসা না পূর্ণ করিয়া বরং শত্রু হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছি, হায় কবে সে দুষ্ট নিধন প্রাপ্ত হইবে তাহা হইলেই সুখচন্দ্রের মুখাবলোকন করিতে পারিব (এই বলিয়া ঐ শান্ত স্বভাবা স্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন হইয়া রহিলেন) এদিগে ভয়ানক

ঝড় ঐ মড়লের ন্যায় সমুদয় গৃহকে কদলী বৃক্ষ মত শয্যাশায়ী করিয়া গেল কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে রাত্রে আর বারি বর্ষণ হইল না। লোক সকল সেইরাত্রে ভগ্নগৃহের তৃণ সকল একত্র করিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া কেহ সিন্ধুকোপরে কেহ তৃণোপরে শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া যুক্তি করিবার মানসে এক গুপ্তস্থান নির্দ্ধায্য ও সময় নিরূপণ করিলে সকলে ঐ গুপ্তস্থানে নিরূপিত সময়ে আসিয়া মিলিলেন।

রাম। আস্তে আজ্ঞা হউক ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম হই তবে সমস্ত মঙ্গলত এতদিন দর্শন পাই না কেন।

হলধর পুরোহিত। আর বাপু এখানে মঙ্গল আর অমঙ্গল দুইই সমান। এই কএক দিবস হইল আমি পীড়িতাবস্থায় ছিলাম। তাতে আবার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" একে পীড়িতাবস্থায়, তাতে আবার কর্ত্তা কি করে গিয়াছেন সকলিত অবগত আছেন।

রাম। আজ্ঞে হাঁ সকলিই অবগত আছি (চুপে২) তজ্জন্যেই অদ্য এইস্থানে তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্তে এই সভাটি হইয়াছে। তিনি কিসে নিধন প্রাপ্ত হইবেন তাই আপনারা পরামর্শ করিয়া যাহা উত্তম হইবে সেই যুক্তি করিবেন। (ক্রমে ক্রমে সভার সমস্ত লোক সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন)।

পুরোহিত। ওগো রামবাবু সমস্ত ভদ্রলোকেরত আগমন হইয়াছে তবে আর বিলম্বে কি কার্য যাঁর যাহা বক্তব্য হয় বলুন্‌না কেন?

রাম। আজ্ঞে, আর বিলম্ব এমন কিছুই নাই তবে মহাশয় প্রথমে গাত্রোত্থান করিলেই আমার জীবনটা সফল বোধ করি। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব মহাশয়ের প্রথমে গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা করিতে উচিত হয়।

ব্রাহ্মণ সামান্য নন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের (কি) জানে মহাশয়।।
নারায়নে ব্রাহ্মণে নাহিক কিছু ভিন্ন।
হৃদয়ে ধরিলেন তাই ভৃগু পদ চিহ্ন।।
অতএব মহাশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন।
প্রথমে উঠিয়া কিছু করুণ বর্ণন।।

পুরোহিত। (স্বগত) বেটা মজালেরে আমার বিদ্যাত অষ্টরম্ভা কেবল শঙ্খ ধ্বনিতে ঠাকুর পূজা করিয়া পুঁটুলি বাঁধি এখন কি বলি, যাহা হউক কিঞ্চিৎ বলা যাউক। (প্রকাশ্যে) বিলক্ষণ আমাকে এতকেন তবে আপনারা অনুরোধ করিতেছেন আমার চাল কলা খেগো বুদ্ধিতে যাহা হয় তাই বলিব।

কৃষ্ণদাস। মহাশয় ওপ্রকার বাক্য মুখ দিয়ে নির্গত করিবেন না। আপনি আছেন বলিয়াই তাই আমরা এখনও জীবিত আছি। সে যাহা হউক, কিঞ্চিৎ আমাদিগের বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত বলুন। তাহা হইলেই আমরা বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় পাই।

পুরোহিত। মহাশয় আমি কি বলিব যিনি উদ্ধারের কর্ত্তা তিনিই বলিয়া উদ্ধার করিবেন। সেই জগদীশ্বরের স্মরণ করুন তিনিই উদ্ধার করিবেন।

গোপাল। তবু যৎকিঞ্চিৎ যা হয় বলুন না কেন?

পুরোহিত। (স্বগত) আমি যত পেচু কাটি ততই এরা চেপে ধরে মরণ কামড় দিয়াছে এ আর ছারাবার উপায় নাই যাহা হয় যৎকিঞ্চিৎ বলা যাউক। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তবে এক কর্ম্ম করা যাউগ আমরা গ্রাম শুদ্ধ লোক একত্র হইয়া তাহার চরণে ধরিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিগে তাহা হইলেই আর তিনি উপদ্রব করিবেন না।

হরিহর। (স্বগত) মন্দ নন ইনি যে নিজ মুখে ব্যক্ত করিলেন যে, আমার চাল কলা খেগো বুদ্ধি প্রকৃতই তাহা প্রকাশ পেলে। (প্রকাশ্যে) ভাল মহাশয় আমরা তাঁর কি অপরাধ করিয়াছি যে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তাঁর পূজার সময় পূজা দিয়াছি আর যদিও ক্ষমা চাই তা সে যে দুর্দান্ত ক্ষমা প্রার্থনা চাহিলে পাছে অপরাধ পর্য্যন্ত ঘাড়ে চাপিয়ে না দেন তাই ভাবি। ক্ষমা চাহিলে বেটা বলিবে যে, অবশ্য তোরা কোন দোষ করেছিস্ নতুবা কেহ দোষ বিহীন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে? আর আমি যদিও উপদ্রব করিয়া থাকি তবে তোরা মাপ চাহিবি কেন? বরং আমাকে আসিয়া বলিবি যে, কিদোষে আমাদিগের প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিতেছ।

গৌরদাস। বটেত হরিহর বাবু কিছু অসঙ্গত কথা বলেন্নি, তবে আর ওকথা বলিলে আমাদিগের উপর ক্রমে২ আরোও অত্যাচার করিবেক তাহা হইলেই তাহার

নিধন হওয়া দূরে যাউগ বরং আপনার পায়ে আপনি "কুড়োল মারা" গোচ হইবেক। শ্যামচাঁদের পুত্র নবীন তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি উঠিবামাত্র সকলে হাস্যপূর্ব্বক তাহাকে বসিতে বলিলেন তাহাতে নবীন কিঞ্চিৎ মনোযোগ না করিয়া বরং তাহাদিগকে সদ্বাক্য দ্বারা বলিলেন।

নবীন। মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ কালের জন্যে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুণ যদি অসঙ্গত হয় তবে হাস্য করিবেন।

গৌরদাস। ভাল বলিতে দাও না কেন উনিইবা কি বলেন শুনা যাউগ?

সকলে। আচ্ছা বলহে বল।

নবীন। আমরা সকলে একত্র হইয়া উহার নিকট গমন করি এবং সম্প্রতি উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে তিনি কি বলেন শুনা যাউগ তৎপরে আমি তাহার বিহিত করিব ওবেটার যেমন হস্তির মতন প্রকাণ্ড শরীর সেই মত হস্তির ন্যায় বধ করিব।

উমাকান্ত। ভাল সে যদি কর্কশ বচন বলে তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে উহাকে বধ করিবে।

নবীন। তাহা হইলে বেটাকে হস্তির ন্যায় ধরিয়া মারিব।

উমাকান্ত। ভাল হস্তির ন্যায় কিরূপে বধ করিবে।

নবীন। কেন হস্তিকে যেমন গর্ত্ত করিয়া ধরে তেমনি ওবেটাকে কূপের ভিতর ফেলিয়া মারিব।

উমাকান্ত। ওহে এ প্রস্তাবটি মন্দ নয় তবে চল সকলে যাওয়া যাউগ (এই বলিয়া সকলে গমনে উদ্যত হইয়া পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া সেই দৈত্যেশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক ডাকিলে তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন) "বেটারা কিজন্য ডাকিতেছিস্ বল্ শীঘ্র বল্" তখন গ্রাম সমেত লোক একত্র হইয়া যোড় করে কহিতে লাগিল।

শুন২ মহারাজ করি নিবেদন।
গত রাত্রে আমরা হয়েছি জ্বালাতন।।
অতএব সেই হেতু জিজ্ঞাসি তোমায়।

কি হেতু ভাঙ্গিলে তুমি মোদের আলয়।।
পূজার কারণে যদি ভাঙ্গিলে আলয়।
পূজা মোরা দিয়াছি হইল দিনত্রয়।।
এত শুনি বিস্ময় হইয়া দৈত্যেশ্বর।
কহিলেন আমি নাহি ভাঙ্গিয়াছি ঘর।।
তবে বুঝি অন্য কোন দৈত্য আসিয়ে।
এইরূপে নিজের ক্ষমতা প্রকাশিয়ে।।
আমাকে করিবে বধ মনে স্থির করি।
আসিয়াছে কোথা হতে অতি ত্বরাকরি।।
জানেনা যে আমি আছি শমন সমান।
এক চড়ে বাহির করিব তার প্রাণ।।
কোথা ওরে দুষ্ট বেটা বাহিরে আসিয়া।
যুদ্ধ নাহি কর কেন আছ লুকাইয়া।।
মনে যদি আছে রাজত্বের অভিলাষ।
বিক্রমে নির্ভর করি হওরে প্রকাশ।।
দিন হলে কোথায় হে লুকিয়া রহিবে।
রাত্রি হলে পেঁচামত বাহিরে আসিবে।।
এমন জীবনে তব কিবা আছে সুখ।
বরঞ্চ মরণ তোর শতগুণে সুখ।।
যাহ ওহে প্রজাগণ অন্বেষণ কর।
লুকিয়া থাকে সে যদি গ্রামের ভিতর।।
শীঘ্র আসি মোরে তোমরা দিবে সংবাদ।
একচড়ে ঘুচাইব জীবনের সাদ।।
এতেক কহিল যদি সে দৈত্য রাজন।
প্রজাদের হলো তবে প্রফুল্লিত মন।।
দৈত্যের চরণে তবে প্রণাম করিয়ে।
গমন করিল সবে বিদায় পাইয়ে।।

তাহারা কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া নবীনকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন বাপুহে সকলিইত শুনিলে এখন কি উপায় বল দেখি।

নবীন। আজ্ঞে হাঁ সকলি শুনিলাম এখন আমাদিগের নিধন করিবার কল হইল।

হলধর। ভাল কি প্রকারে নিধন করিবে?

নবীন। আপনারা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই আমি উহাকে বধ করিব সন্দেহ নাই।

হলধর। তার আর আটক কি আমরা সকলেই তোমাকে অবশ্য সাহায্য করিব ওবেটা যেন আর না বাঁচে এই প্রকার করিবে।

নবীন। (চুপে২) কোথায় একটা ভগ্ন কূপ আছে বলিতে পার?

হলধর। আছে আছে এই গ্রামের প্রান্ত ভাগে একটি বন আছে সেই বনের ভিতর একটি ভগ্ন কূপ আছে।

নবীন। ভাল সেটা যে আছে তা দৈত্য বেটাত জানে না?

সকলে। না জানে না।

নবীন। তবে বেস্ হয়েছে এক কর্ম্ম কর তোমরা সকলে একত্র হইয়া গুপ্তভাবে একটি কাল কাগজের বিকটাকার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ কূপের অনতি দূরে রাখিয়া তোমরা লুকাইয়া থাকিবে কিন্তু আমি যখন ডাকিব তখন সকলে শীঘ্র আসিবে।

এই কথা বলিলে সকলে সেইরূপ প্রস্তুত করিয়া স্থাপিত করিল। পরে এক জ্যোতস্না রাত্রে নবীন ঐ দৈত্যের নিকট যাইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মহারাজ একটা বিকটাকার মূর্ত্তি এই গ্রামের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্য কম্পান্বিত কলেবরে বাহির হইয়া বলিল চল্ দেখাইয়া দিবি চল।

নবীন। (ক্রন্দনস্বরে) না আমি জাবনা তাকে দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।

দৈত্য। আরে বেটা আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি তবে আর ভয় কি একচড়ে তাকে গুঁড়ো করিব তুই আয়।

নবীন। আজ্ঞে তবে চলুন্।

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতগামী হইয়া সেই বনে আসিলে নবীন তাহাকে দূরে হইতে দেখাইয়া দিল তাহাতে সে পূর্ণিমার রাত্রে কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখিয়া একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া যেমন উহাকে মারিবার জন্য ধাবমান হইয়াছে ওমনি তৎক্ষণাৎ সেই কূপ মধ্যে পতিত হইল।

নবীন। চীৎকারপূর্ব্বক। ওহে সকলে এসোহে, কে কোথা আছ হে। আজ মড়ল ফাঁদে পরেচে হে, তোমরা শীঘ্র এসোহে এই বেলা বধ করোহে এইকথা শুনিবামাত্র সকলে ঐ দিগে ধাবমান হইয়া জিজ্ঞাসিলেন যে, নবীন কি করিতে হইবে শীঘ্র বল।

নবীন। তোমরা সকলে একত্র হইয়া যে, যেখানে পাবে মৃত্তিকা, ইট, কর্দ্দম আনিয়া ঐ কূপকে শীঘ্র করিয়া ভর্ত্তি কর, পুনরায় ও যদি উঠে তাহা হইলে আর এক জনকেও জীবিতমান রাখিবে না আর আমরা কয়জন উহাকে বাঁশ দিয়া আঘাত করিগে, কি জানি পাছে সে যদি এর মধ্যে উঠে পরে?

এই কথা বলিবামাত্র সকলে মৃত্তিকা ও কর্দ্দম আনিয়া ঐ কূপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল আর নবীন ও আর২ লোক ঐ সকল ইট কর্দ্দম বংশ দিয়া গাঢ় করিয়া বসিয়া দিতে লাগিল তাহাতে ঐ দৈত্য অন্তকালে নবীনকে এই বলিয়া সম্বোধন করিল যে নবীন পরমেশ্বর আমার অনিষ্টাচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া বোধ হয় তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন অতএব তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দি। এই বলিয়া জগদীশ্বরের স্মরণ পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

কৌতুক শতক

অর্থাৎ কৌতুকপূর্ণ
গল্পাবলী।

প্রথম ভাগ।

"——অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক
সংগৃহীত

ঢাকা

নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত।
১২৬৯ সাল।
মূল্য ।০ আনা মাত্র।

[1862]

ভূমিকা।

ইহাতে যে সকল কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটী ইংরাজী হইতে অনুবাদিত, কোনটী প্রবাদ হইতে পরিগৃহীত, কোন কোনটী বা স্বকপোল কল্পিত। একশতটী কৌতুকপূর্ণ কথা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানী প্রচারিত করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখানীতে কেবল কয়েকটী কথামাত্র প্রচারিত হইল। এরূপ অপূর্ণ অবস্থায় এখানী কেন প্রচারিত হইল, গ্রাহকগণ এই প্রশ্ন করিতে পারেন, তদুত্তরে বিজ্ঞাপ্য এই যে, এই কৌতুকশতকের কিয়দ্দংশ অবকাশরঞ্জিকায় প্রকাশিত হইলে, কৌতুকপ্রিয় বয়স্যবর্গ ঐ সকল কথা পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিতে এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন যে, ইহাকে অপূর্ণ কলেবরে প্রচার করিতে আমাকে অগত্যা বাধ্য হইতে হয়। পাঠকগণ যদি এই কটী কৌতুক কথা পাঠ করিয়া কৌতুহল প্রকাশ করেন, একশতের অবশিষ্ট কথাগুলি অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে যে, কৌতুকপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস কর মহাশয় এই পুস্তকের লিখিত কৌতুক কথাগুলির অধিকাংশ লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

কৌতুক-শতক

"ইতর পাপফলানি যথেচ্ছয়া বিতর
তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ!"

নীতিরত্নম।

হে চতুরানন! তব যত ইচ্ছা হয়
অন্যান্য পাপের ফল আমার ললাটে
লেখ; কিন্তু ব্যগ্রতাপূর্ব্বক নিবেদন
এই মম, অরসিকজনের নিকট
রহস্য কথনরূপ যে পাপের ফল,
লিখোনা লিখোনা সেটী আমার কপালে!
রত্নাকর গর্ভে জন্মে বিবিধ রতন
মহামূল্য; কিন্তু তাহে আবার যেমন
শামুক প্রভৃতি জন্মে—হায়! সে প্রকার
কল্পনাজননীগর্ভে জন্ম আমার।
বড় ভাই যাঁরা তাঁরা কম কেহ নন,
এক একগুণে খ্যাত এক একজন,
মধুরভাষিতাগুণে প্রসংশিত কেহ,
লালিত্যে লভিলা কেহ সকলের স্নেহ;
মধুপগুঞ্জনতানে কেহ করি গান,
কাড়িয়া লইয়া পাঠকের মন প্রাণ।
দাদাদের গুণগ্রাম মনে হলে পর

অতিশয় ঘৃণা হয় আপনা উপর!
না বুঝি হরিষ আমি না বুঝি বিষাদ,
না বুঝি সময় আর না বুঝি প্রমাদ,
যে আমার হাত ধরে তখনি তাহারে
বদন ভ্রুকুটী কোরে চাই হাসাবারে,
সে ভ্রুকুটী দেখিয়া কৌতুক প্রিয়জন
অবশ্য অবশ্য হন সহাস্য বদন।
রসিকের রসাভাষ যারা নাহি বোঝে,
তারাই কেবল মোর দোষগুলি খোঁজে!
কোথায় করেছি আমি প্রমদার সনে
প্রেমালাপ কৌতুকীর হৃদয়রঞ্জনে;
অরসিকে না পেয়ে সে রসের আস্বাদ,
অশ্লীল বলেছি বলে দেয় অপবাদ।
শিশুগণে নীতিশিক্ষা দেবার কারণ,
করিনাই আমি কিছু জনম গ্রহণ,
করিতে প্রাচীনচিত্তে বিবেকসঞ্চার,
হয় নাই হয় নাই জনম আমার।
কৌতুক শুনিতে ব্যগ্র যেসব তরুণ
তরুণী, তাঁরাই মোরে গ্রহণ করুন।
রাজা রাজমহিষীকে হাসায় যেমন,
বিদূষক বলে নানা রহস্য কথন,
সেরূপ রহস্য আমি নিয়ত করিব,
পাঠক পাঠিকাগণে সুধু হাসাইব।

কৌতুকশতক।

কথারম্ভ।

একজন কৌতুকী এক নাপিতকে কৌতুক করিয়া কহিল, "ওরে তুই কখনো বানরকে ক্ষৌরী করেছিস?" নাপিত উত্তর করিল, "না মশায়! তাতো কখনো করি নাই, তবে কি না আজ যদি আপনি আমার কাছে খেউরী হন, তা হলে আর আমার এ দোষ টুকী থাকে না।"

অমাবস্যার রাত্রি ঘোর অন্ধকার, দুই বন্ধু চলিয়াছেন, সম্মুখে একটী বৃহৎ পুকুর। একজন তাহাতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল; আর এক বন্ধু বন্ধুর এই অবস্থা বুঝিতে পারিয়া পারে দাঁড়াইয়া কহিল, "বন্ধু! তুমি কি মরেছ? যদি মরে থাকো ত বলো, আমি তোমার সৎকারের জন্যে চেষ্টা পাই।" বন্ধু জল হইতে উত্তর করিল, "না বন্ধু! আমি মরি নাই, কিন্তু আমার বাক্ শক্তি রহিত হয়েছে।"

জ্ঞানদায়িনীসভায় একদা এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, "আলোকদান বিষয়ে সূর্য্য কি চন্দ্র অধিক প্রসংশনীয়?" সভাস্থ নব্য সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "হে সভ্যগণ: আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা এই মীমাংসা হইতেছে, আলোকদান বিষয়ে চন্দ্রই অধিক প্রসংশার্হ। যেহেতু দিবসে যখন চতুর্দ্দিকে আলোকে পূর্ণ থাকে সূর্য্যদেব তখন স্বকীয় জ্যোতিঃ বিতরণ করেন, কিন্তু যখন নিশাআগমনে দিক্‌সকল গাঢ়তিমিরাচ্ছন্ন হয় চন্দ্র সেই সময় স্বীয় সুধাময়-কিরণ বিতরণ করিয়া তিমিরপুঞ্জ নষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব চন্দ্রই অধিক প্রসংশনীয়।"

একজন সুরসিক কবি গবর্ণমেন্টের নানা বিষয়ে ট্যাক্সগ্রহণে ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবতীললনাদিগের সৌন্দর্য্যের উপর ট্যাক্স বসাইতে পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, যুবতীরা প্রত্যেকে আপন২ রূপলাবণ্যের তারতম্য বিবেচনা পূর্ব্বক এই ট্যাক্স নিরূপণ করিয়া দিবে। আসেসরের প্রয়োজন নাই। এ উপায়ে অনেক ট্যাক্স আদায় হইতে পারে।

একজন গল্পীপুরুষ কহিতেছিল, এবার আমার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধে আর কিছুই করিতে পারি নাই কেবল পায়স পিষ্টকের হ্রদ করিয়াছিলাম। এইকথা শুনিয়া আর একজন কহিল, গত সন ওলাওঠায় আমার পিতার মৃত্যু হয়, তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধে কিছু পাকা খাওয়ান হয় নাই; কিন্তু তবুও কেবল শুক্তানীর ফোরণ দেওয়ার জন্য জমিদারী হতে ৫০০ মণী পাঁচ নৌকা সর্ষা আসে।

একজন ডাক্তারের অপত্যস্নেহ এত প্রবল ছিল যে তিনি যখন সন্তানদিগকে প্রহার করিতেন তখন তাহাদিগকে "কোলেরাফারম" দিয়া অচৈতন্য করিয়া লইতেন।

কোন এক রসিক পুরুষের প্রতি তাঁহার স্ত্রীর অকারণে সন্দেহ জাগিয়াছিল। কোন কারণবশতঃ অধিক রাত্রিতে উপস্থিত হইলে, নায়ককে "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" "না এলেই হতো" ইত্যাদি ব্যঙ্গ শুনিতে হইত। কয়েকদিন পর তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "ওহে! তোমার সে কেমন, আমায় একবার দেখাতে পার?" নাগর কহিল "কেমন তা আমি একমুখে বর্ণনা কত্তে পারিনে, আমার কাছে তার একখানি চিত্রপট আছে, দেখ্‌তে চাও ত দেখাতে পারি।" নাগরী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কই দেখি২" নাগর অমনি তাহার সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া কহিল, "এই দেখ।"

এক কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতিবৎসর এক একটী করিয়া কন্যা জন্মিতে লাগিল। কুলীনের কন্যা ভারি গলগ্রহ। ব্রাহ্মণ তবুও প্রথম২ কন্যাকটীর আদুরে নাম রাখিলেন, যথা; সোহাগিনী, সৌদামিনী, রাজেশ্বরী, আদরিণী ইত্যাদি। তারপর খুদী, পাঁচী, ভূসী গোচেরও কটী নাম রাখা হইল। তবু মেয়েই হয়। ব্রাহ্মণ অবশেষে ক্ষেমঙ্করী নাম রাখিলেন, অভিপ্রায়, এতেও যদি মেয়ে হওয়া ক্ষান্ত হয়। তাহা হইল না, আবার এক মেয়ে জন্মিল। ব্রাহ্মণ এবারে বড় বিরক্ত হয়ে সেটীর নাম রাখিলেন "আর না"।

এক পেটুক গল্প করিতেছিল, আজ আমরা এক হাঁস কবাব করে খেয়েছি। তার স্বাদের কথা কি বোল্‌বো। একজন শ্রোতা কহিল "তোমরা কে কে?" পেটুক

কহিল "আমি আর হাঁস।"

নব্য সম্প্রদায়েরা দুই ব্যক্তি এক ময়রাণীর দোকান হইতে সন্দেশ মিঠাই ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া উত্তমরূপে জলযোগ করিলেন। শেষে ময়রাণী মূল্য চাহিলে তাঁহারা কহিলেন ময়রাণি! প্রলয় কাকে বলে জান?—জাননা? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ গিয়াছে, কলিযুগ মোটে ৪৩২০০০ হাজার বৎসর, এবছর তার ৪৯৬৩ বছর যাচ্ছে, আর ৪২৭০৩৭ বছর বাকী আছে। এই কবছর গেলেই প্রলয় হবে। তাবাদে আবার এসব ফিরে আস্‌বে, তখন আবার আমরা তোমার দোকান হতে এন্নিধারা সন্দেশ মিঠাই নে খাবো। তা এখন আমাদিগে ধার দাওনা কেন, প্রলয় পরে যখন এন্নিধারা আবার খাবো তখন দাম দোবো। ময়রাণী কহিল "ক্ষেতি কি? গেছেবারের হিসাব চুকিয়ে দাও।"

একজন সরলমনার এক মুখস্বর্বস্ব বন্ধু ছিল। সরলহৃদয় বন্ধু কোন বিপদে পতিত হইয়া মুখসর্ব্বস্ব বন্ধুকে ব্যগ্রতাপূর্ব্বক কহিল "বন্ধু! কাল প্রাতঃকালে আর কোন কাজে না যেয়ে আমার বাটীতে অবশ্য একবার আস্‌বে।" মুখসর্ব্বস্ব কহিল "কাল আমি শেষে থেকে ভুঁএে পা না দিয়েই তোমার বাড়ীতে আস্‌ব।"

একজন অধ্যাপকের নিকট উদার নামে একজন শিষ্য অধ্যয়ন করিত। কিছু দিন পর উদার উপাধ্যায়ের আলয়ে থাকিয়া পিতৃ বিয়োগের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শোকাকূল হইল। উপাধ্যায় তাহাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন, দেখ উদার! সংসার কিছুই নয়, সকলকেই এক দিন না এক দিন মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবে, আর আক্ষেপ করিলেও মৃত মনুষ্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না; অতএব মৃত ব্যক্তির নিমিত্তে আক্ষেপ করা বৃথা। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন—

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদাবেদাম্মত।।

উদারের মনে এই উপদেশটী বড় ধরিল। সে ক্রমে২ এই উপদেশটী স্মরণ করিয়া পিতৃশোক সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইল। কিছু দিন পর উপাধ্যায়ের এক শ্রাদ্ধের

সভায় নিমন্ত্রণ হইলে উপাধ্যায় আপনার একটী অল্পবয়স্ক সন্তান এবং উদারের সহিত গমন করিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত। তিনজনে এক পুষ্করিণীর তীরে জলপান করিয়া শয়ন করিলেন। পথশ্রান্তে উপাধ্যায় এবং তাহার পুত্রের নিদ্রা হইল। উদারের নিদ্রা হইল না। কিছু কাল পরে উপাধ্যায়ের সন্তানটী নিদ্রার ঘোরে গড়াইয়া গিয়া পুষ্করিণীর জলে পড়িল। পরামাত্র উদার মনে২ কহিল উপাধ্যায় কহিয়াছেন "কৃতস্য করণং নাস্তি" কৃত কর্ম্মের করণ নাই, গুরুপুত্র যখন জলে পড়িয়া গিয়াছে তখন আর শোচনা কি? এই ভাবিয়া আর বালকটীকে জল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইল না। বালকটী কিছু কাল হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করতঃ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। উদার তাহা দেখিয়া মরিয়াছে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া ভাবিল "মৃতস্য মরণং যথা" "মৃত ব্যক্তির আর মরণ নাই" অতএব আমি নিদ্রা যাই। উদার নিদ্রা গেল। কতক্ষণ পর রজনী প্রভাত হইল। উপাধ্যায় জাগৃত হইয়া দেখন পুত্রের শব পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছে। অমনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। উদার জাগৃত হইল। উপাধ্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন উদার! আমার সন্তানটী কেমন করিয়া মরিল? উদার আনুপুর্ব্বিক সমুদয় কহিল। উপাধ্যায় শুনিয়া কহিলেন, দূর নির্ব্বোধ! আমার উপদেশের ভাল মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিস। উদার তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কেবল বুঝি আমার বেলাই "কৃতস্য করণং নাস্তি" আর আপনার বেলায় না?

কোন জমিদারের একজন মুখসর্ব্বস্ব মোহরের ছিল। মোহরের যে সকল হিসাব পত্র লিখিতেন তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিত। জমিদার ঐ সকল ভ্রম জানিতে পারিয়া একদা মোহরেরকে তাম্বী করিয়া দিলেন, যদি ভবিষ্যতে তোমার এরূপ ভুল হয়, দণ্ড করিব। দৈবাৎ তাহার পরেই মোহরের কোন হিসাবে ভ্রম প্রমাদ ঘটে। জমিদার সেই হিসাব দেখিয়া মোহরেরকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে মোহরের ম্লানবদনে কহিল, মহাশয়! আমরা ত মানুষ ভ্রম হইতে পারে, পরমেশ্বরেরও ভ্রম দেখা যায়। জমিদার কহিলেন সে কেমন? মোহরের কহিল কেন? হয় তিনি (পরমেশ্বরের) পুরুষ সৃষ্টি করিবেন নয় স্ত্রী সৃষ্টি করিবেন ক্লীব সৃষ্টি কেন? এটী পরমেশ্বরের নির্ম্মাণ বিষয়ে কি মস্ত ভ্রম নয়?

একজন খ্রীষ্টিয়ান কোন পূর্ণযৌবনা মিশকে চুম্বন করিলে মিশ প্রকুপিত হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, এরূপ দুর্ব্ব্যবহার খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

খ্রীষ্টিয়ান। আমি বাইবেলের আজ্ঞামতই ব্যবহার করেছি।

মিশ। ছি! লজ্জা নাই, এ কেমন কথা!

খ্রীষ্টিয়ান। কেন? বাইবেলে যে এরূপ ব্যবহারের স্পষ্ট আজ্ঞা আছে।

মিশ। (সরাগে) কোন্‌স্থানে দেখাও দেখি।

খ্রীষ্টিয়ান। যেখানে এই আজ্ঞা আছে যে, "তুমি অপরের যেরূপ ব্যবহার লাভের প্রার্থনা কর তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর।" তা আমি তোমার সহিত এখন যেরূপ ব্যবহার করেছি, তোমার নিকট আমার সেইরূপ ব্যবহার লাভইত প্রার্থনীয়।

———

একজন উকীলের একটী চক্ষু কোন গতিকে নষ্ট হইয়াছিল। তবুও তিনি চক্ষে চস্‌মা দিয়া লেখা পড়ার কর্ম্ম কাজ করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু অত্যন্ত কষা ছিলেন, কাহাকেও একটী পয়সা দিতেন না। একদা একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট কিছু যাচ্‌ঞা করিল। উকীল কহিলেন "যাও যাও ঠাকুর! আমি একটী পয়সাও অপব্যয় করিনে।" ব্রাহ্মণ কহিল "বলেন কি মশায়! আমাকে কিছু দেওয়া অপেক্ষা দেখি আপনি কতমত অপব্যয় করছেন, মিথ্যা বলেন কেন?" উকীল এই কথায় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "কই ঠাকুর! আমার অপব্যয় দেখাও দেখি নচেৎ নালিশ করিব।" ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন "মশায়! আপনার কানা চক্ষের চস্‌মাই ত অপব্যয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

———

একজন অজাতশ্মশ্রু ইউরোপীয় বিচারক একটী মোকদ্দমার অবস্থা কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া অন্যায়তঃ বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন, তাহাতে তাহার (বিবাদীর) মোক্তার কহেন "খোদা-ওয়ান্দ! এস্ মামেলামে বান্দাকা বহুত২ সওয়াল থা" বিচারক কহিলেন "সওয়াল থা কুচ্ পর্‌বা নেই, দোস্‌রা কইকা মোকদ্দমামে শোনা যাগা।"

———

কোন কৌতুকপ্রিয় রাজা এরূপ ঘোষণা করে ছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি আমার

সভায় উপস্থিত হইয়া একটী হাস্যরস পূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া আমাকে এবং আমার সভাস্থ সকললোককে হাসাতে পারিবে, তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ লোভে মুগ্ধ হইয়া সেই রাজসভায় যাইয়া কহিল মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি এমন একটী কবিতা করিব, যে তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি এবং সভাস্থ লোকসকল না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। রাজা কহিলেন, ভাল কবিতা পাঠ করুন, অবহিতচিত্ত হইলাম। ব্রাহ্মণ কবিতা পাঠ করিলেন।

"অনিত্যজীবন ভাই সদত চঞ্চল।
স্থিরনাহি হয় যেন পদ্মপত্রের জল।।"

এই কবিতা শ্রবণমাত্র রাজা এবং রাজসভাস্থ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ অমনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেমন মহারাজ! হাসিয়েছি কি না? এখন টাকা দেউন।"

একজন শিক্ষক কতকগুলি ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া নদীতীরে পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন "বিশ্বাস কি?" বুঝাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে একটী নৌকা বেগে আসিতেছে দেখিয়া শিক্ষক তাহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "দেখ, ঐ যে নৌকা আসিতেছে উহার মধ্যে কি আছে তোমরা জান; কিন্তু আমি যদি বলি যে উহার মধ্যে বানর আছে, তোমরা তাহাই বিশ্বাস করিবা; এরই নাম বিশ্বাস!" ছাত্রেরা কহিল "আজ্ঞে শিক্ষক পরদিবস পাঠশালায় উপস্থিত হওয়া ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিলেন "বিশ্বাস কাহাকে বলে" ছাত্রেরা উত্তর করিল "নৌকার ভিতর বানর আছে।"

একজন দোকানীর স্ত্রী বড় উগ্রচণ্ডা ছিল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে দোকানী দাহ করিতে না গিয়া দোকানের কর্ম্মেই ব্যস্ত থাকিল। আত্মীয় কুটুম্বেরা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যাবেনা?" সে কহিল "না ভাই, দোকানে অনেক কর্ম্ম আছে; কাজ আগে না আমোদ আগে?"

"হ্যা গো মা! বাবা বুঝি মামাও হয়?"
"দূর ছোঁড়া, ওকথা কি বলতে আছে।"

"কেনে সেদিন যে তুমি বাবাকে "যাও ভাই! আমি আর একলা ঘরকন্নার কাজ কত্তে পারিনা বল্লে, তা মায়ের ভাইত মামাই হয়।"

———

একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে দৃষ্টিকরতঃ সে কোন্ জাতীয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগা! তুমি কি লোক?" স্ত্রী— "স্ত্রীলোক"। ব্রাহ্মণ—"তা নয়, তুমি কোন্ জাতী?" স্ত্রী—"স্ত্রীজাতী"। ব্রাহ্মণ— "উহুঁ আমি তা জিজ্ঞাসা করি নাই, বল্‌ছি কি তুমি কোন্ বর্ণ?" স্ত্রী—"এই দেখ কেন্‌না উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।"

———

হাঁ হে রমেশ! তুমি না বলেছিলে বাল্যবিবাহ করবে না, তা এখন যে বড় এক পাঁচ বছরের খুকীকে গত্‌লে?

আমার ইচ্ছাত ছিলই না, তা বাবা অনেক অনুরোধ করেন, তাঁর খাতির ত ছাড়ানো যায়না। একে বাপ তায় বয়োজ্যেষ্ঠ।

———

একজন রসিক নায়ক আপনার স্ত্রীকে কহিল, দেখ! তুমি যে আমায় এত তুচ্ছ তাচ্ছল্য কর ভাল নয়, কেননা শাস্ত্রে বলে, (অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা) যিনি অন্নদাতা, যিনি ভয়ে ত্রাণ করেন, আর যাঁহার কন্যাকে বিবাহ করা যায় তাঁহাদিগে পিতৃ তুল্য মান্য করতে হয়। স্ত্রী কহিল, সত্যি তবেত তোমার উচিত যে আমাকেও বুনের মত দেখো, কেন্‌না শাস্‌তোরে বলে, যার মেয়েকে বিয়ে করা যায় সেও পিতৃ তুল্যি।

———

একজন নামপাগলা আমলার মাতৃ বিয়োগ হইলে সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইল, কেমন করিয়া ধূমধামে মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে। পুরোহিত কহিলেন, বাবু! তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ সোনার ষোড়শ চাই। আমলা কহিল, মশায়! হাতেত কিছুই নাই কেমন কোরে কি করি? পুরোহিত কহিল, কেন ধারে কর্জ্জে। আমলা কহিল, শেষ কেমন হবে? পুরোহিত কহিল, এখনত কর, শেষ একটা যাহয় বলে দিব। আমলা ধারে কর্জ্জে মায়ের শ্রাদ্ধ ভারি ঘটা করিয়া নির্ব্বাহ করিল। কিছুদিন পর সকল পাওনাদারেরা

আমলাকে টাকার জন্যে তাগাদা করিতে লাগিল। আমলা অনুপায় দেখিয়া পুরোহিতকে ডাকাইয়া কর্তব্য কি? জিজ্ঞাসিলে ধূর্ত্ত পুরোহিত কহিল "তুমি এক কর্ম্ম কর, যে টাকা চাইতে আসিবে তাকে ভুরুৎ করিয়া উত্তর দিও আর কিছুই কহিও না", আমলা তাহাই করিল। তখন আমলা পাগল হইয়াছে ভাবিয়া এক২ করিয়া সকল "তাগাদগীর" তাগাদায় ক্ষান্ত দিল। কিছুদিন পর পুরোহিত দক্ষিণার পাওনা টাকা তাগাদা করিলে আমলাবাবু তাহাকেও সেই ভুরুৎ শুনাইয়া দিলেন। পুরোহিত কহিল "কি বেটা! আমাকেও ভুরুৎ!" আমলা হাসিয়া কহিল "পুরুৎকেও ভুরুৎ"।

একজন পাদ্রির রবার্ট নামে একটী সন্তান ছিল, পাদ্রি তাহাকে প্রতিদিন নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। একদা প্রসঙ্গত এই উপদেশ করিলেন, "পুত্র! পরমপিতা জগদীশ্বর আমাদের পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, অতএব আমাদের সকলের উচিত এই যে, কেহ্ কাহার প্রতি হিংসা দ্বেষ না করিয়া পরস্পরের সহিত ভাতৃবৎ ব্যবহার করি।" পাদ্রির এইবাক্য নিঃশেষিত হইবামাত্র খানসামা আসিয়া হাজরী প্রস্তুতের সম্বাদ দিল। রবার্ট অমনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে কহিল, চল ভাই! আহার করিগে, বড় ক্ষুধা হয়েছে। আহারের পর আর যাহয় শুনা যাবে। পাদ্রি এইকথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, রবার্ট? আমি যে তোমার পিতা, রবার্ট কহিল, আমার দোষ কি? আপনি না এইমাত্র কহিলেন "আমাদের সকলের সহিত ভাতৃবৎ ব্যবহার করা উচিত!"

একজন নির্ব্বোধ কৃষকের তিনটা গো ছিল, একটা ষাঁড়, একটা গরু, আর একটা তাহার বৎস গরুটী গাবিন। সংসারের অত্যন্ত টানাটানি দেখিয়া কৃষকপত্নী স্বামীকে কহিল, হেদে এই গরু তিনটা বেচিয়া আন, লোকে দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোলো ষাঁড়টার দাম ২০ টাকা আর বাছুর সইতে গরুটার দাম এককুড়ি পাঁচ টাকা। বুজ্‌লে? আর যদি কেউ বলে গরুটীর দাম এত জেয়াদা কেন, তাবোলো যে গাবিন। কৃষক—তা বল্লে কিহবে? কৃষকপত্নী—টাকা জেয়াদা পাওয়া যাবে। কৃষক আচ্ছা বলিয়া গরু তিনটা লইয়া হাটে গেল। একজন খরিদদার প্রথমতঃ

সবৎসা গাবিন গরুটী কৃষকের কথামত ২৫ টাকায় কিনিয়া লইল কোন ওজর করিল না। কৃষক তাহাতে মনে করিল ঘরের লোক যে বলে দেছেলে গরু গাবিন বল্লে অধিক টাকা পাওয়া যায় মিছেকথা নয়। এমন সময় সেই খরিদদার ষাঁড়টার দাম কত জিজ্ঞাসা করিল। কৃষক কহিল, এর দামও এককুড়ী পাঁচ টাকা। ক্রেতা কহিল, কেন? এই গাবিন গরুর দাম বাছুর হইতে ২৫ টাকা আর ইহার দামও তাই! কৃষক কহিল, এটাও ত গাবিন।

কয়েক জন বয়স্য একত্রিত হইয়া বন ভ্রমণ করিতে চলিয়াছেন। দলের মধ্যের একজন কিছু দ্রুতপদ সঞ্চারে আগে বাড়িয়া পড়িল তার সঙ্গীরা অনেক পীছুতে পড়িয়া রহিল। দলছাড়া ব্যক্তি কতকদূরে যাইয়া সঙ্গীদের প্রতীক্ষায় এক গাছতলায় উপবিষ্ঠ হইল, কতক্ষণ পর তাহার সমুদয় বয়স্য নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সেই অগ্রবর্ত্তী বয়স্যকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, কিহে কপিরাজ! এ গাছতলায় কাদের প্রতীক্ষা দেখ্ছো? সে উত্তর করিল, সঙ্গীদের।

কোন বাবু মধুপানে উন্মত্ত হইয়া অধিক রাত্রিতে বাটী আসিলে তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিল। তৎ শ্রবণে বাবুর অত্যন্ত অভিমান জন্মিল, তিনি, যা আর বাড়ীতেই থাকিব না, বলিয়া বহির্দ্দারে আসিয়া দ্বারবানের "খাটোলায়" শুইয়া পড়িলেন এবং দ্বারবানকে কহিলেন "দর্ওয়ান! অ্যাবি একঠো বজ্‌রা লাও।" দ্বারবান বাবুর ভাবভঙ্গী বুঝিতে নাপারিয়া সেই নিশিথসময়েই অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক বজ্‌রার ভাড়া সুস্থির করত বাবুকে সংবাদ দিল "মহারাজ! বজ্‌রা আয়া হ্যায়" বাবু কহিলেন "কাঁহা?" দ্বারবান কহিল "ঘাটপর মহারাজ!" বাবু কহিলেন "হ্যাম বজ্‌রা হিঁ মাঙ্‌তা।"

অস্ট্রিয়া রাজ্যের রেলওয়েতে একটী বড় সুনিয়ম আছে। গাড়ীর মধ্যে ছোট২ রাঙ্গা নিশান আছে, যদি পথিমধ্যে কাহারও কোন উৎকট রোগ বা কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ একটী নিশান দেখাইলেই তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পায়। গাড়ীর মধ্যে এই বিষয়ে একখানি নোটীশ

দেওয়াও আছে। নোটিশে আরও লেখা আছে যে যদি কেহ অকারণে নিশান দেখাইয়া গাড়ি থামায় তবে তাহাকে ২৩ আইনমতে দণ্ড দেওয়া যাইবেক। একদা দুই জন ইংরাজ উক্ত রেলওয়ের গাড়ীতে আরোহণ করত নোটিশ পাঠ করিয়া ২৩ আইন কি জানিতে বড় ইচ্ছুক হইলেন, একজন কহিলেন, হাঁ হয়েছে জানিবার উপায় হয়েছে—কি? —এসোনা নিশান দেখাই—ঠিক কথা এই বলিয়া উভয়ে নিশান দেখাইলেন। গাড়ী তৎক্ষণাৎ থামিল, কি হয়েছে কি হয়েছে বলিয়া চতুর্দ্দিকের লোক আসিয়া পড়িল; তখন ঐ দুইজন ইংরাজ কহিলেন, কিছু নয় আমরা ২৩ আইন জানিতে চাই, —বটে আগে দুই জনে ১০।১০ টাকা জরিমানা দাও—তৎক্ষণাৎ টাকা দাখিল হইল—গাড়ী হইতে নামো—দুইজনে গাড়ী হইতে নামিলেন—দাঁড়াও আমরা আসি এই বলিয়া হুহু শব্দে গাড়ী চলিয়া গেল, তাঁহাদেরও ২৩ আইন জানা হইল।

দুই জন বন্ধু পরস্পর কহিতে ছিলেন, ঢাকার নূতন মাজিস্ট্রেট রামপুর হইতে ডাকে আসিবেন। ইহা শুনিয়া এক জন জিজ্ঞাসা করিল, মশায়! এখান থেকে ডাক ছাড়িলে কি রামপুর থেকে শুনা যায়?

ওহে সে ডাক নয়, ডাকে কি কখন চিঠি দেও নেই?

তবে কি পুলিন্দার মধ্যে সাহেব আস্‌বেন্?

ওহে তা নয়, আড্‌ডায়২ জনকত করিয়া কাহার রাখা হয়, তাহারাই পাল্‌কী বহিয়া আরোহীকে ঠিকানায় আনিয়া পৌঁছিয়া দেয়। ইহার নাম ডাকে আসা।

মশায়! রামপুরা হইতে ঢাকা আস্‌তে এমন কত আড্‌ডা আছে?

২০।২৫টা হইতে পারে।

যদি এক২ আড্‌ডায় ৪ জন লোক করে থাকে, তাতেও একপণ মানুষ লাগে, এত জনে একখান পাল্‌কিতে কাঁদ দেয় কেমন করে? ডাণ্ডাত অনেক ছোট।

একজন সুরসিক কবি কোন এক ইন্দিবরনয়না রমণীর অঞ্জন রঞ্জন চক্ষু দেখিয়া কহেন, দেখ! দণ্ড করিলেও দুষ্ট দুঃস্বভাব পরিত্যাগ করে না। এই চক্ষু অনেক যুবককে নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সরলহৃদয়া ললনা তাহার মুখে কালী দিয়া লাঞ্ছনা

করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে ইহার দুঃস্বভাব দূরীভূত না হইয়া বরং জিঘাংসা বৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

———

একজন ভদ্র লোক একটি নূতন চাকর রাখিয়া তাহাকে কহিলেন "দেখ আমি তোমায় যখন যে আজ্ঞা করিব তার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর্য়ে কর্ম্ম করিবে, যদি আমি বলি, ওরে চাদরখান আনতো তুই অমনি চাদর, জুতো, ছড়ী পিরাহান এনে দিবি। এরি নাম অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা।" কিছুদিন পরে বাবুর জ্বর হইল। বাবু ভৃত্যকে কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে আন। ভৃত্য, কবিরাজ ডাকিতে গিয়া অনেক বিলম্বের পর কবিরাজ ও গ্রামস্থ কয়েকজন লোক, কাঠ, খড়, বাঁশ দড়ী প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এসব কি?" ভৃত্য উত্তর করিল "আজ্ঞে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর্য়ে সব প্রস্তুত করেছি। ঝাপবাঁধিবার বাঁশ দড়ী, নিয়ে যাবার লোক, চিতার জন্য কাঠ কিছুই বাকি রাখি নাই।"

———

একজন পদ্রি জাননামক শিষ্যকে কহিলেন, জান তুমি কেবল মদেই মারা গেলে, দেখ তুমি বিদ্বান্-মানুষ, কর্ম্মক্ষম, ভদ্রবংশজাত, কিন্তু সকলগুণ তোমার মদেই মাটি করলে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না মদই তোমার প্রধান শত্রু।

জান। বাবা, মদ যে আমার শত্রু তা আমি বেশ জানি; কিন্তু বাবা "তুমিই বাইবেলে পড়িয়েছ "তুমি তোমার শত্রুকে ভালবাসো" তা বাবা, আমি কাজেই মদকে ভাল বাসি, শাস্ত্র-মত কর্ম্ম করিব এতে প্রাণ যাউক বা থাকুক।"

———

এক জন সাহেব এক জন বাবুকে কহিলেন "দেখ বাঙ্গালি লোক কেবল টাকা চায়, আমরা মান চাই" বাবু উত্তর করিলেন "হাঁ সত্য কথা যার যা নাই সে তাই চায়"।

———

একজন আদালতের বিচারক ২টা বাজিলে বিচারালয়ে আসিয়া সেরেস্তাদারকে কহিলেন "আজ কোন্২ মোকদ্দমা কর্নে হোগা" সেরেস্তাদার কহিলেন "দশ আইন" বিচারক কহিলেন "আচ্ছা দশ আইনকো বোলাও"।

বড় মেঘাড়ম্বর দেখিয়া নাগরী নাগরকে কহিল, "দেখ, মেঘ দেখিলে আমার বড় বজ্রাঘাতের ভয় হয়" নাগর কহিল "তা হবেইত তোমার লৌহময়হৃদয় কি না"।

কোন বালিকাবিদ্যালয়ে এক বৃদ্ধপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তাহাকে সকলে আইবড় পণ্ডিত কহিত। একদা তিনি প্রশ্ন করিতেছিলেন, "লিঙ্গ কয়প্রকার?" কতকগুলী কোকিলকণ্ঠে একবারে উচ্চারিত হইল "তিনপ্রকার পুং, স্ত্রী, ক্লীব।" পণ্ডিত—ভাল কামিনি! তুমি উদাহরণ দাও। এক ক্ষুদ্র বালিকা আস্তে ব্যস্তে—মালী পুংলিঙ্গ, কারণ সেপুরুষ; আমি স্ত্রীলিঙ্গ, কারণ আমি স্ত্রীলোক; আর আপনি ক্লীবলিঙ্গ; কারণ আপনি আইবড় পণ্ডিত, পণ্ডিত না রাম না গঙ্গা কিছুই কহিলেননা, পরদিবসেই বিবাহের উদ্যোগ করিলেন।

দুইজন জুয়াচোর ভদ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া একদিন বড়বাজারে এক ময়রার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল, আমরা বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি কিছু জলযোগ করিতে চাই। ময়রা এইকথা শুনিয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া দোকানের ভিতর স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া তাঁহাদের জলখাবার স্থান করিয়া দিল, আর দোকানের একজন চাকরকে সেখানে বসাইয়া কহিয়া গেল "মহাশয়দের যাহা২ প্রয়োজন, এই ব্যক্তিকে কহিলেই পাইবেন আর দাম ইহাকেই দিবেন"। পরে জুয়াচোরেরা বসিয়া বিলক্ষণরূপে নানাবিধ মিষ্টান্নে উদর পূর্ত্তি করিয়া ময়রার চাকরকে কহিল "কত দিতে হবে হে?" সে হিসাব করিয়া কহিল "ছ আনা"। এই শুনিবামাত্র এক জন জুয়াচোর পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দেয় এমন সময়ে অন্য ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিল আর কহিল "সে কি? নাও রাখ আমি দিব, বাঃ! তোমার এবড় অন্যায় প্রতিবারই তুমি দিবে?" সে উত্তর করিল "আঃ! তাতে ক্ষতি কি? তুমি দিলেও যা আমি দিলেও তা, তোমায় আমায় কি ভিন্ন ভাব আছে?" তাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "ভিন্ন ভাব নাই বলেই তো আমি দিতে চাই"। এইরূপ আনন্দ কলহ কিয়ৎক্ষণ হইলে পর একজন কহিল "ভাই মিছে বিবাদ করিলে কি হবে? আমি বলি ইহার এই মীমাংসা করা যাউক" পরে ময়রার চাকরকে সম্বোধন করিয়া

কহিল “ওহে তুমি হেথা এসো, তোমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া দি, তুমি প্রথম আমাদের দুইজনের মধ্যে যাহাকে অগ্রে ধরিতে পারিবে সেই পয়সা দিবে”। ময়রার চাকর অল্পবয়স্ক ছিল সে ইহাতে বড়ই হর্ষ হইয়া সম্মত হইল, পরে তাহার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া দিলে যে ঘরময় হাত্ড়াইতে লাগিল, ইত্যবসরে দুই জুয়াচোর আস্তে২ চম্পট করিল, যাইবার সময় ময়রা তাহাদিগকে কহিল “মহাশয়দের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে এই দোকান হইতে লইবেন” তাহারা কহিল “হাঁ তোমার দোকানের জিনিস ভাল অবশ্য লইব”। ময়রা ক্ষণেক পরে ঘরের ভিতর আসিয়া দেখে যে চাকর চক্ষে কাপড়বাঁধা ঘরে ঘুরিতেছে। চাকর ময়রার সাড়া পাইয়া দৌড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল “এই মশাইকেই পয়শা দিতে হবে” পরে চক্ষের কাপড় খুলিয়া কেবল আপন প্রভুকে দেখিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সকল বৃত্তান্ত কহিল।

———

কোন এক স্কুলের ছাত্রের বাসায় একপিপা মদ ছিল, মাস্টর তাহা জানিতে পারিয়া ছাত্রকে মহা ক্রোধে বলিলেন, আমি শুনিতে পাই তোমার ঘরে এক পিপা মদ আছে, মদ লইয়া তুমি কি কর?

ছাত্র। আজ্ঞা আমি বড় দুর্ব্বল হওয়াতে ডাক্তর আমাকে কিঞ্চিৎ২ মদ খাইতে পরামর্শ দিয়াছেন, তা আমি ত আর দোকানে গিয়া খাইতে পারিনা; অতএব ঘরে আনিয়া রাখিয়াছি।

মাস্টর। মদ খাওয়ায় তোমার কিছু উপকার হইয়াছে?

ছাত্র। আজ্ঞা যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। আমি আজ তিনদিন মাত্র পিপা খরিদ করিয়াছি, প্রথমে পিপা নারিতে পারিতামনা, এক্ষণে সচ্ছন্দে তুলিতে পারি।

———

একজন সাঁতার শিখিতে গিয়া দুইচার বার খাবি খাইয়া উঠিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর সাঁতার না শিখিয়া জলে পা দেবনা।

———

একব্যক্তি শেষরাত্রে বাড়ী আসিলে তাহার কোপনাপত্নী তাঁহাকে কহিল “রাত ৩ টে বেজে গেল তবু কি তোমার বাড়ী বল্যে মনে পড়েনা?”— তিনটে! এই মাত্র একটা বেজেছে।—“তুমি মদ খেয়েছ নাকি? আমি এই জানলায় বসে শুনলেম্

৩ টে বাজলো”— না এই মোড়ের মাথায় যখন তখন আমি গনিলাম ৩ বার একটা বাজলো।

———

কোন এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া কটি বিজয়া গান করিতেছিলেন। গানগুলী এমত সুললিত ও করুণরসপূর্ণ আর ব্রাহ্মণও এমন মধুরস্বরে ও ভক্তিভাবে গাইতে লাগিল যে সভাস্থ সকলেরই অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কেবল একব্যক্তির চক্ষে জল ছিল না। তাহাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল “সে কি হে এমন গানে তোমার চিত্ত আর্দ্র হল না?” সে উত্তর করিল “আমি যে ব্রাহ্ম্য”।

———

অতি অল্প বয়স্ক (৫ বৎসরের) এক নাবালগের মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত ছিল। নাবালগের উকিল চোট পাটে বক্তৃতা করিয়া পরিশেষে নাবালগকে ক্রোড়ে লইয়া জজ এবং জুরিদিগকে দেখাইয়া কহিলেন “দেখুন এই অনাথা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে প্রবঞ্চনা করা কি নিষ্ঠুরকর্ম্ম! দেখুন যদিও কিছু ভালমন্দ জানেনা আহা! তবুও যেন ইহার মনে বিপদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইয়াছে, দেখুন বালকটির নেত্র দ্বয় হইতে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতেছে” ফলতঃ বালকটি যথার্থই ক্রন্দন করিতেছিল। এমন সময় প্রতিবাদীর উকিল হটাৎ উঠিয়া ঐ বালককে তাহার উকিলের হস্ত হইতে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন বাবু! তুমি কেন কাঁদিতেছ?” বালকটি কাঁদিতে২ উত্তর করিল “ও আমায় চিম্‌টি কাট্‌ছিল”।

———

হ্যাঁলা ভাগ্যধরী! ওমা! তোর ঘুমলে অত নাক ডাকে কেন?—কই আমিত কিছুই শুনি না।

———

একজন ইংরাজ এক আইবড় মিস্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমি হাত দেখে সব বলতে পারি তোমার হাত দেও দেখি” (এই “হাত দেও দেখি” বলাতে পাণিগ্রহণ ভাবের ইঙ্গিত রহিল) মিস উত্তর করিলেন “হটাৎ কেমন করে হবে, বাবাকে আগে বল”।

একজন ধোপা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কাপড় চাপাইয়া প্রাতঃকালে এক পাঠশালার নিকট দিয়া গমন করিতেছিল, তৎকালে গুরুমহাশয় এক বালককে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেছিলেন "আমি কত গাদা মানুষ করে ছেড়ে দিলেম; কিন্তু তোরে পারিলেম না" রজক এই কথা শুনিয়া বিবেচনা করিল আমার গাদাটি যদি মানুষ হয় ত আমার অনেক উপকার হতে পারে। এই মনে করিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট গিয়া কহিল "মুশাই আমার গাদাটিকে মানুষ করিতে পারেন" ধূর্ত্ত গুরুমহাশয় উত্তর করিলেন "হাঁ পারি, কিন্তু কিছু খরচ চাই, টাকা পাঁচেক লাগ্‌বে" রজক অতি কষ্টে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট গাদাটি সমেত আনিয়া দিল। গুরুমহাশয় কহিলেন "কাল, আসিস্" ধোপা পরদিবস কোন কার্য্যানুরোধে প্রাতে না আসিয়া বৈকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুমহাশয় তাহাকে দেখিয়া কহিলেন "এত দেরিতে এলি? তোর গাদা ফৌজদার হয়ে গেছে দেখ্ গিয়া"। ধোপা এই কথা শুনিয়া আস্তে ব্যস্তে ফৌজদারী কাছারিতে গিয়া দেখে যে দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট ফৌজদার বসিয়া দরবার করিতেছে, চতুর্দ্দিগে আমলারা ও প্যাদারা ঘেরিয়া রহিয়াছে, নিকটে কার সাধ্য যায়। ধোপা নিরুপায় হইয়া অনেক চিন্তা করিয়া এইস্থির করিল যে তাহার গাদাটি মধ্যে২ পালাইত; কিন্তু দূর হইতে বন্ধনরজ্জু গাছটি দেখাইয়া জিহবা ও তালু দ্বারা "টক্ টক্" শব্দ করিলে দৌড়িয়া আসিত এক্ষণেও সেই উপায়ে ফৌজদার আসিবেক। এই বিবেচনা করিয়া পরদিবস রজ্জু গাছি আনিয়া "টক টক" শব্দ করিতে লাগিল এই রূপ দুই তিন দিবস করিবার পর এক দিন ফৌজদারের নজর পড়িল, তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিল। ফৌজদার ভদ্র লোক ছিলেন তাহাকে ২০টি টাকা দিয়া আবার কাচারিতে আসিতে মানা করিয়া দিলেন।

এক বারাঙ্গনা আপন দ্বারে বসিয়া মুড়ি খাইতে ছিল। এক রসিক বাবু সেখান দিয়া যান, তা আপনি এয়ার মানুষ তাই জানাইবার জন্য বারাঙ্গনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কও চোদ্দপুরুষ, কিখাচ্চ? বারাঙ্গনা উত্তর দিল "গু খাচ্চি"।

কলিকাতার পশ্চিমপার্শ্বস্থ কোন এক জমীদারের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে

মহাসমারোহে ভোজ হইতেছিল। অনেক বড়মানুষ উপস্থিত; সাল দোসালা, জামেয়ার, রুমালের অন্ত নাই, সব বাহার দিয়ে খেতে বসেছেন দীয়তাং ভুজ্যতাং ধুম লেগে গেছে জমীদার মহাশয় কার কি চাই কে কি পেলে না পেলে তদারক করিতেছেন, ও বড়২ দৌড়দার সালের যোড়া দেখে কহিতেছেন; ওহে এপাতে মুড়ো দেও ওপাতে মুড়োদেও; আর যাহাদের সাল দোসালা নাই তাহাদের দিকে বড় দৃষ্টি নাই। এক পার্শ্বে একটী মানুষ রাঙ্গা চাদর গায় বসিয়াছে, নিকটে একটি বালকও রহিয়াছে। মাছের ঝোল হস্তে পরিবেশনকারী সেই দিগে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি কহিল ওগো মহাশয়! এই ছেলেটি মুড়ো২ করিয়া কাঁদিতেছে, বলিলেও বুঝেনা, তা মাটা পালামের চাদরের মত যদি একটি মুড়ো থাকে তো একে দিন। বাবু এই কথা শুনিতে পাইয়া বড় লজ্জিত হইলেন।

এক ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া গল্প করিল এবার যে কোন দিকে বাতাস বয় কিছুই ঠিকানা করা যায় না, আমি চক থেকে রমণার মাঠ অবধি গেলেম, বারবার আমার মুখে লাগিতে লাগিল, কিন্তু ফিরে আসিবার সময় আবার হুহু করে পিছনে লাগিতে লাগিল।

এক জন মাতাল রাস্তায় টলিতে২ যাইতেছিল, অপর এক জন কহিল "বেটা রাস্তার একবার এধার একবার ওধার কর‍্যে যাচ্ছে"। মাতাল উত্তর করিল "কেন যাবনা বাবা, ট্যাক্স দিনা? সোজা বাড়ি গেলে রাস্তা শীঘ্র ফুরিয়া বেড়িয়ে যাবে যে, যত পারি বেড়িয়ে নি"।

কোন এক ভট্টাচার্য্যের পত্নী চুলায় ডাল চড়াইয়া ভট্টাচার্য্যেকে কহিল, ডাল্টে দেখ আমি এক কলসী জল আনি ব্রাহ্মণী জল আনিতে গেল, ব্রাহ্মণ চণ্ডী কোলে করে ডালের হাড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ডাল ক্রমে উথলিয়া উঠিলে ব্রাহ্মণ আস্তেব্যস্তে উঠিয়া আপন পৈতা ধরিয়া ডালের উপর গায়ীত্রী পাঠ করিতে লাগিলেন, তবু ডাইল উথলিতে লাগিল সন্ধ্যা পাঠ করিলেন, ডাল উথলে পড়ে, অগত্যা চণ্ডীখানা আনিয়া উপরে ধরিলেন, ডাইল হাঁড়ির পাশ দিয়া পড়িতে লাগিল

এমন সময় জল লইয়া ব্রাহ্মণী আসিয়া উপস্থিত "ব্রাহ্মণী আমরে যাই সর্ব্ব গুণের গুণ নিধি ন্যাও সব এই বলিয়া" ব্রাহ্মণী কলসী হইতে এক ছিটা জল লইয়া ডালের ফেণার উপর দিতে ফুস করিয়া বসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ এই দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া দৈবলীলা বিবেচনা করিলেন ও মাটীতে চণ্ডী ফেলিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ব্রাহ্মণীর পদতলে পড়িয়া সজল নয়নে গদ গদ স্বরে কহিলেন "মা তুমি কে? ছলা করে এ অধমের গৃহে? মা তুমি কে?" ব্রাহ্মণী বিরক্ত হইয়া দূর ডেকরা দূর অল্পপেয়ে বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

বিজ্ঞাপন।

পশ্চাল্লিখিত পুস্তকগুলি মৎকর্ত্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	[করুণারসাত্মক পদ্যময় কাব্য।
জানকী নাটক	[জানকীর বনবাস বৃত্তান্ত ঘটিত নাটক।
পরিহাসিকা	[নায়ক-নায়িকার অনশ্লীল পরিহাস পূর্ণ পদ্যময় ক্ষুদ্র কাব্য।
রাক্ষসের উপর ক্ষাক্ষস	[প্রহসন।
হাস্যরস তরঙ্গিনী	[দ্বিতীয় ভাগ পদ্য।
আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী	[প্রহসন।

এই সকল পুস্তক গ্রহণেচ্ছুগণ আমার নিকট অথবা কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ গুপ্ত এণ্ড বাদ্রার্শ-এর নিকট অভিপ্রায় জানাইলে যখন যাহা প্রস্তুত হইবে অমনি পাইতে পারিবেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
ঢাকা বাবুরবাজার

চোরের উপর বাট্‌পাড়ি।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে
প্রণীত।

শ্রীনৃত্যলাল দের
আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।
মূল্য ।০ আনা মাত্র।

[1863]

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করিতেছি যে আমার এই "চোরের উপর বাট্‌পাড়ি" নামক পুস্তকখানি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে মুদ্রিত করিবেন তাঁহাকে আইন মতে দণ্ডিত হইতে হইবেক।

শ্রীনৃত্যলাল দে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চোরের উপর বাটপাড়ি

কাশ্মীর দেশেতে এক আছয়ে রাজন।
মহা বলবান সেই নামেতে রমণ।।
চন্দ্রসেন নামে মন্ত্রী বুদ্ধে বিচক্ষণ।
তাহার তনয় এক পণ্ডিত সুজন।।
জ্যোতিষ গণিতে সেই বড়ই পণ্ডিত।
সব বিদ্যা মূর্ত্তিমান হইল ত্বরিত।।
বাকী কিবল চৈর্য্য বিদ্যা করিতে সাধন।
মনে মনে ভাবে তবে মন্ত্রীর নন্দন।।
সব বিদ্যা শিখিলাম কিছু বাকী নাই।
চৌর্য্যবিদ্যা শিখিবারে কার কাছে যাই।।
হৃদয়েতে এইরূপ ভাবিয়া তখন।
পিতারে জানায় আসি মন্ত্রীর নন্দন।।
শুন শুন নিবেদন পিতা মহাশয়।
বিদেশ ভ্রমিব মোরে অনুমতি হয়।।
সব বিদ্যা হইয়াছে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
অস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে আমার বঞ্চিত।।
মন্ত্রী বলে কেন বাপু বিদেশে যাইবে।
এইখানে বসে বিদ্যা শিখিতে পারিবে।।
এত বলি রাজারে জানায় মন্ত্রীবর।
অবধান নিবেদন শুন দণ্ডধর।।
মম সুত তব বিদ্যায় হয়েছে পণ্ডিত।
কহিলেক অস্ত্র বিদ্যা শিখিব কিঞ্চিৎ।।
বিদেশে যাইতে চাহে প্রাণের নন্দন।
উপায় কি করি ভূপ বলহ এখন।।

রাজা বলে মোর সভার পণ্ডিত সে জন।
অস্ত্র বিদ্যা শিখাইতে অতি বিচক্ষণ।।
তাহার আলয়ে দেহ পাঠায়ে পুত্রেরে।
অনায়াসে শিখাইবে সেই দ্বিজবরে।।
এত শুনি মন্ত্রীবর হরিষ হইল।
আপন আলয়ে আসি তনয়ে কহিল।।
শুন শুন ওরে বৎস্য প্রাণের নন্দন।
অস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে যদি লহ মন।।
নৃপতির সভাসদ পণ্ডিত যে জন।
অস্ত্র বিদ্যা শিখাইতে অতি বিচক্ষণ।।
এখনি চলিয়া যাহ তাহার আলয়।
অনায়াসে শিখাইবে দ্বিজ মহাশয়।।
এতশুনি হরষিত মন্ত্রীর নন্দন।
পিতারে প্রণাম করি করিল গমন।।
দ্বিজের আলয়ে আসি উপনীত হয়।
হেরি দ্বিজবর তার লয় পরিচয়।।

পণ্ডিত। বাপু আপনি কে, কোথা থেকে এলে আমায় পরিচয় দেও।

মন্ত্রীপুত্র। প্রণাম মহাশয়, আমি মন্ত্রীপুত্র আপনার নিকটে বিদ্যা অভ্যাসে এসেছি, আমাকে বিদ্যাদান দেন।

ব্রাহ্মণ। বাপু কি বিদ্যা চাও আমাকে বল আমি সব বিদ্যা জানি কিছু বাকী নাই।

মন্ত্রীপুত্র। আমি চৌর্য্য বিদ্যা চাই আমি সকল বিদ্যা পারকতা হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবু ওরে ষষ্ঠীরাম।

ষষ্ঠী। আজ্ঞা মহাশয়।

ব্রাহ্মণ। এই মন্ত্রীর নন্দনকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াও যেন শীঘ্র চৌর্য্য বিদ্যা শিখ্‌তে পারে।

ষষ্ঠী। আচ্ছা মহাশয়।

ত্রিপদী।

এরূপে মন্ত্রীতনয়, ব্রাহ্মণের গৃহে রয়,
চৌর্য্য বিদ্যা করায় অভ্যাস।
দিবা রাত্র নাহি মানে, করে কর্ম্ম ততক্ষণে,
অন্তরেতে নাহি রাগ দ্বেষ।।
যাহা বলে সে ব্রাহ্মণ, নাহিক করে লঙ্ঘন,
মর বোল্লে মরে ততক্ষণে।
দেখিয়াও যে ব্রাহ্মণ, হরষিত মনে মন,
চৌর্য্য বিদ্যা শিখেন যতনে।।
পণ্ডিতে দক্ষিণা দিয়ে, মন্ত্রীসুত বিদায় হয়ে,
মনে মনে ভাবয়ে তখন।
এক্ষণে কোথায় গিয়ে, দেখি বিদ্যা পরীক্ষিয়ে,
এত বলি করয়ে গমন।।
মন্ত্রীপুত্র ভাবি মনে, চলিলেক ততক্ষণে,
উপনীত অন্য এক দেশে।
তথাকার নরোবর, নাম তার দণ্ডধর,
মন্ত্রীপুত্র বাটীতে প্রবেশে।।

দ্বারপাল জিজ্ঞাসিল,   কেবা বিশেষিয়া বল,
নরোবরে জানাই খবর।
তবে প্রবেশিতে পাবে,   যাহা বাঞ্ছা কর হবে,
পাবে অনায়াশে নিরন্তর।।
মন্ত্রী সুত বলে শুন,   ওহে দ্বারী বিবরণ,
জানাও তোমার নৃপতিরে।
আমি হৈ দক্ষিণ দেশী,   আশা করে হেথা আসি,
এই কহিলাম যে তোমারে।।
চাকরি করিতে আসা,   আসিয়াছি সেই আশা,
তোমার এ রাজার ভবন।
জানাও গে নৃপতিরে,   রহিলাম এখাকারে,
এত বলি দাণ্ডায় তখন।।
কোটাল রাজ ভবন,   করে গিয়া নিবেদন,
অবধান কর দণ্ডধর।
এক জন আসিয়াছে,   বাঞ্ছা রাখে ৬২ কাছে,
চাকরি করিবে নিরন্তর।।
রাজা বলে তারে আন,   দেখিব সেই কেমন,
এত শুনি কোটাল চলিল।
কহিল মন্ত্রীনন্দনে,   আইস তুমি এইক্ষণে,
রাজা আসিবারে আজ্ঞা দিল।।
শুনি হরষিত মন,   মন্ত্রীপুত্র ততক্ষণ,
উপনীত নৃপতি সদন।
রাজার সভায় গিয়ে,   গলে বাস আরোপিয়ে,
প্রণাম করিল্ল ততক্ষণ।।
বলে রায় ততক্ষণ,   কোথা তব নিকেতন,
কিবা নাম কাহার তনয়।
আসিয়াছ কিবা আসে,   বল২ আমার পাশে.

মিথ্যা নহি কহিও নিশ্চয়।।
মন্ত্রীসুত ততক্ষণ, বলে করহ শ্রবণ,
মোর নাম হয় মিছে রাম।
চাকরির আশা করি, আইলাম তব পুরী,
বাটী মোর বড়গাছি গ্রাম।।
রাজা বলে কহ শুনি, কি কর্ম্ম করিবে তুমি,
বিশেষিয়া কহ মোর স্থানে।
সেই কর্ম্ম করিবারে, ভার দিব তদন্তরে,
আজোবধি থাকহ এখানে।।
এত বলি সঙ্গে করি, লয়ে গেল অন্তঃপুরী,
দেখাইল যত পুরজন।
রাজকন্যা হেরি রূপ, উথলিল কাম কূপ,
একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।।
বলে আহা মরে যাই, লইয়া এর বালাই,
হেন রূপ কভু নাহি হেরি।
এত বলি হাসি হাসি, কহে কথা মিষ্টভাষি,
জননীর করযুগ ধরি।।

রাজকন্যা। ওগো জননী। উটি কে গা পিতের সমিভারে এলো।

রানী। বাছা কন্যা! উটি আমাদের নব কিঙ্কর হলো,
এ নিমিত্তে রাজা আমাদের দেখাতে আন্‌লেন।

এইরূপে মন্ত্রীপুত্র তথা দাস ভাবে কালযাপন করেন, মনে করেন এবার কিরূপে চৌর্য্য বিদ্যা পরীক্ষা করিব, ইহা ভাবিয়া নশীরাম নামার এক কিঙ্করের সহিত মৈত্রতা পাতাইলেন এইরূপে ক্রমশ কালযাপন করেন, এক দিবস রাজার পিতার শ্রাদ্ধে শত মুদ্রার বস্ত্র ক্রয় করিতে ঐ দুই জনকে পাঠাইলেন, পথিমধ্যে মিছেরামের সহিত নশীরাম যুক্তি করিলেন, বলে ভাই বন্ধু! আইস অর্দ্ধেক মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক টাকা আমরা হরণ করি, ইহা বলিয়া দুই জনে অর্দ্ধেক২ টাকা বিভাগ করিয়া লইলেন, তদন্তর অর্দ্ধেক টাকায় কাপড় ক্রয় করিয়া গৃহে আসিয়া কহিলেন,

মহারাজ! এই লন এক শত টাকায় কাপড় ক্রয় করিয়াছি, তাহাতে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া দুই জনকেই কহিলেন দূর হ বেটারা, তোরা চোরে চোরে মাসতুত ভাই হইয়াছিস। দশ টাকার কাপড় ক্রয় করিয়া এক শত টাকা কহিলি অতএব তোদের মুখাবলোকন করিব না, ইহা বলিয়া দুই জনকে তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর নশীরাম, মিছেরাম দুই জনেই গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দুই জনে কথোপকথন হইতে লাগিল।

মিছেরাম। ভাই নশীরাম এক্ষণে কোথায় যাই রৌদ্রে আর চল্‌তে পারিনে এই খানে ক্ষণেক বোস আমাদের মন দুঃখের দুই একটা কথা বলি শুন।

নশীরাম। ভাই দাদা মিছেরাম বেশ বলেছিস্, তবে ভাই বসি, কি সুখ দুঃখের কথা কহ দেখি শুনি।

(ইহা বলিয়া সরোবর কুলে উপবেশন)

হেনকালে কতকগুলি নবযৌবনী নারী।
কক্ষে কলসী হাসি হাসি আস্তে যাচ্ছে বারি।।

(তাদের মুচকি হাসি) তাদের মুচকি হাসি, প্রেমফাঁসি দিবে সবার গলে। হাসি হাসি লাগায় মিসি, ঠমকে ঠমকে চলে।। (কিবা তার রূপের ছটা) কিবা তার রূপের ছটা দেখে প্রাণটা, হয় উচাটন। ধৈর্য্য নাহি মানে ইচ্ছে সদা করে মন।। (যদি একবার পাই) যদি এক বার পাই, প্রাণ যুড়াই, থাকি লয়ে ঘরে। মদন বাণ পরিত্রাণ পাই রে তৎপরে।। (নাহি তার লোক লাজ) নাহি লোক লাজ, কালব্যাজ কেবা করে তার। লয়ে সবারে, সুখেতে পরে, করিব বিহারে।। (কিবা পাছা সবার) কিবা পাছা সবার, তায় চন্দ্রহার কচ্ছে ঝলমল। সিঁতি পাটী পরিপাটী দেখিতে উজ্জ্বল।। (কারু খোপায় ফুল) কারু খোপায় ফুল, কানে দুল, যাচ্ছে হেলে দুলে। তুষ্ট মন সর্ব্ব জন কহে বাক্ ছলে।।

রমণীগণ।

বলি কে তোমবা দুজনে বসে রয়েছ, উঠে
যাও আমরা কাপড় কাচবো।
তোমরা কে দুই জন রয়েছ বসিয়া।
এই বেলা মানে মানে যাহনা উঠিয়া।।

নতুবা আমরা সবে পাওয়াইব টের।
উঠিয়া যাইতে তবে লাগিবেক ফের।।
একে নারী সবে মোরা পাইয়াছি ভয়।
সবে থাকা তোমাদের উচিত না হয়।।
এত শুনি দুইজন উঠিয়া তখন।
খানিক তফাতে আসি দাণ্ডায় দুজন।।
দেখে দোঁহে উলঙ্গ হইয়া ততক্ষণ।
কুলে আসি বসন রাখিল কন্যাগণ।।
হেনকালে দুই জন পরামর্শ করি।
কন্যাগণের বসন লইল সব হরি।।
জলক্রীড়ায় মগ্ন সবে কেহ না জানিল।
বসন হরিয়া সবে বৃক্ষেতে রাখিল।।
তথা হইতে দুই জন দাণ্ডায় অন্তরে।
হেনকালে দস্যুগণ আসিয়া তৎপরে।।
বৃক্ষের বসন পাড়ি সকল লইল।
তথা হইতে দস্যুগণ পলাইয়া গেল।।
এখানেতে জলক্রীড়া সারি কন্যাগণ।
কুলে উঠে নাহি পায় সবার বসন।।
দেখিয়া সকল কন্যাগণ চমৎকার।
ভাবে মনে বসন কে হরিল সবার।।
অনুমান করি দুই জন বসে ছিল।
আমাদের বসন বা সে জন লইল।।
হেনকালে দুই জনে দেখে কন্যাগণ।
হাতছানি দিয়া তবে ডাকে সর্ব্বজন।।
কন্যার বচনে তবে দোঁহেতে আইল।
দেখি কন্যাগণ দুই জনে জানাইল।।
আমাদের বসন কে করিয়াছে চুরি।

অনুমানি দুঃখ দিতে করেছ চাতুরি।।
শীতে মরি দাণ্ডাইতে না পারি জীবনে।
রহিতে না পারি নীরে বসনে বিহনে।।
মিছেরাম বলে মোরা কিছুই না জানি।
মিছে আপবাদ কেন দেহ সবধনী।।
হেনকালে নশীরাম বৃক্ষ পানে চায়।
বসন সকল বৃক্ষে দেখিতে না পায়।।
দেখিয়া হইল ভয় নশীর অন্তরে।
মিছেরাম নিকটেতে কহে ধীরে২।।
শুন ওরে মিছে দাদা করি নিবেদন।
বৃক্ষের উপরে আর না হেরি বসন।।
এত শুনি সবিস্ময় হইল দুই জন।
চোরের উপর বাটপাড়ি একি কুলক্ষণ।।
আজি যে সবারে আমি দেখিব কেমন!
আমাদের সম্মুখেতে লইল বসন।।
অতএব নশী দাদা উপায় কি করি।
কি রূপেতে কন্যাগণের নিকটেতে তরী।
হারায়াছে ইহাদের যথার্থ বসন।
কি রূপে উলঙ্গ সবে করিবে গমন।।
নশী বলে ৩০ বসন ক্রয় করে আনি।
ইহাদের সকলেরে রাখহ আপনি।।
এত বলি বসন সব কিনিয়া আনিল।
এক২ খানি সব কন্যাগণে দিল।।
কন্যাগণ বলে কেন নূতন বসন।
কি কারণে আমরা এ করিব গ্রহণ।।
নশীরাম বলে তোমা সবার বসন।
কোন দুরাচার আসি করিল হরণ।।

দোষী হইলাম মোরা থাকি এখানেতে।
ক্রয় করি আনি বসন বাজার হইতে।।
ইহাতে নাহিক দোষ শুন কন্যাগণ।
অনায়াসে পরিধান করহ বসন।।
এত শুনি কন্যাগণ হরিষ হইল।
এক২ খানি সবে বসন পরিল।।
দুই জন প্রতি হৈল ভক্তির উদয়।
করযোড় বিনয়েতে কন্যাগণ কয়।।
বসন করিলে ক্রয় মোর সবার তরে।
অনুগ্রহ করি তবে চল মোর ঘরে।।
মিছেরাম বলে ভাই শুন নারীগণ।
রহিতে নারিব হেথা আছে প্রয়োজন।।
বাঞ্ছা করিয়াছি মোরা এক স্থানে যাব।
আসিবার কালে হেথা রজনী বঞ্চিব।।
এত বলি দুই জনে করয়ে গমন।
পথেতে আসিয়া তবে ভাবে মনে মন।।
মিছেরাম বলে দাদা শুন নশীরাম।
এইখানে বসি একটু করিব বিশ্রাম।।
এত বলি সেইখানে দুজন বসিল।
দুইজনে পরস্পর কহিতে লাগিল।।
এমন কে চোর ভাই বস্ত্র করে চুরি।
আজ তার দণ্ড দিব করিয়া চাতুরি।।
জ্যোতিষ গণিতে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এত বলি গণিবারে বসিল ত্বরিত।।
ক্ষণেক বিলম্বে তবে হাসিয়া উঠিল।
হেরিয়াত নশীরাম তারে, জিজ্ঞাসিল।।
কেন দাদা হাসিয়া উঠিলে কি কারণ।

বিবরণ বল বল করিব শ্রবণ।।
মিছেরাম বলে 'এক তস্কর আসিয়া।
বসন লইয়া গেছে হরণ করিয়া।।
এখনি এর বিহিত করিব আমি তবে।
চোরোপড়ে বাটপাড়ি অবশ্য হইবে।।
এতবলি রজনীতে যায় দুইজন।
তস্করের আলয়েতে প্রবেশে তখন।।
হীরা মণি মুক্তা যাহা ঘরেতে আছিল।
একে একে সর্ব্ব ধন হরিয়া আনিল।।
পাশের ঘরেতে ছিল তাহার নন্দিনী।
রূপেতে বিদ্যুৎ যিনি কামের কামিনী।।
মিছেরাম আনে তারে করিয়া হরণ।
তদন্তর বসন করিল অন্বেষণ।।
বহু অন্বেষণ করি বসন পাইল।
সরোবর নীরে ডুবাইয়া রেখেছিল।।
আর পায় কত টাকা সংখ্যা নাহি হয়।
আভরণ পায় কত না হয় নির্ণয়।।
তথা হৈতে প্রস্থান করিল দুই জন।
উপনীত হৈল আসি বেশ্যার ভবন।।
দেখিতে দেখিতে হৈল প্রভাত যামিনী।
কন্যাগণ প্রসংশিল দেখিয়া কামিনী।।
জিজ্ঞাসিল এ ধনীরে পাইলে কোথায়।
আশ্চর্য্য হইনু মোড়া দেখিয়া ইহায়।।
রূপে যেন সরস্বতী কিবা ভগবতী।
শাপ ভ্রষ্টা জন্মিয়াছে নরের বসতি।।
এত বলি মিছেরাম হাসিয়া হাসিয়া।
কন্যাগণ স্তুতি তবে কহে প্রকাশিয়া।।

তস্করে লইয়া ছিল সবার বসন।
মোরা দুইজন গিয়া করি আনয়ণ।।
কত শত অর্থ আর কত আভরণ।
কন্যারে করিয়া চুরি করি পলায়ণ।।
এত শুনি হাসি কহে যত বেশ্যাগণ।
চোরোপরে বাট্‌পাড়ি হইল ঘটন।।
অর্থ আর আভরণ যত এনেছিল।
একে একে বেশ্যাগণে সবাকারে দিল।।
হরিষ হইল তবে যত বেশ্যাগণ।
এখানে প্রভাত কালে শুন বিবরণ।।
কন্যা না হেরিয়া তবে দস্যুর রমণী।
পতির নিকটে আসি কহিতেছে বাণী।।
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
রজনীতে কন্যা কেবা করিল হরণ।।
এত শুনি দস্যু তবে ভাবিতে লাগিল।
রজনীর মধ্যে কন্যা কে চুরি করিল।।
ত্বরা করি সরোবরে যাইয়া তখন।
বস্ত্র আদি আভরণ করে অন্বেষণ।।
না পাইয়া তস্কর ভাবায়ে মনোমন।
চোরোপরে বাট্‌পারি কৈল কোনজন।।
এত ভাবি নিরাশায় ঘরেতে আইল।
আদি অন্ত বিবরণ নারীকে কহিল।।
শুনিয়া তাহার নারী হইল দুঃখিত।
কন্যা লাগি দস্যু পত্নী হয় বিষাদিত।।
শুনিয়া তস্কর নারী তস্কররেরে কয়।
সেই তবে কন্যারে হরিল মহাশয়।।
এত বলি বিষাদিত দোঁহেতে হইল।

কন্যার কারণে দোঁহে খেদ উপজিল।।
এখানেতে বেশ্যালয়ে শুন যা ঘটিল।
নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে ধনী কান্দিতে লাগিল।
দেখিয়াও দুইজন বুঝায় তখন।
বলে তব পিতা মোরে কৈল সমর্পণ।
বিবাহ্ করেছি তোরে শুন ওলো ধনী।
কিছুদিন বিলম্বেতে পাঠাব আপনি।।
এত বলি প্রবোধ করিয়া ততক্ষণ।
সে রজনী সেইখানে করিল বঞ্চন।।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বলে নারীগণে।
বিদায় করহ্ দোহে যাব নিকেতনে।।
এত শুনি নারীগণ বিদায় করিল।
দুই জনে আপনার স্বদেশে চলিল।।
মিছেরাম প্রতি তবে নশীরাম কয়।
আমি কোথা যাব ভাই নাহিক আলয়।
মিছেরাম বলে তবে তুমি মোর ভাই।
আমার আলয়ে চঁল রহিব সবাই।।
এত শুনি নশীরাম আনন্দ হৃদয়।
উপনীত তিন জনে মন্ত্রীর আলয়।।
পুত্র পুত্রবধূ হেরি মন্ত্রী আনন্দিত।
মঙ্গলাচরণ করি লইল ত্বরিত।।
কুমারের প্রতি তবে মন্ত্রীবর কন।
তোমার পশ্চাতে এই কাহার নন্দন।।
পিতার নিকট তবে মন্ত্রীসুত কয়।
নশীরাম নাম উহার মম মৈত্র হয়।।
এত শুনি মন্ত্রীবর হরষিত মন।
চোরোপরে বাট্‌পাড়ি এই যে কারণ।।

কিসে নাই কি পান্তা ভাতে ঘি।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে
প্রণীত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাস ঘোষের
আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।
মূল্য ।০ আনা মাত্র।

[1863]

কিসে নাই কি পান্তা ভাতে ঘি

গীত।

রাগিনী কড়াই মুড়ি। কাল ফোচ্‌কে ছুঁড়ী।

খানকী বাজি কি ঝক্‌মারি অম্‌নি থাকা ভাল।
এটা কেবল ভোজের বাজী ফক্কিকারি বোঝা গেল।
যদি রূপচাঁদ পান, তবে হয় সন্তুষ্ট প্রাণ, নতুবা
নাই পরিত্রাণ, তিলে করেন তাল।।

পয়ার।

মল্লদেশ নামে স্থান অতি চমৎকার।
সুরত নামেতে এক দ্বিজের কুমার।।
অতিশয় দরিদ্র সে ব্রাহ্মণ তনয়।
দিনান্তরে অন্ন তার যোড়া ভার হয়।।
নিত্য২ ভিক্ষা করি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে করয়ে ভোজন।।
এই মতে কিছুকাল করয়ে বঞ্চন।
কতদিন পরে এক হইল নন্দন।।
পরম সুন্দর হৈল ব্রাহ্মণ তনয়।
হেরি বিপ্র আনন্দিত হৈল অতিশয়।।
ক্রমে২ তনয়েরে করয়ে পালন।
পঞ্চম বৎসরের শেষে হইল নন্দন।।
উপনয়নের কাল বহির্গত হয়।
ব্রাহ্মণীর প্রতি তবে দ্বিজবর কয়।।
পুত্রের হইল কাল যজ্ঞসূত্র দিব।
বলহ ব্রাহ্মণী ধন কোথায় পাইব।।
মোর অন্ন যোড়া ভার হয় দিনান্তরে।

কিমতে উদ্ধার হই বল দেখি মোরে।।
ব্রাহ্মণী বলেন নাথ শুনহ বচন।
কলিকাতা মধ্যে আছে ধনবানগণ।।
বহু২ পুণ্যবান আছে তথাকারে।
অর্থ দিয়া স্থাপিবেক আমা সবাকারে।।
চল২ প্রাণকান্ত যাব কলিকাতা।
উপনয়ন পুত্রের করিব গিয়া তথা।।
ভার্য্যের বচনে বিপ্র আনন্দিত মন।
পুত্রে সহ তিনজনে কৈল আগমন।।
কলিকাতা আসিয়া করিল নিকেতন।
ভিক্ষা করি ক্রমে অর্থ কৈল উপার্জ্জন।।
কায় ক্লেশে নন্দনের যোজ্ঞসূত্র দিল।
এইমতে কিছু কাল কাল কাটাইল।।
শিশুগণ সহ দ্বিজ সুত ক্রীড়া করে।
অপরেতে শ্রবণ করহ সবে পরে।।
সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট কহে জ্ঞানিগণ।
নেশাতে তৈঁয়ার হৈল ব্রাহ্মণ নন্দন।।
বিপ্রের তনয় হৈল নেশাতে তৈয়ার।
গাঁজাগুলি মদ কিছু বাকি নাহি তার।।
পুত্রের বাড়িল গুণ দেখিল ব্রাহ্মণ।
ধীরে ধীরে রমণীরে কহেন তখন।।

ব্রাহ্মণ। বলি ওহে প্রীয়ে কিছু শুনেছ? তোমার তো পুত্রের গুণ বেড়েছে, সকল নেশাতে মূর্ত্তিমান হলো আর কিছু বাকী নাই।

ব্রাহ্মণী। নাথ! আমি অবলা স্ত্রী জাতি, পুত্রকে কিরূপে নিবারণ করি এমন ক্ষমতা নাই, অমনি হিতবোধ দ্বারা যদ্যাপি নিবারণ করেন করুন নচেৎ নিরুপায়।

শুনিয়া দুঃখিত মনে ব্রাহ্মণ তখন।
পুত্রের নিকটে আসি কহেন বচন।।

শুন শুন ওরে বাছা অবোধ নন্দন।
নেশা ত্যাগ কর বাছা শুনহ বচন।।
কিসে নাই কি পান্তা ভাতে ঘি হেরি।
তোর জ্বালায় বুঝি বা হইব দেশান্তরি।।
ব্রাহ্মণের পুত্র তুমি হও নিষ্ঠামতি।
সর্ব্বদা করহ বাছা শিষ্টাচার মতি।।
আমিত হোলেম বাছা বৃদ্ধ অশীৎপর।
কোন দিন করালেতে গ্রসিবে সত্ত্বর।।
ব্রাহ্মণের রীতি নীতি শিখহ এখন।
সন্ধ্যা গাইত্রি সদা করহ পঠন।।
এতেক বলিয়া দ্বিজ বুঝায় পুত্রেরে।
কোনমতে প্রবোধ না মানে সে কুমারে।।
অকস্মাৎ এক দিন ব্রাহ্মণ তখন।
পুত্রেরে তাড়না পরে বলি কুবচন।।
ওরে পুত্র কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
বড়ই নিষ্ঠুর তুই ব্রাহ্মণ সন্ততি।।
দূর হও পাপিষ্ঠরে এখান হইতে।
এতবলি তাড়াইয়া দিল নিজ সুতে।।

গদ্য

তখন ব্রাহ্মণ পুত্র পিতৃতাড়নে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতা? তোমার মনে কি এই ছিল, আমি ব্রাহ্মণ্যের পুত্র হইয়া, এত দুর্গতি পাইতেছি, যাহা হউক এখান হৈতে আমাকে পলায়ন করিতে হইল। এবম্বিধ ভাবিতে২ মস্তক নত হইয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে সেই মৃত্তিকা হৈতে একখানি মণি প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষান্বিত হইলেন এবং জগদীশ্বরের প্রতি নানাবিধ ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে২ করিলেন, আর ত গৃহে যাইব না, তাহা হইলে পিতা মাতা রত্নখানি কাড়িয়া লইবেন। বহু কষ্টে বহু মূল্য লভ্য হইয়াছে, ইহা দ্বারা দিনকতক নবাবি করিতে হইবে, ইহা

ভাবিয়া ধীরে ধীরে অন্য এক স্থানে গমন করিয়া নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া অশ্ব জান নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র এক দিনেই হঠাৎ বাবু হইলেন, তদন্তর হৃদয়তে ভাবিলেন, এখন তো বন্ধুগণ সন্দর্শনে যাইতে হইবে ইহা ভাবিয়া নানাবিধ পোষাক পরিধান পূর্ব্বক যানোপরি আরোহণ করত বন্ধুর আলয়ে গমন করিলেন, তখন তাহার বন্ধুগণ বিপ্রনন্দনকে দৃষ্টি করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ ভাই বুঝি এই দিকে কোন ভাগ্যবন্ত আসিতেছেন, অনুমান করি কোন রাজা হইবে বুঝি সমর করিবেন, এইরূপ সকলে আলোচনা করিতে২ ব্রাহ্মণ তথায় উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধুগণ সহ সম্ভাষনাদি করিলেন, তখন বিপ্র পুত্রকে দৃষ্টি পূর্ব্বক সকলে কহিতে লাগিলেন, ভাই! এত ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে? আমাদের বলুন, তখন গুণাকর কহিলেন, বন্ধুগণ! তবে শ্রবণ কর। এক দিবস পিতা আমাকে বহু তাড়না করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি বিরক্ত হইয়া বাটী হইতে বহির্গমন করিয়া একস্থানে ভাবিতে লাগিলাম, তাহাতে জগদীশ্বর আমা প্রতি সদয় হইয়া একখানি বহুমূল্য দ্রব্য প্রদান করিলেন, তদ্দ্বারা আমি ধনবান হইয়াছি, ইহা শ্রবণে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন বন্ধুগণ ব্রাহ্মণ পুত্রকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ রসে ভোজন করাইলেন। তদন্তর বৈকালে ব্রাহ্মণ পুত্র বন্ধুগণকে সঙে লইয়া আপনার আলয়ে উপনীত হইলেন।

হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানা।

বিপ্রসুত হর্ষ মনে, গৃহে লয়ে বন্ধুগণে,
নানামত করয়ে আদর।
বৈকালে আনন্দ মনে, চলে যান আরোহণে,
ইয়ারগণ লইয়া সত্ত্বর।।
কালাপেড়ে ধূতি পরে, লম্পট পোষাক করে,
তদুপরে পরয়ে চাপকান।
পায়ে ইষ্টাকিন তার, শোভা বার্নিস জুতার,
টুপি শিরে দেয় লম্বমান।।
মকমল বুটাদার, ঢাকাই উড়নী তার,
রুমাল লইল বাম করে।

বাঁকা সীতা কি বাহার,   বলিহারি যাই তার,
রূপেতে মোহিত সবে করে।।
লয়ে সব বন্ধুগণে,   চলে যান আরোহণে,
উপনীত মেদুয়া বাজার।
যথায় বাঈজীগণ,   বাস করে অগনন,
নৃত্য গীত হয় সবাকার।।
কেহ গায় নাকি-সুরে,   তানপুরা লয়ে করে,
বোল ছাড়ে তানা নানা নানা।
শুনি যত বন্ধুগণে,   বলে চল এ ভবনে,
শ্রবণ করিব সবে গান।
এত বলি সকলেতে,   উঠি তবে যান হেতে,
বেশ্যালয়ে করিল পয়ান।।
বাবুদের আগমনে,   বাঈজী আনন্দ মনে,
নৃত্যভঙ্গ করিয়া তখন।
অভ্যর্থনা করি পরে,   বসাইল সমাদরে,
দেখি তবে কহে বন্ধুগণ।।
কহ বাঈজীগণ সব,   হইলে কেন নিরব,
নৃত্য গীত কর পুনর্ব্বার।
কোকিল জিনিয়া স্বর,   হেরি তোমাদের স্বর,
শ্রবণেতে করি আনুসার।।
শুনি বাবুদের বাণী,   বাঈজী আনন্দ মানি,
পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভিল।
তা থিনি তা থিনি থিনি,   মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি,
ভেড়ুয়াতে বাজাতে বসিল।।
দেখিয়া হঠাৎ বাবু,   অমনি হলেন কাবু ,
শত মুদ্রা শিরোপা করিল।
না থাকে তথায় আর,   বন্ধুসহ পুনর্ব্বার,
তথা হতে উঠিয়া চলিল।।

দ্বারা আসি ততক্ষণ,　　যান পরি আরোহণ,

সকলেতে যান অন্যন্তরে।

হেনকালে এক জন,　　অন্য জন প্রতি কন,

ঢঙ্গ করে ব্রাহ্মণে সত্বরে।।

(হরিদাস চাটুর্য্যের প্রবেশ।)

হরিদাস। ভট্টাচার্য্য মহেশ, বলি "কিসে নাই কি, পান্তা ভাতে ঘি" একি অপরূপ।

ভট্টাচার্য্য। বলি কি হে হরিদাস বাবু, বড় যে ঢঙ্গ করে এলে ব্যাপারখানা কি বল দেখি।

হরিদাস। বলি কিছু কি দেখেননি, একটা অপরূপ গেল।

ভট্টাচার্য্য। না হে কিছু দেখিনি, বলি খুলে খেলেই বলনা ভয় কি?

হরিদাস। বলি মহাশয়! তবে শুনুন।

একি কলি অপরূপ হেরি অকস্মাৎ।
শশীরে ধরিতে বাওন বাড়াইল হাত।।
নিম্ব বৃক্ষে শ্রীফল ফলিল এত দিনে।
বৃক্ষে আরোহণ করি নৃত্য করে মীনে।।
ক্ষুদ্র থালি মধ্যে প্রবেশিল মত্ত হাতি।
অকস্মাৎ পড়ে যেন দুপুরে ডাকাতি।।
প্রমদ নামেতে সেই সুড়ত নন্দন।
ভীক্ষারির পুত্র সেই জানে সর্ব্বজন।।
এখন হেরিনু তারে যায় পথ দিয়া।
বন্ধুগণ সহ চলে ফেটিং মারিয়া।।
এতেক ঐশ্বর্য্য সেই পাইল কোথায়।
সেই কথা তোমারে জিজ্ঞাসি মহাশয়।।
তার পিতা মাতা মরে অন্নের জ্বালাতে।
হা অন্ন যো অন্ন বলি দ্বারেতে দ্বারেতে।।
তাহার নন্দনে হেরি এত বাবুয়ানা।
হঠাৎ বাবু হয়ে চলে আহ্লাদে আটখানা।।

"কিসে নাহি কি, পান্তা ভাতে ঘি" ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইহার কারণ।

ভট্টাচার্য্য। বলি তাই তো হে হরিদাস, ভাই আমাকে দেখাতে পাল্লে না, তা হলে মজা দেখ্‌তে, আচ্ছা কেঁড়ে দিতুম।

হরিদাস। আচ্ছা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ও ভীক্ষারির পুত্র তো, তবে এত ধন পেলে কোথায়?

ভট্টাচার্য্য। "কপালং কপালং মূলঃ" ওর কপালে ছিল তাইতে পেরেছে, যাহা হউক এর পিতা মাতা বুঝি জানে না। বেটা কি দুষ্ট, এক পয়সাও মা বাপকে দেখায়নি, যা হউক আমাকে বলে আস্তে হলো, (বলিয়া প্রস্থান)

সুরতের বাটীতে ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

ভট্টাচার্য্য। বলি ও সুরত ঠাকুর ঘরে আছ। দরজাটা খোল।

সুরত। ওগো কে গো, ডাকাডাকি কোচ্ছে?

ভট্টাচার্য্য। ওহে আমি হে ভট্টাচার্য্য, একটা কথা আছে তোমাকে বল্‌তে এসেছি।

সুরত। দ্বার উদঘাটন, কে ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়। আস্তে আজ্ঞা হয়, আপনি যে অদ্য আমার আলয়ে আগমন আমার বহু ভাগ্‌গি। আসুন বসুন; মহাশয়, আমি অতি গরিব, এমন স্থান নাই যে আপনাকে বসিতে দি এই খানে বসুন।

ভট্টাচার্য্য। ওহে সুরত ঠাকুর! তোমার পুত্র কোথায় আর যে এখন দেখিনি।

সুরত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়। আমার পুত্র তো এখানে নাই সে বহু দিন এখানে ছাড়া। তাকে আমি তেজ্য পুত্র করিয়াছি।

ভট্টাচার্য্য। তোমার পুত্রকে যে আজ দেখ্‌নু হে, সে কতকগুলিন বন্ধুর সহিত ফ্যাটিং মেরে যাচ্ছিল।

সুরত। না মহাশয় সে অর্থ পাবে কোথায়, তবে যদি গিয়া থাকে ইয়ারদের সঙ্গে গিয়াছিল, তার সহিত আপনার কোথায় দেখা হলো, আচ্ছা আমাকে দেখাইতে পারেন?

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা ঠাকুর কল্য তোমাকে হরিদাসের দোকানে দেখাব সেইখানে থাকেন। (ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান)

প্রমদের প্রমদার আলয়ে প্রবেশ।

এখানে প্রমদ বন্ধুগণ সমিভারে প্রমদার আলয়ে শুভ গমন করিলেন, প্রমদা নাম্নী বেশ্যা অতি সুন্দরী প্রমদ তাহার দৃষ্টি মাত্রে মদন বাণে জর্জ্জরীভূতা হইলেন। তখন বিপ্রসুত কহিলেন, ওহে! গণিকা তোমার নয়ন কটাক্ষ বাণে আমি অবশ হইলাম। অতঃপর আমার মনোআশা পূর্ণ কর। ইহা শ্রবণে প্রমদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিলেন। ওহে! নবনাথ আপনকার কন্দর্পশরে আমিও জর্জ্জরীত হইলাম অতএব আসুন আমরা মনোআশা পূর্ণ করি, বলিয়া নাগরী নাগর দুই জনে রতিক্রীড়ায় প্রর্বত্ত হইলেন, ক্রীড়াবসানে বন্ধুগণ উত্তম সুরা ও উৎকৃষ্টসামগ্রী আনয়ন করিয়া সকলেই পানে প্রর্বত্ত হইলেন, তদন্তর সুরা পানাবসানে উত্তম শয্যোপরি শয়ন করিয়া কহিলেন, ওহে নবনাগর আপনার নাকি পাঁচালি গাহনাতে বড় অভ্যাস হইয়াছে। অতএব আপনি যদ্যপি একটি ছড়া বলেন তবে শ্রবণে চরিতার্থ হই, তখন রসনাগর কহিলেন হে প্রাণেশ্বড়ী! যদ্যপি আপনার ছড়া শ্রবণে অভিরুচি হইয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন।

ছড়া।

আমি ষণ্ডামার্ক কাণ্ড জ্ঞান নাস্তি।
মূর্খবিদ্যা লোপাপ্রত্তি নিজে মূর্খ হস্তী।।
বর্ণজ্ঞান নাহি আমার ভেঙ্গে চুরে বলি।
বুদ্ধি পেকে গোলে গেল ভেবে হৈনু কালী।।
ছেলে বেলা ধস্তাধস্তি করে শিখেছিনু ক।
এখন তারে ঠাউরে বলি হলহলে হ।।
অঙ্কে অঙ্কে পড়েছিনু পেটে আছে ভরা।
হুট পাট করে যেন পাট নেয়ে ম্যাড়া।।
ইংরাজি শিখিয়াছিনু এ বি সি।
তারা পেটে নড়ে আমি ধরে রেখেছি।।
পারস্য শিখিয়াছিলাম আলেফ বে তে সে।
তারা যখন নড়ে পেটে ধরে রাখে কে।।
গাহনা বাজনা কিছু২ ইয়াদ আছে।

সেয়াল কুকুর ভয়ে এগয় নাকো কাছে।।
সকল বিদ্যা আছে আমার কিছু২ শেখা।
টাকা আস্তে বলে যদি হৈ কচি খোকা।।
সকল কর্ম্মের ওস্তাদ আমি সাকরেদ নৈ।
কথার ধুক্ড়ী ভরা বাহির যখন করি।
ঘরের লোকে মারে মোরে শতমুখীর বাড়ি।।
ঝড়ের আগে ঝকড়া করি মার খেতে খুব পাড়ি।
পরের কিছু কর্ত্তে নারি ঘরের ভাঙ্গি হাঁড়ি।।
এত গুণ আছে মোর তাই প্রাণ বাঁচে।
যমে যেন ঘাড় ভাঙ্গে না কেন ভুলে আছে।।
গায়েতে ফু দিয়ে বেড়াই করে অষ্টরম্ভা।
মুখের শাটে কেহ না আঁটে কথা গুল লম্বা।।
কুকর্ম্মেতে মূর্ত্তিমন্ত নাহি কোন আক্কেল।
গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না মাথায় ফুলল তেল।।

রসরাজ বিনোদিনীকে ছড়া কহিতে নাগরী হর্ষ হইলেন। এইরূপ ক্রমাগত প্রমদ বন্ধুগণ সহিত মিষ্টালাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন, ক্রমে২ এক বৎসর বহির্গত হইল, এক দিন প্রমদা প্রমদকে কহিতে লাগিলেন, অই নাথ? আমার কালীঘাটে যাইতে বাঞ্ছা হইয়াছে অতএব আপনি চলুন, ইহা শ্রবণে প্রমদ স্বীকার পাইয়া নানাবিধ যানোপরি বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সকলে সু যাত্রা করিলেন, প্রমদের কালী দর্শনে মম চাঞ্চল্য হইল, মনে হইল কে কার।

এত ভাবি প্রমদের ভক্তির উদয়।
অকস্মাৎ মন তার চাঞ্চল্যতা হয়।।
গললগ্ন কৃত বাসে বিপ্রের নন্দন।
করিছে কালির স্তব তদগদ মন।।
জয়২ জয় কালী কাল বিনাশিনী।
কুল কুণ্ডলিনী কাল রাত্রি কপালিনী।।
জয়২ শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন।

কৃষ্ণ রূপে কর কংসাশুরের নিধন।।
রাম রূপে রাবণের নিধন কারিণী।
তংহি বিশ্বকর্ত্রী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী।।
জয়২ জয় দেবী নাশ দুর্গাসুরে।
কংসাশুরে বধ কর কৃষ্ণরূপ ধোরে।।
এইরূপে নানা মতে দ্বিজ করে স্তুতি।
আশু আসি বর তবে দিলা ভগবতী।।
হরিস হইয়া দ্বিজ বন্ধুগণ সঙ্গে।
দেবীর কারণ পূজা নানাবিধ রঙ্গে।।
ছাগ মেষ মহিষাদি দিল বলিদান।
পূজা অন্তে করে সবে সস্থানে প্রস্থান।।
প্রমদার আলয়েতে সে দিন রহিল।
পর দিন ধিরে২ প্রিয়াতে কহিল।।
শুন২ প্রাণেশ্বরী করি নিবেদন।
একবার নিজালয় করিব গমন।।
আসিব আবার আমি কিছু দিনান্তরে।
এত ভাবি বন্ধু সহ চল নিজ ঘরে।।
পুত্র হেরি পিতা মাতা আনন্দ হইল।
যতেক আছিল অর্থ পিতারে অর্পিল।।
অর্থ পাযে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনন্দিত।
পুত্রের বিবাহ দিল ব্রাহ্মণ ত্বরিত।।
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দিত হইয়া করে কালযাপন।।
কবিবর ভনে অতঃপর বিবরণ।
যার পুত্র তার ঘরে করিল গমন।।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

পড়-বাবা আত্মারাম।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে
প্রণীত।

শ্রীশ্রীনাথ লাহার আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।

মূল্য এক আনা মাত্র।

[1863]

পড়-বাবা আত্মারাম

ধনঞ্জয় নামে এক কায়স্থ নন্দন।
রূপ অতি মনোহর ভুবনমোহন।।
বাঁকা সিঁতে টেড়ি ফেরা জামা ঘোড়া গায়।
অপূর্ব্ব তিলক তার শোভিছে নাশায়।।
কালা পেড়ে ধূতি পরা জাম্‌দানি উড়ানি।
চুনোটি করিয়া স্কন্ধে ফেলিয়া আপনি।।
লালবাজারের জুতা অতি মনোহর।
পরিয়া চলেন বাবু রাস্তার উপর।।
করেতে ইষ্টিক করি জান ধীরে ধীরে।
মানস হইল যেতে বেশ্যার মন্দিরে।।
আপনার মনে বাবু ভাবেন তখন।
অসভ্য বেটীদের গৃহে যাব না কখন।।
একবার কুস্থানেতে করিয়া ভ্রমণ।
ঘটে ছিল যে যাত্‌না কি কব এখন।।
খেয়েছি ক্রমিক অড়রদাল পটল ভাজা।
এক বর্ষে ক্রমাগত পাইলাম সাজা।।
এখন সে সব কথা মনে হলে পরে।
কণ্টক হইয়া উঠে গাত্রের উপরে।।
এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া মনেতে।
উপনীত হন বাবু মেছো বাজারেতে।।
একেত বৈকাল বেলা তাহে মধুবার।
তাতে চিৎপুর রোড অতি চমৎকার।।
কত শত লোক জন যাতায়াত করে।
টলমল করে পথ গাড়ি পাল্কী ভরে।।

যাতায়াত করিবারে স্থান নাহি পায়।
ক্ষণেক২ বাবু পথেতে দাণ্ডায়।।
বারাণ্ডায় বেশ্যাগণ চেয়ার উপরে।
গীত নাট করে সবে আনন্দ অন্তরে।।
কোন কোন বেশ্যা বলে মরি মরি আহা।
কেহ তার পশ্চাতেতে করিতেছে বাহা।।
এই মত রঙ্গ রস করে বেশ্যাগণ।
কেহ কেহ থথ পানে করে নিরীক্ষণ।।
হেরি ধনঞ্জয় বাবু হরিষ অন্তর।
প্রবেশ করিল এক প্রমোদার ঘর।।
পদ্ম নামে সেই বেশ্যা অতি রূপবান।
কটাক্ষে হরিল যুবকের মন প্রাণ।।
তাড়াতাড়ি তাহার গৃহেতে উপনীত।
বেশ্যার ছেনালি দেখি হৈল চমকিত।।
বেশ্যার যতেক মায়া মহামায়া প্রায়।
কচুপোড়া খান যিনি ভুলেন মায়ায়।।
আগে যখন বাবু আসেন নূতন২।
বাবুর জন্যেতে বিবি হয়ে জান খুন।।
দিন কতক মৌখিক ভালবাসাবাসি।
তাহার পরেতে মার্গে পারেন সাঁড়াসি।।
একটুকু সূত্র পেলে তিলে করেন তাল।
মুখ বাঁকা বাঁকি পরে থাকে সর্ব্বকাল।।
নাগর আসিয়া পরে সাধেন তখন।
অসাধ্য জানিয়া শেষে ধরেন চরণ।।
তবু নাহি ভাঙ্গে মান মোন ভরে রয়।
বদন করিয়া ভারি কথা নাহি কয়।।
কূটনী আসি মিছামিছি বকেন তাহারে।

ঝিকে মারেন বৌকে শিখাইবার তরে।।
মায়াতে পড়িয়া শেষে নাগর তখন।
রূপচাঁদ দিয়ে বস করে ততক্ষণ।।
টাকা পায়ে মুটভরা কুটনী আনন্দ।
বাবুরে বলেন ভাল ছুঁড়ী প্রতি মন্দ।।
বাবুর খোসামোদ করে মৌখিক বচনে।
রাঁড়খোর যাহারা আনন্দ হয় মনে।।
বলে মোরে ভাল বাসে কুটনী যেমন।
কাহারে যা বাসে ভাল বুঝিনু এখন।।
কুটনীর আঠার কান নির্ব্বোধে না জানে।
বলে মাসী মোরে ভাল বাসে প্রাণপণে।।
সেইরূপ এই বাবু দেখিয়া কামিনী।
মোহিত হইয়া গেল আপনা আপনি।।
বেশ্যা দিল চেয়ার আনি বসিতে তখন।
বসেন চেয়ার পরে হরষিত মন।।
অম্বুরি তমাক তার পরেতে সাজিয়া।
বাবুরে আনিয়া দিল হাসিয়া২।।
তার পরে সাচিপান খিলি মনোহর।
নাগরে আনিয়া দিল নাগরী উৎপর।।
তার পরে মনো আশা জিজ্ঞাসা কারণ।
বিনোদিনীর প্রতি পরে জিজ্ঞাসে বচন।।
শুন ওহে প্রাণেশ্বরী জিজ্ঞাসি তোমায়।
নিজস্য রহিতে পার কতেক টাকায়।।
হাসি২ বিনোদিনী বিনোদেরে কয়।
শত মুদ্রায় রহিতে পারি হে মহাশয়।।
কাহারে না আসিবারে আর আমি দিব।
আপনার নিকটেতে কনট্রাকট রহিব।।

চিরকাল নরক ভুঞ্জয়ে সেই জন।
কোন কালে নাহি ভগবান দরশন।।
অতএব শুন বন্ধু করি নিবেদন।
কি কারণে অর্থ তুমি কর অণ্বেষণ।।
নিরন্তর ভগবানে কর আরাধনা।
চরমেতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে আপনা।।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাবে চাপিয়া বিমানে।
কি কার্য্য হইবে ভাই অর্থের সাধনে।।
এইরূপ যত বুঝায় ব্রাহ্মণ নন্দন।
কোন ক্রমে বন্ধু নাহি করয়ে শ্রবণ।।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
ব্রাহ্মণ তনয় তারে কতেক বুঝায়।।
কুপিত হইয়া কহে কায়স্থ নন্দন।
হিত উপদেশ নাহি করিব শ্রবণ।।
উপকার কিছু যদি পারহ করিতে।
কেনা হয়ে রব আমি তব নিকেটেতে।
কায়স্থ নন্দনের শুনি এতেক মিনতি।
অর্থ কিছু দিল তারে দ্বিজ মহামতি।।
অর্থ পায়ে আনন্দিত হয়ে অতিশয়।
বন্ধুরে সে কেন করি বিনয়েতে কয়।।
আইস বন্ধু এক স্থানে করিব গমন।
বড় মজাদার স্থান অতি সুচিকন।।
স্বর্গের অধিক সুখ তথায় পাইবে।
তথায় রহিবে আর কোথা না যাইবে।।
বন্ধুর শুনিয়া বাক্য ব্রাহ্মণ নন্দন।
বলে কহ আগে কোথায় করিব গমন।
শুনিয়া কায়স্থ সুত কহে ব্রাহ্মণেরে।

চল যাই মোরা এক প্রমোদার ঘরে।।
আজি হয় মধুবার বড় মজাদার।
করিতে হইবে কিন্তু মদ্য ব্যবহার।।
এত শুনি দুইজন করিল গমন।
পথেতে কনিল ক্রয় মদ্য সে তখন।।
তদন্তর ক্রয় করে খাদ্য দ্রব্য যত।
তার পর কিনিল প্রমোদার মনমত।।
তৎপরেতে দুইজন প্রিয়ার আলয়।
দ্রুতগতি আসি তবে উপনীত হয়।।
দ্বারে আসি আঘাত করিল ততক্ষণ।
দেখি বিনোদিনী দ্বার খুলিল তখন।।
দুইজনে প্রবেশ করিল তদন্তর।
মদ্য হেরি প্রমোদার হরিষ অন্তর।।
সমাদরে বন্ধুরে বসায় চিয়ারেতে।
তমাক সাজিয়া আনি দেয় যতনেতে।।
ছাঁচিপানে মিঠাখিলি করি তদন্তর।
ভক্ষণ করিতে ছিল দোঁহারে তৎপর।।
তদন্তর নিকটেতে আসিয়া সত্বর।
হাস্য মুখে বিনোদিনী ঠেসে তদন্তর।।
ব্রাহ্মণ নন্দন বলে ওহে বিনোদিনী।
গীত একটা গাও ভাই শ্রবণেতে শুনি।।
এত শুনি পদ্মমুখী হরিষ অন্তর।
গাইতে লাগিল যেন কোকিলের স্বর।।
গীত শুনি বিপ্র সুত মোহিত হইল।
অবাক হইয়া তবে চাহিয়া রহিল।।
অধিক হইল রাত্র গীত শ্রবণেতে।
সে বাটীর বেশ্যাগণে ডাকিল পরেতে।।

বিমলা বরদা আইল আর তারামণি।
শশীমুখী মনোরমা পার্ব্বতী আর ধনী।।
কামিনী কাদম্বিনী আর কামেশ্বরী।
একে২ সে বাটীর আইল যত নারী।।
চাঁদের হাট হৈল যেন পদ্মের আলয়।
চারিদিগে ঘেরিয়া বসিল নারীচয়।।
মধ্যস্থলে দুই বন্ধু বৈসে তদন্তর।
মদ্য পান করে সবে আনন্দ অন্তর।।
ঢালি২ দেয় সবে কায়স্থ নন্দন।
মহাসুখে ভক্ষণ করিছে নারীগণ।।
ক্ষণেকেতে সে মদ্য সকল ফুরাইল।
দেখিয়াত বাবু তবে লজ্জিত হইল।।
নিমন্ত্রণ করিলাম সকল বেশ্যারে।
কি করিব এক্ষণেতে ভাবয়ে অন্তরে।।
গোপনে পদ্মের ডাকি কহে বিবরণ।
এক কথা বলি পদ্ম করহ শ্রবণ।।
নিমন্ত্রণ করিলাম বেশ্যাগণে যত।
এক্ষণেতে প্রিয়ে বুঝি হই মানে হত।।
ক্রয় করে আনিলাম দশটাকার মদ্য।
দেখিতে২ ফুরাইল তাত সদ্য সদ্য।।
এক্ষণে ছয় টাকা আছে আমার গোচর।
মদ্য ক্রয় করে আনি বলহ সত্বর।।
তোমারে লো দিব টাকা কিছু দিন পরে।
অনুমতি হৈলে মদ্য আনিহে তৎপরে।।
এত শুনি বিনোদিনী করিল স্বীকার।
শুণ্ডিকা আলয়ে যায় কায়স্থ কুমার।।
ছয় টাকার মদ্য ক্রয় করিয়া আনিল।

বেশ্যাগণে খাইবারে ঢালিতে লাগিল।।
মদ্যপানে ঢল ঢল হইল সর্ব্বজন।
নেশায় হইয়া মত্ত যত নারীগণ।।
আপনা আপনি সবে বকিতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল।।
বিপ্র সুত তদন্তর বিদায় হইল।
হর্ষ মনে আপনার গৃহেতে চলিল।।
এখানেতে প্রমোদার মাতা যেই জন।
খরচ চাহিল তবে বাবুর সদন।।
শুনিয়াত বাবু কহে করিয়া মিনতি।
দিন কত বাদে খরচ দিব গে সংপ্রতি।।
শুনিয়া কুপিত মনে কুটনী তখন।
বিধিমতে তনয়ারে করিছে ভর্ৎসন।।
ধিক্ ওলো কলঙ্কিনী কামে মত্ত হয়ে।
ফোতো বাবু বেটাদের থাকিস লো লয়ে।।
জানি২ বেটাদের যত বাবু আনা।
আজ অবধি বেটারে আসিতে কর মানা।।
নতুবা হইবে অদ্য প্রমাদ ঘটন।
দেখি আমা বিদ্যমানে আইসে কোনজন।।
এই রূপে বিধিমতে কুটনী তখন।
ঝীকে মারি বৌকে শিখায় ততক্ষণ।।
মৌনভাবে থাকে বেশ্যা কথা নাহি কয়।
ভাবি বাবু হয়ে কাবু বহির্গত হয়।।
কি করিব কোথা যাব ভাবয়ে অন্তর।
মনে ভাবি যাই দেখি বিপ্র বন্ধু ঘর।।
যদি কিছু তঙ্কা পারি কর্জ্জ লইবারে।
তবেত আসিব পুনঃ বেশ্যার আগারে।।

নতুবা কুটনী বেটী যাইতে না দিবে।
তারে না হেরিলে পুনঃ প্রমাদ ঘটিবে।।
এত ভাবি উপনীত বন্ধুর আলয়।
বন্ধুরে দেখিয়া বিপ্র আনন্দিত হয়।।
বিপ্র বলে কহ বন্ধু শুনি বিবরণ।
কি কারণে আগমন আমার ভবন।।
বন্ধু বলে ওহে বন্ধু করি নিবেদন।
বিপাকে পড়িয়া করি হেথা আগমন।।
ষোল টাকা কর্জ্জ করিলাম তব স্থানে।
সেই টাকা কালি সব গেছে মদ্য পানে।।
খরচের অভাব হয়েছে কিছু আর।
কুটনী সহিত দ্বন্দ্ব হয়েছে আমার।।
অদ্যবধি আমারে আর যাইতে না দিবে।
ইহার উপায় ভাই বল কি হইবে।।
বিষম কুটনী সেই বিষম গস্তানী।
কি রূপেতে ভাঙ্গি ভাই তাহার মস্তানী।।
কুটনী করিলে জব্দ বেশ্যা করি হাত।
নির্ভয়েতে নিরন্তর করিল যাতায়াত।।
এত শুনি হাসি হাসি বিপ্রসুত কয়।
এক উপদেশ বলি কর মহাশয়।।
আমার হাতের এই যষ্টি লয়ে যাহ।
গোপন স্থানে লয়ে ইহারে রাখহ।।
যখন কুটনী রাত্রে করিবে শয়ন।
এই যষ্টি তার অঙ্গে করিবে ঘাতন।।
আকস্মাৎ সে ময়না হইবে পক্ষ চর।
লইয়া রাখিবে তারে পিঞ্জর ভিতর।।
তব প্রিয়সীরে দেখাইবে তার পরে।

সুখী হবে তব বেশ্যা হেরি সে পক্ষীরে।
তোমারে বাসিবে ভাল সে ধনী তখন।
নিষ্কন্টকে বেশ্যাসহ করিবে বঞ্চন।।
এত শুনি আনন্দিত কায়স্থ তনয়।
বন্ধুরে কহিল কথা করিয়া বিনয়।।
চারি তঙ্কা কর্জ্জ করি লইল তখন।
যষ্টি করে বেশ্যালয় করিল গমন।।
চারি তঙ্কা আনি দিল প্রিয়ার গোচর।
দেখিয়া কুটনী মনে আনন্দ অন্তর।।
দেখিতে দেখিতে রাত্র আগত হইল।
প্রমোদ প্রমোদা সহ শয়ন করিল।।
অর্দ্ধ যামিনীতে উঠে কায়স্থ নন্দন।
কুটনী অঙ্গে সেই যষ্টি করিল ঘাতন।।
ময়না হইল পক্ষ অতি মনোহর।
লইয়া তাহারে রাগে পিঞ্জর ভিতর।।
তদন্তর সেই বাবু করিল শয়ন।
নিশিগত প্রভাতেতে উঠিয়া তখন।।
প্রিয়ারে দেখায় পক্ষ পিঞ্জর ভিতর।
হেরি পক্ষ বেশ্যা হয় সানন্দ অন্তর।।
বেশ্যার সাক্ষাতে পক্ষ পড়ায় অভিরাম।
পড় বাবা একবার ওরে আত্মারাম।।
পড়ে বেটী ময়না হরিনাম একবার।
জন্ম হানি ধরা পরে হবে তব আর।।

সমাপ্তং।

বিজ্ঞাপন .

সর্ব্ব সাধারণ জনগণ সন্নিধানে সবিনয় পুরঃসর বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সকল পুস্তক দরকার হইবে তাঁহারা গরাণহাটার ২৬৯ নং পুস্তকালয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র কি লোক মূল্য সহিত পাঠাইলে পাইতে পারিবেন আর ইহার কমিস্যন ফি টাকায় ।০ এক আনা পাইবেন ইতি।

শ্রীশ্রীনাথ লাহা।

নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে
প্রণীত।

শ্রীশেখ জমিরদ্দীন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।
মূল্য ।১০ আনা মাত্র।

[1863]

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক গরাণহাটার দক্ষিণাংশে শ্রীমতী পান্না বিবির বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর পিরীতি বিষম জ্বালা নাটক ও বুড়ো বুড়ির ঝকড়া, আর দু সতীনের ঝকড়া ছাপা হইতেছে জানিবেন ইতি ১২৭০ সাল ২২ জৈষ্ঠ।

জিলা হুগলি থানা হরিপাল সাং বন্দিপুর।

শ্রীশেখ জমিবদ্দীন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত।

নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি।

নাটক।

(নটের প্রবেশ)

(স্বগত) আহা! এই রঙ্গস্থল কি রম্যকর হইয়াছে, আমার মন প্রাণ জীবন নয়ন সফল করিল, ইহাতে আমার কি সাধ্য যে এই রঙ্গস্থলে আমি একাকী গমন করি, তবে অগ্রে প্রিয়াকে আহ্বান করি।

রাগিনী জয় জয়ন্তী। তাল জৎ।

কোথা ওহে প্রাণেশ্বরী দেহ দরশন।
তোমা বিনে এ ভয় আমার কে আর করে নিবারণ।।
তোমা বিনে নাহি জানি, শুন ওহে বিনোদিনী।
মোহিত কর আপনি, আসিয়া ত্বরায় এখন।।
বসিয়া আছেন সভায়, গন্যা মান্য মহাশয়।
তুষিতে হবে সবায়, তাঁদের যে এইক্ষণ।।
কোথা ওহে প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমা বিনে এ সভাতে কে করে গমন।।
সমুদ্র সমান সভা দেখে হয় ভয়।
কার সাধ্যি এ সভাতে একা আগু হয়।।
বাসব সমান শোভা সভার বর্ণন।
যাহাতে আছয়ে দশ জন মান্যগণ।।
দশ জনার আগমনে প্রভু অধিষ্ঠান।
দশ চক্রে ভগবান ভূত জানিহ প্রমাণ।।
দশ মাথা রাবণের সবে করে ভয়।
দশরথ রাজা দেখ তেজবন্ত হয়।।
দশজন পরিবারে গৃহস্থ বলায়।
দশের লাঠি একের বোঝা জানিহ নিশ্চয়।।

দশভুজা দুর্গা দেখ দৈত্য নিপাতিনী।
দরগার সত্যপির সত্যময় তিনি।।
দেখ প্রিয়ে তুমি আইলে হই দুই জন।
করিব সবার তবে মানস পুরণ।।

(নটীর প্রবেশ)

রাগিনী সুরট। তাল পোস্তা।

কেন প্রাণনাথ তুমি তাকিয়ে কহ আমায়।
ঘুমে অঙ্গ ভারি হয়ে চলিতে নারি ত্বরায়।।
একেত নারী অবলা, সহজে হই চঞ্চলা, অবলা
তাহে অফলা, জন্ম বৃথা হে ধরায়।। তুমি হে
পুরুষ ধন্য, নারী মধ্যে অগ্রগণ্য, ত্রিভুবন মধ্যে
মান্য, পরেষ মুনির প্রায়।।

ত্রিপদী।

কেন নাথ কি কারণে, ডাকিলে কহ বচন,
স্বরূপেতে বল বল শুনি।
শয্যাতে কর শয়ন, ঘুমে অঙ্গ অচেতন,
নিদ্রাগত ছিলাম আপনি।।
কহ নাথ করি দয়া, বিবরণ প্রকাশিয়া
শুনিয়া যুড়াক মোর মন।
পরেতে কর্ত্তব্য যাহা, আমি হে করিব তাহা,
এই মোর শুন বিবরণ।।

নট উক্তি গীত।

রাগিনী বসন্ত। তাল মধ্যমান।

এসহে এসহে এস প্রাণ সজনী।
রঙ্গস্থলে উদয় আসি হও ওহে বিনোদিনী।।

তোমাবিনে এই কার্য্য, কে আর করিবে ধার্য্য,
হইয়াছি কি আশ্চর্য্য, মণি হারা যেন ফনী।
রঙ্গস্থলে রঙ্গকর, ভুলাও যত মান্যবর, তোমার
গুণেতে মোর, সর্বত্রে বীজয় জানি।।

শুন ওহে প্রাণেশ্বরী করি নিবেদন।
নাট্যস্থলে বাকছল হবে আরম্ভন।।
মনবাঞ্ছা তোমাবিনে আর কে পুরাবে।
আশু আসি উদয় হও প্রিয়োসিনী তবে।।
সামান্য না হয় ধনী এই নাট্যগীত।
একেবারে সকলেতে হইবে মোহিত।।
কত মান্যামান বসিয়াছে এ সংভায়।
এক এক জনা হন বাসবের প্রায়।।
তা সবার মনরঞ্জন করিতে হইবে।
একেলার কর্ম্ম নয় নিশ্চয় জানিবে।।
অতেব তোমাকে ধনী করিনু আহ্বান।
আমা হৈতে হবে তুমি অতি জ্ঞানবান।
বুদ্ধিমতী হও তুমি শিষ্ট শান্ত মতি।
বিলম্ব হইলে আর নাহিক নিষ্কৃতি।।
অতঃপর রঙ্গভূমে আইস ত্বরায়।
বিলম্বেতে কার্য্য নাশ জানিবে নিশ্চয়।।

(নটীউক্তি)

নটী কহিলেন হে রসরাজ? আপনি যে আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি একে কুলবালা তাহে অবলা, কিছুই জ্ঞান নাই অতএব কার উক্ত এই নাট্য আরম্ভ হইবে আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি তবে অবশ্য আপনার আশীর্ব্বাদে অবশ্য সফল করিতে পারিব।

নটউক্তি।

শুন ওহে প্রাণ প্রিয়ে করি নিবেদন।
নেশাখুরি ঝকমারি নাটক বর্ণন।।
মহেশচন্দ্র দাস দে হইতে বিরচন।
অমৃত জিনিয়া ভাসা তাহার বর্ণন।।
সেই নাটক আরম্ভ করিব দুইজনে।
সে বর্ণন উক্তি কেবা করে তোমাবিনে।।
অতএব প্রাণেশ্বরী করি নিবেদন।
বিলম্বেতে কার্য্য নাই কর আরম্ভন।।

প্রথম অঙ্ক।

(চারিজন ইয়ারের প্রবেশ)

কোথা হে গোপাল বাবু ঘরে আছ হে? ওহে দ্বারটা খোল।

গোপাল। কে হে দ্বারে ঘা মাচ্চো।

ইয়ারগণ। ওহে আমরা হে তোমার ইন্টিমেট ফ্রেন।

গোপাল। ইস্ আজ যে বড় বন্ধুগণ তবে সকলে ভাল আছ, অনেক দিনের পর যে হে আর যে দেখিনি তবে কি মনে করে ভাই।

ইয়ারগণ। ভাই আজ বাগানে যাচ্ছি চল, আমরা আবার কাল্‌কে আস্‌ব।

গোপাল। ওহে বন্ধুগণ এক ছিলিম তমাক খাও, ওহে হরেকৃষ্ণ তমাক দে জা।

হরেকৃষ্ণ। এই তমাক খান মশায়।

(চারিজন বন্ধুসহ গোপালের বাগানে প্রস্থান)

আগেতে বাগানে গিয়া রন্ধনি ব্রাহ্মণ।
নানামত খানার করেছে আয়োজন।।
হাঁসের ডিম্বের বড়া মুরগীর ঝোল।
আলু পটল ভাজা আর হয়েছে নারকোল।।
চিংরীর ধোকা আর রুয়ের পোলয়া।
রান্ধিয়াছে নানামত মসলা তায় দিয়া।।

রন্ধন তৈয়ার তবে হেরি বাবুগণ।
সকলেতে স্নান করি কৈল আগমন।।
চারিটা বোতল মদ্য আইল তদন্তর।
বসিল খাইতে সবে আনন্দ অন্তর।।
চারিদিগে বসিলেন বন্ধু কয়জন।
বেশ্যা দুই জনে বসি মধ্যেতে তখন।।
ঢালিয়া ঢালিয়া সবে খাইতে লাগিল।
একেবারে চারিটা বোতল ফুরাইল।।
মদ্য বিনে বন্ধুগণ হয়ে খেদান্বিত।
আনন্দে গাইছে কেহ শ্যামবিষয় গীত।।

রাগিনী বসন্ত বাহার। তাল ঠেকা।

ওমা কালী আমাদের মদের বোতল কেন খালি।
ভাড়ে মা ভবানী হয়ে বৈস মুণ্ডমালী।।
মুড়ি কড়াই কাছে পাড়ি, যাচ্ছে মাগো গড়াগড়ি
হোচ্ছে মাগো ছড়াছড়ি দিচ্ছে করতালি। খাপ
ছাড়া হলে দশা, দেখ দেখি কি তামাসা মদ্য
বিনে হীন দশা বুঝি হলো সকলি।।

এইরূপ বন্ধুগণ আক্ষেপ করত সকলেই ভোজন করিতে বসিলেন, পরে ভোজন সমাধা হইলে কেহ স্নান করিতে লাগিলেন কেহবা মৎস্য ধরিতেছেন, এইমত সকলেই মাতলামি করিতেছেন, কেহবা চিৎপাত হইয়া জলে ভাসিতেছেন, ইহা দিগের আচরণ দেখিয়া সকলেই ছি ছাক্কর করিতে লাগিলেন, তাহা বাবুদের কাকু শুনে, এমত সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক জল লইতে আসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, কেহ বলিতেছে ইহারা বুঝি সুড়ির ছোচানি খাইয়াছে তাহাতে এইরূপ ঘটিয়াছে। কেহ বলিতেছে ওগো দিদি মাতাল হওয়া কি খারাপ। দেখ দেখি কি দুর্গতি হইতেছে আহা! ধূলায় পড়িয়া জ্ঞান শূন্য হইয়াছে মদ্য ভদ্রেত খায় না যদি খায় সেই অভদ্র এই বলিয়া সকলে জল লইয়া প্রস্থান করিলেন, গোপাল বিছানাতে

পড়িয়া এক স্বপন দেখিতেছেন যেন তিনি অদ্ভুত নামা এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া মনোহর উপবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, উপবন অতি সুন্দর চারিদিকে নানাজাতি তরু শ্রেণীতে শোভিত হইয়াছে বিবিধ সুগন্ধি কুসুম বৃক্ষ সকল প্রস্ফুটিত পুষ্প পুঞ্জে অতি রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের মৃদুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে। গোপাল ঘোষ তখন উপবনের শোভা সন্দর্শনে, অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং উদ্যানের সকল দিগে সুদৃশ্য বৃহৎ বৃহৎ পুত্তলিকা দেখিয়া বারে বারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তাহার হঠাৎ পিপাসা হইলে জলপান জন্য পুষ্করণীর অভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন, সরোবর অতি মনোহর, দুই দিগে পুষ্করণীর ঘাট বান্ধা, চারিদিগে নানা জাতি অতি ক্ষুদ্র২ পুত্তলিকা রহিয়াছে, পরে জলে নামিয়া একাঞ্জলি জল গ্রহণপূর্ব্বক মুখে দিবা মাত্র 'রাম রাম' কি দুর্গন্ধ জল তো কখন এমন কোন পুকুরে দেখি নাই হরি হরি, একার বাগান? তার মতন নরাধম তো ত্রিভুবনে নাই, হায় হায়! সকলি হিন্দুর দেবতার মত কেবল পুতুল সার।

পুকুরের জল দেখি, পরাণ আকুল।
কেবল দেখিতে পাই সুন্দর পুতুল।।
পচা গন্ধে প্রাণ যায় বাপ্ বাপ বাপ।
ছুঁলে পরে বমি উঠে গায়ে ধরে কাঁপ।।
মিছে দেখি সাজসজ্জা সব ফক্কিকার।
কেবল বাবুর বাগান মাত্র সার।।
সকলি হিন্দুর দেবতা ভিতরেতে খড়।
কার্য্য নাহি জল খেয়ে পুকুরেতে গড়।।

ঘোষজা মহাশয় পুষ্করণীর জল দেখে এইরূপে আক্ষেপ করত, উদ্যানের এ দিগ ও দিগ চারিদিগ দৃষ্টি করত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন। কোন দুরাত্মা পাপি এ উদ্যান করেছে বেটার কেবল বাহিরে সাজসজ্জাই সার পুকুরের জল দেখি চৌদ্দ বৎসরের পচা মলের চেয়েও দুর্গন্ধ, রাম রাম! এ বেটার মতন চামারত আর কখনও শুনি নাই ও দেখি নাই।

এময় সময়ে পুষ্কণীর দক্ষিণ দিক্ হইতে আগে এক জন পেয়াদা পশ্চাৎ এক জন অর্দ্ধ বয়স্ক বাবু দুসমন চেহারার ন্যায় আসিতেছে দেখিয়া ঘোষজার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল, ভাবিলেন এ বেটাকে যে দেখ্ছি যদি শুনতে পেয়ে থাকে তবে ত মেরেই দফাটা সার্বে যা থাকে কপালে এই বেলা এক বার ভগবানের নামটা করে নি এই ভেবে এক গৌরভক্তির গান আরম্ভ করিলেন।

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধনং।
জয় নিত্যানন্দ ভানু সুত্যং ভব ভয় নিবারণং।।

এমন সময়ে সেই পেয়াদা পুকুরের নিকটে আসিয়া ও আদমি২ ক্যা চিল্তা দেখ্তা নেই দেয়ান মশায় যাতা, তখন ঘোষজা তাহার কথা শুনে. (চমকিয়া) কি পেয়াদা সাহেব কি তোম্ বোল্তা হ্যায় হাম তোমরা পুকুরমে হাগ্তা নেই, হাম তো হরি নাম কত্তা হ্যায়।

পেয়াদা। হাম হরি নাম টরি নাম সম্জাতা নেই দেয়ানজী জাতা তোম চিলাও মৎ।

গোপাল ঘোষ। দেওয়ান মহাশয় জাতা হ্যায় উনকি হরিনাম শুনে ক্ষেপাহুয়া স্বগত হবেনি তো তাহা পুকুরেই টের পেয়েছি।

পেয়াদা। কি বোল্তা হ্যায় রে।

গোপাল। এইবার শালা মাল্যেরে, পেয়াদা সাহেব তোমার গাঁজা টাজা চলে।

পেয়াদা। ক্যায়া তোম্রা পাস গাঁজা হ্যায়? বোল্না হাম দেগা।

গোপাল। হামরা পাস গাঁজা হ্যায় তোম্ এক জেরা সুখা দেও।

পেয়াদা। সুখা চাই এই লেও, গোপাল সুখা পেয়ে আচ্ছা করে গাঁজা তৈয়ার করে কল্কেতে আগুন দিয়ে এই লেও পেয়াদা সাহেব পিও।

পেয়াদা। আচ্ছি বোম বদ্দিনাথ এই বলে খুব সে দম মারিয়া পিও ঘোষজা মহাশয় পিও পিও।

গোপাল। হাঁ পেয়াদা সাহেব পিতা হ্যায় এই বলো কয়ে এক দম মেরে, পেয়াদা সাহেব ঐ পুকুর ধারমে একঠো হাব্লি কিস্কা ও তো হাবলি বড়া উচা হ্যায় জী।

পেয়াদা। কর্ত্তা মহারাজকো বৈঠকখানা হ্যায়।

গোপাল। কি বোলতা কর্ত্তা মহারাজকো পাইখানা হ্যায়।

পেয়াদা। আরে তোম্ কাহ্যাকো উল্লুক হ্যায় কুচ্ সমজাতা নেই কর্ত্তাকা বৈঠকখানা হ্যায়।

গোপাল। হাঁ এস্‌বকত সমজাতা হ্যায় মহারাজাকো বৈঠকখানা হ্যায় ওখান মে মোকাম কিয়া।

পেয়াদা। হাঁ।

এমন সময়ে বৈঠকখানার পশ্চিমদিকে বারান্ডায় কর্ত্তা মহারাজ দাঁড়াইলেন, ঘোষজা তাহাকে দৃষ্টি করত ও পেয়াদা সাহেব ধর ধর ঐ খেলে ঐ খেলে বারান্ডায় বাঘ বেরিয়েছে, তোমার পায়ে পড়ি ধর খেলে।

পেয়াদা। ও ক্যা তোমরা মাফিক পাগ্‌লা তো দুনিয়ামে দেখ্‌তা নেই ও ক্যা বাঘ হ্যায় না কর্ত্তা মহারাজ খাড়া হ্যায়।

গোপাল। তাই বলি উনি তোমাদের কর্ত্তা মহারাজ উহার মুখ দেখে মানুষ বলে জ্ঞান হয় না বাবা যেন কেদো বাঘ পেয়াদা সাহেব তোমরা রাজা কো ইজের পরা কেসাস্তে আউর মাথামে পাগ হ্যায়।

পেয়াদা। বড়া আদমি আপনা কো খুসি যে পরতা হ্যায়।

গোপাল। তোমার রাজা কো নাম কেয়া হ্যায়।

পেয়াদা। ওসকো নাম আনন্দকুমার।

(দুইজন মাতালের প্রবেশ।)

রাগিনী সিন্ধু। তাল যৎ।

ওগো শ্যামা কে তোমারে বলে গো কালী।
আমার কেন মদের বোতল হয়ে গেল খালি।।
আমার মুড়ি কড়াই চাট্‌নী যত, পড়ে কাঁদে
অবিরত, এখন বোতলেতে আবির্ভূত হও মুণ্ডমালী।।

হরি মাতাল। বাবা কে তুমি বাবা এখানে বসে রয়েছ বল্‌না শ্যালা।

শ্রীরাম মাতাল। দূর শালা আমাকে চিনিস্‌নি হামি তোর বাবা না শ্যালা কেমন দাদা।

শ্রীরাম। ভাই দাদা তুই একটা গান গানা ভাই যেন আমার মতন শ্যামা বিষয়।

হরি। গান শুন্‌বি শ্যালা তবে শোন।

রাগিনী সুরট। তাল পোস্তা।

ষড়ানন ভাই তোর কেন নবাবি এত।
তোর মা দশভুজা পেটের জ্বালায় পাঠা খেত।।
তোর বাপ ভিক্ষারি মা নেঙ্গটা, হাতে তোর
তীর কামটা, শিখিপরে আরোহিত। ঐ
তোর ভাই গণেশ দাদা হাতি মুখ ইঁদুর
পোঁদা, কলা বউকে বিয়ে করে তারে নাহি
অন্ন দিত।।

(বলিতে২ খানায় পতন।)

গোপাল। একি হেরি হরি২, মাতালের গতি হেরি,
অবাক হইনু দেখে সব।
এই যত ফক্কিকারি, মদ খাওয়া ঝকমারি,
একি কাণ্ডে হেরি অসম্ভব।।
মদ খেয়ে সকলেতে, হেরিতেছে বাগানেতে,
নৃত্য করি বেড়ায় সক্কলে।
নাহি কিছু জ্ঞানোদয়, অজ্ঞান হইয়া রয়,
যারে তারে কটু বাক্য বলে।।

গোপাল। পেয়াদা সাহেব ও কোন আদমি চিল্‌তা হ্যায় আবার গীত গাওতা হ্যায়।

পেয়াদা। ও আদমিত মাতাল হুয়া তোমবি মদয়দ খাও।

গোপাল। না পেয়াদা সাহেব মদ খাতা নেই।

এমন সময় সেই মাতাল দুজন।
ঘোষজার সন্নিকটে করে আগমন।।
বলে বাবা কে তুমি তোমার বাড়ি কোথা।

কি কারণে এখানেতে কহ সত্য কথা।।
বলিতে বলিতে কথা টলিয়া তখন।
তাহার উপরে গিয়া পড়িল দুজন।।
মাতাল দেখিয়া তবে মনে পায় ভয়।
পাছু পানে হটিলেন ঘোষজা মহাশয়।।
মাতাল দেখিয়া এক কুকুর শয়নে।
দ্রুত গিয়া তাহারে ধরিল দুই জনে।।
হাত বুলাইয়া নাকে দেখিয়া তখন।
কুকুরের প্রতি সেই বলিল বচন।।
ছিছি ওলো মেয়ে মানুষ নত নাই নাকে।
উলঙ্গ হইয়া কেন লজ্জা নাই তোকে।।
এত বলি কুম্ব খায় কুকুর বদন।
কুকুর যে কামড়াইল তাহারে তখন।।
দর দর পড়ে রক্ত বলে বাপ বাপ।
তুই বেটী কামরাইলি কেন গয়ার পাপ।।
দূর দূর বলি তারে তাড়াইয়া দিল।
টলিতেং তখন ঘরেতে চলিল।।

(গোপাল ঘোষের প্রস্থান)

গোপাল। (স্বগত) হায়! এদের তো এই ব্যবহার দেখিলাম এক্ষণে বৈঠকখানাতে গিয়া কর্ত্তার কি রূপ ব্যবহার দেখি এই ভাবিয়া বৈঠকখানায় গমন করিয়া দেখিলেন, দেওয়ান মহাশয় মস্ত এক খান হুঁকায় নল লাগিয়ে ভড়র ভড়র করে তামাক টানছেন এবং নিচে ঘরে মুরগীর এন্ডা রন্ধন হোচ্ছে, কাবাব কালিয়ে দম ইত্যাদি খানার উদ্‌যোগ হইতেছে, ঘোষজা তখন এক ঘর হইতে অন্য এক ঘরে প্রবেশ করিলেন, সেই ঘরেতে দুইটি মানুষের চক্ষু দিয়ে বারি নির্গত হইতেছে ঠিক্ যেন ক্রন্দন

ঘোষজা ইহা দেখি পরে, কহে কথা দুজনারে,
কেন ভাই করিয়া এমন।
বল বল বিবরণ, শুনিতে বাসনা মন,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।।
শুনি এক জন কয়, বল্‌তে ভাই লজ্জা হয়,
গুলি খাবার পয়সা ঘরে নাই।
মোরা ভাই দুইজন, তাহাতে করি রোদন,
চারি পয়সা কোথা গেলে পাই।।
রহিতে না পারি বসে, চক্ষু দিয়ে জল এসে,
আই ঢাই করিতেছে প্রাণ।
যদি কেহ দয়া করে, চারি পয়সা দেয় মোরে,
হই তার নফর সমান।।
গোপাল এতেক শুনি, দয়া করিয়া অমনি,
চারি পয়সা দিল দুইজনে।
আনন্দিত হয়ে মন, আশীর্ব্বাদ করি তখন,
দোহে চলে আড্‌ডার ভবনে।।
গোপালে না ছেড়ে দিল, সংহতি করিয়া নিল,
আড্‌ডায় হইল উপনীত।
দেখে গুলি খোর কত, সারি২ বসে যত,
দেখিয়া গোপাল চমকিত।।
কার পেট ঢাকাই জ্বালা, রোগা২ হাত গুলা,
কালি পড়া কাহার চক্ষেতে।
কলসীকানায় হুঁক দিয়ে, নল মেরু খাটাইয়ে
ভড়র ভড়র টানে সকলেতে।।
হলা বলে গদাধরে, কও ভাই সত্য করে,
ক পুরিয়া খাও দিনান্তরে।
সে জন বলে রাগিয়া, অনায়াসে কুড়ি পুরিয়া,

পাই যদি খাই একে বারে।।
শুনি কহে আর জন, তোর মিথ্যা এ বচন,
কোন শালা কুড়ি পুরিয়া খায়।
দশ পুরিয়া খেলে পরে পোঁদ দিয়ে রক্ত ঝরে,
গুলি খাওয়া এ বিষম দায়।।
পুনঃ সেই জন কয়, অবশ্য খাব নিশ্চয়,
দশ তঙ্কা বাজি এসো করি।
যদি না খাইতে পারি, বাজি তবে হবে হারি,
শুনি গোপাল বলে হরি২।।
সব বেটারা দেখি কুক্কুর, নেশাখুরি বালাই দুর,
কেন বিধি গঠিল সবারে।
বেটাদের পোঁদে ট্যানা, কোরে বসেছে বাবু আনা,
চুঁচুড়ার সঙ্গ হেরি সবা কারে।।

(মাধব গুলি খোরের প্রবেশ)

রাগিনী হাড়ি কাট। তাল খাঁড়া।
গুলিখোরের গীত।

আয় না ভাই কে কে তোরা গুলির আড্‌ডাতে যাবি।
একটা ছিটে টানলে পরে চতুর্ব্বর্গের ফল পাবি।।
দুই পুরিয়া খেলে পরে, নাহি যায় সে যম ঘরে।
কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ নগরে লয়ে যায় তারে আব্বি।।
তোড় জোড় মেরু তেরু জুগিয়ে দেন সেই কল্পতরু।
ভবে পার কর্‌বেন গুরু, পারে বসে খাবি খাবি।।
আহা বেশ।

হরিদাস। বাবা বেশ ভাই বেশ গীত গাচ্ছ আহা শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হলো আচ্ছা একটা গাঁজা খুরি গীত গাও দেখি।

মাধব। আচ্ছা তবে একটা গাঁজার গীত শোন।

রাগিনী ফোঁস। তাল কি চক্র।

চতুর্বর্গের ফল পাবি মন গাঁজা খেলে।

মার দম ও বোম কেদার বোলে।।

আমার হুঁকোর খোল, ব্রহ্মার কুমণ্ডল, বিষ্ণু দিলেন বাঁশী নল্চে বলে। আবার, তাতে দিয়ে ফুক, ভুডুক ভুডুক, টানলে পরে যায় স্বর্গে চলে।। তাহা যেজন না খায়, পশু সম প্রায়, তার জন্ম আর নাহি মোলে। সে জন গোহাবড়ে পড়ে, শুকুনিতে ছেঁড়ে, প্রাণ যায় জোলে জোলে।।

(গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

এই মত গুলির আড্ডাতে কতজন।
গুলির নেশাতে মত্ত হইয়া তখন।।
কেহ কেহ গীত গায় কুক্কুট রাগেতে।
কেহ গাত্র বাজাইয়া নাচে আনন্দেতে।।
বলে কিবা মজাদার মরি হায় হায়।
কি উত্তম গীত, শ্রবণ করালি আমায়।।
এইরূপ গোপাল ঘোষ দেখিছে স্বপন।
আচম্বিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন।।
গোপাল উঠিল তবে স্মরি রাম রাম।
বলে নিদ্রা যোগে কি সপন দেখিলাম।।
হেন কুসপন আমি কভু নাহি হেরি।
স্বপ্নে কোথা গিয়াছিনু হরি হরি হরি।।
এত বলি চলিল যথায় বন্ধুগণ।
কহিল সকল কথা সপন কথন।।
শুনিয়া সকল লোক হাসিয়া উঠিল।
তথা হৈতে সকলেতে প্রস্থান করিল।।
যাইতে যাইতে পথে দেখে আর বার।
একজন মাতাল বিশ্রী কদাকার।।

পথেতে চলিয়া যায় টলিতে টলিতে।
নেশাতে হইয়া মত্ত ঢলিতে ঢলিতে।।
মুড়ি কড়াই দুটি যায় চিবাতে চিবাতে।
আপনা আপনি চলে বকিতে বকিতে।।
হেনকালে ধাক্কা আসি দিল একজন।
মদের নেশাতে অমনি খানায় পতন।।
দেখি চৌকিদার তবে হাতে করি ছড়ি।
সপ্ সপ্ করে দিল পোঁদে তিন বাড়ি।।
অমনি লইয়া তারে ঝোলাতে পুরিল।
তথা হৈতে মাতালেরে পুলিসে থুইল।।
এই সব রঙ্গ দেখি জনেক কামিনী।
সঙ্গিনীরে কহে কথা হাসিয়া আপনি।।

(নিতম্বিনীর প্রবেশ।)

নিতম্বিনী। কোথা লো হরকালী বলি কি হয় ভাই এই রাস্তাতে এক বড় মজা দেখে এলুম একটা মাতাল গান কচ্ছেল কর্ত্তে কর্ত্তে খানায় অমনি টোলে পড়ে গেল, তারপর একটা পাহারাওলা তার পোঁদে তিন ঘা লাঠি দিয়ে অম্‌নি ঝোলাতে পুরে পুলিসে নে গেল, তাই বলি বোন, নেশাখুরি কি ঝকমারি, আমি ভাই খাই টাইনি এক প্রকার ভাল আছি।

হরকালী। হাঁ বাবা মদের গুণ তুমি কি জান একবার খেলে তুমি আর ভুল্‌তে পার বাবা এতে পুত্র শোক নিবারণ হয় তাহার প্রমাণ শুন।

পূর্ব্বেতে আছিল হেথা একই ব্রাহ্মণ।
বড় আদরের এক হইল নন্দন।।
লিখিতে পড়িতে তারে দিল পাঠশালে।
লুকাইয়া থাকিত চাসার বাণ শালে।।
কত দিনে হৈল পুত্র নেশায় তৈয়ারি।

যুটিল সঙ্গেতে তার আর ইয়ার চারি।।
শুঁড়ির দোকানে নিত্য করিয়া গমন।
পাঁট পাঁট মদ খেতো এক একজন।।
ধেনো মদ খেয়ে তারা বকিত বিস্তর।
পথে ঘাটে ভ্রমণ করিত নিরন্তর।।
গৃহস্থের মেয়ে ছেলে ভয় পায়ে তবে।
শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে জানাইত সবে।।
পুত্রের গুণাগুণ সব ব্রাহ্মণেরে কয়।
শুনিয়াত সে ব্রাহ্মণ দুখিত হৃদয়।।
পুত্রেরে কহিল মদ ত্যাজ বাছা ধন।
সহ্যতা করিতে নারি পরের বচন।।
শুনিয়া পিতারে কহে ব্রাহ্মণ কুমার।
তুমি মদ খাও যদি ছাড়ি এইবার।।
পুত্রের বচনে তবে ভাবিল ব্রাহ্মণ।
একবার খেলে যদি ছাড়য়ে নন্দন।।
অবশ্য খাইব ইহা সন্ধ নাহি তার।
এতেক ভাবিয়া পুত্রে কহে পুনর্ব্বার।।
দেহ মদ খাইবারে শুনে বাছাধন।
একবার খেলে মদ ছাড়িবে এখন।।
এতেক বলিয়া গ্লাস মুখেতে ঢালিল।
মদের নেশাতে দ্বিজ মোহিত হইল।।
তার পরদিন শিশু কহিল পিতারে।
মদ ছাড়ি অনুমতি করহ আমারে।।
পুত্রের শুনিয়া কথা পিতা কহে তার।
তুমি ছাড় মদ ছাড়া না হবে আমার।।
তাই বলি মদের গুণ কি জানিবি ছুঁড়ী।
মদ খেয়ে খেয়ে আমি হইলাম বুড়ী।।

মাতালের দুর্গতি দেখিয়া বন্ধুগণ।
পরস্পর বলাবলি করিছে তখন।।
আগে যাহা আমাদের গতি হয়ে ছিল।
ইহাদের সেই দশা বুঝিবা ঘটিল।।
মদ্যপান ঝকমারি বুঝিনু এখন।
আর না কখন ভাই করিব ভক্ষণ।।

বন্ধুগণ। ভাই তবে কি নেশা ভাল আমাকে উপদেশ দেও।

গোপাল। নেশা মাত্রেই ভাল নয় তাহার প্রমাণ বলি শুন।
গাঁজা যদি খায় তবে লক্ষ্মী তার ছাড়ে।
সিদ্ধি পান করিলে তাহার বুদ্ধি বাড়ে।।
চৌরাশি বাত হয় চরশ পানেতে।
গুলি খেয়ে হাড় কালি জানিবে মনেতে।।
গুডুকে গম্ভির বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।
চণ্ডু পানে ঘুঘু চড়ে তাহার আলয়।।
আফিম পানেতে মরে নিতান্ত সে জন।
নেশাখুরি কি ঝকমারি কহে জ্ঞানিগণ।।

শ্যামলাল। নেশা করবে না ত কিছুই করবে না খালি
বোসে২ গাহনা বাজনা করবে।

ইহা বলি বন্ধুগণ, যবে চলে নিকেতন,
আলয়েতে উপনীত হয়।
যথা সবার আলয়, উপনীত সবে হয়,
আনন্দিত হইয়া সদয়।।

(সকলের প্রস্থান)

নাটক সমাপ্ত।

কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

শ্রীআনন্দলাল শীলের
অনুমত্যানুসারে।

কলিকাতা।

হিন্দু প্রেস।
নং ৯২ আহিরীটোলা

শকাব্দা: ১৭৮৫।
মূল্য ।১০ আনা মাত্র।

[1863]

কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে

(রায় মোশায়ের সদর বাটী)

(রায় মোশায় এবং ঘটক ঘোষালের প্রবেশ)

রায়। (ঘটক ঘোষালকে দূর হৈতে দেখে।)

আসুন! আসুন! আজি কিবা শুভক্ষণ।

অকস্মাৎ শ্রীচরণ হইল দর্শন।।

তবে, ঘোষাল মোশায়! এ যেন মেঘ চাইতে এক কালে জল এসেছে।

ঘটক। বাবু! "মেঘ চাইতে জল এসেচে" এর ভাব বুঝতে পারিনে? বুঝায়ে বল তবে ত জবাব কোত্তে পারি?

রায়। মোশায়! এ কথার আর অন্য কোন ভাব নেই, আপনার সঙ্গে দেখা হোলে একটা কোন বিষয় বোল্‌বো২ মনে কোচ্‌ছিলেম, এমন সময় আপুনি এসে পোড়েচেন।

ঘটক। তবে খুব ভাল হোয়েছে, বলনা কেন?

রায়। মোশায়! বলি কি মেয়েটী তো খুব হোয়ে উঠেচে, তারই একটী পাত্রের কথা আর কি?

ঘটক। একটী উত্তম পাত্র আছে, বয়েস অল্প, দেখ্‌তেও বেশ এবং বিষয়ও আছে লেখাপড়াও খুব ভাল জানে। ওকালতি শিখ্‌চে আর দু-বচর বাদে পাশ হোয়ে উকিল হবে। এদিকে কুলিনের ছেলে তবে ছিরিত্রিতে পোষ্যপুত্র নিয়েছে।

রায়। তবে ত কুল ভারী আছে?

কুলতো গিয়েছে পোচে কিবা আছে তায়।

আঁটিটা পর্য্যন্ত পোকা ধরিয়াছে যায়।।

আর আমার কুলেরই বা দরকার কি? কুল তো চাইনে, রুধির নে বোঝা।

রায়। ওসকল কথা মুখে এনো নাক আর।

আমরা ধারিনে কোন কৌলিন্যের ধার।।
লেখাপড়া বুঝে কিবা আছে প্রয়োজন।
বেশী পণ যেবা দিবে সুপাত্র সে জন।।
পণ যে না দিতে চায় আমাদের ঘরে।
শতমুখী বার কোরে রাখি তার তরে।।

ঘটক। তা আমি জানি গো বাবু! পাত্রটীর কম বয়েস বোলে পণ দিতে চায় না কিন্তু ছেলেটীর পূর্ব্বপক্ষের বাপ এবং এ পক্ষের মা উভয়ে সম্মত হইয়া আমাকে বোলেচেন যে যদ্যপি মেয়েটী বড় এবং দেখতে ভাল হয়, তা হোলে তাঁহারা গোপনে২ সদাবধি টাকা পর্য্যন্ত পণ দিবেন।

রায়। (হো হো কোরে হেসে উঠে) তবেই হোয়েছে আর কি?
কোন্ কালে বল দেখি আমাদের ঘরে।
দুশো এক শোতে মেয়ে বিয়ে দেছে বরে।।

ঘোষাল মোশায়! আমি যখন বিয়ে কোরেছিলেম তাতে তোমার বাপ ঘটক ছিল। আমার শ্বশুর ৪৪৪ টাকা পণ ধার্য্য কোরে শেষে বিয়ের সময় ছানলাতলায় আমাকে বসাইয়া ৬৬ টাকা আবার বেশী ধোরে ৫০০ টাকা ভর্ত্তি করে নিয়েছিলেন। সেও এমন এগারো বছরের পদ্মফুলের মতন মেয়ে হোলেও দুঃখ ছিল না। বোল্‌তে গেলে ব্রাহ্মণীর নিন্দা করা হয়, তখন তাঁর বয়েস সাত বচর, সেই সবে সামনের দুটো দুদে দাঁত ভেঙ্গেচে। গড়নও এমন ছেয়ালো নয়, কেমন একতরো প্যাঁকাটির মতন, এক ধাঁজার গড়ন, না হয় নাক মুখ ও চোকই ভাল হোক, তাও নয়। আমি দেখেছি, নাকটা খাঁদা হোলেই অমনি যেন কপালটা পীরের বেদীর মতন ঢেপী হোয়েছে। ব্রাহ্মণীর তাতে আবার দু নাক দিয়ে শিক্‌নী বেরিয়ে আস্‌তো, তাও ফেলতেন না, অমনি মুখটা সিঁটকে টেনে নিতেন। রং ঠিক ধান সিদ্ধর হাঁড়ির তলার মতন, ভাগ্যে আপুনি দেখতে একটু ভাল ছিলুম, তাই তো এমন মেয়ে হোলো। এখন বিবাহের একটা দিন পরমেশ্বর বাঁচিয়ে রাখলে ব্রাহ্মণীর সে পাঁচশো টাকা তো তুলে নেবো তারপর যেশী হয় সে ভাল। সদাবধি টাকায় আর কি মেয়ে পাওয়া যায়? আজ কাল একটা আঁতুড়ে মেয়ের দর কত। আঁতুর খরচ, আর

এইযে এগারো বচর খাওয়ানো গিয়েছে, তাতে কি কম করচ হোয়েছে? লোকে আমাদের পাঁটী বেচা বামুন বলে, কিন্তু তলিয়ে বুঝে না, যে কত ধানে কত চাল হয়। আপনারা বে কোর্‌বো টাকা দিয়ে, আবার মেয়ের বিয়েও যদি টাকা দে দিব, তবে আমাদের দশা কি হবে।

ঘটক। মোশায়! পাত্র ভাল হোলে একশো ডেরশো টাকায় বেশ ভাল এবং বড় মেয়ে পাওয়া যায়।

রায়। মেয়ে ভাল পাওয়া যায় সত্য, ওদিকে জেতের বিষয়ে অনেকের ওকর্ম্ম হোয়ে যায়। মাঝে মাঝে কেমন হয় তাতো জানেন, কেউবা অধিকারির মেয়ে বিয়ে কোরে এসে সমন্বয় কোরে জেতে উট্‌চেন, কেউবা বৈষ্ণবির মেয়ে বিয়ে কোরে জন্মের মত ঠেলা থাকচেন। মোশায়! আমাদের ঘরের একটী মেয়ে পাবার তবে কত লোক মুক্‌য়ে থাকে, কত লোক আগামী দুশো একশো টাকা বায়না দে রাখে, আমরা ভরদ্বাজী রায়, আমাদের ঘরের মেয়েরা প্রায় মা গোঁসাই হয় কেমন সুখে থাকে।

ঘটক। এও খুব বড় ঘর; এখন যদি দশ টাকা কম পাও কিন্তু পরে খুব দশ টাকা পাবে।

রায়। (হো হো হো কোরে হেসে উঠে)
যতক্ষণ হাতে আছে কর কি করিবে।
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরে নির্বোধে জানিবে।।

ঘোষাল মোশায়! পরে দশ টাকা পাবার আশায় কেউ কি হাতের বিষয় ছেড়ে দ্যায়? যাদের শরীরে বুদ্ধি আছে তারা কি একাজ করে? আপুনি বিবেচনা করুন, বিবাহের পরে যদি আমার মেয়েটীর কোন ভাল মন্দ হয়, কিম্বা জামাইটীই যদি মোরে যায় তা হোলে কি পরে আমাকে আর তাঁরা দশ টাকা দেবেন।

(ঘটক ঘোষাল নিরব)

(ঘটক বড়ালের প্রবেশ)

রায়। (বড়ালকে দূর হইতে দেখে) ইস্‌ বড়াল মোশায় যে, কি মনে কোরে, এ পথটী কি মনে আছে?

বড়াল। আপনার নিকটে একটা শুভ বিষয়ের জন্য আসা হোলো এখন প্রজাপতি এ বিষয়ে বোসলেই পরম সুখের বিষয়।

রায়। এদিকে ভাল কোরে মধু দিলেই প্রজাপতি বোসবে।

বড়াল। মেয়েটী ভাল এবং একটু বড় হোলে মধুর তরে আটকাবে না, খুব উচু ঘর, জমীদার লোক।

রায়। তা সর্ব্বাংশে উত্তম, আমাদের ঘরের মেয়ে একটু ডাশিয়ে না উঠলে আমরা বেচিনে। আমরা তো হাঁড়ী চড়িয়ে থাকিনে যে গো ডিম বেচ্‌বো?

বড়াল। মেয়েটীকে একবার দেখতে পাওয়া যায় না?

রায়। তার আটক কি? (ছোট ভেয়ের মুখের দিকে চেয়ে) ভায়া একবার অমুককে আনো তো।

(কন্যাকে আনয়ন)

রায়। কেমন মোশায়! পচন্দ কি হবে।

বড়াল। হাঁ এক রকম চলনসই বটে, নিন্দের নয়, এখন এদিকে হোলেই হয়।

রায়। দু হাজার আড়াই হাজার বলা মিথ্যা, একখানা পুরোপুরির কমে হবে না।

(আটশো টাকা পণ ধার্য্য হোলো)

(বর বামুন পরামাণিক এবং দুইজন বরযাত্র মাত্র)

রায়। মোশায়! পাত্রটী কেমন?

বড়াল। বোলতে কি? শেষে গোল কিছু নয়, একটু বয়েস হোয়েচে, ও দোজবোরে; আর কোন দোষ নাই, এদিকে গুড়ুক তামাক ছিলিমটী পর্য্যন্ত টানেন না।

রায়। সে যাই হোক্ তাতে আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই, রুধির নে বোঝা।

বড়াল। (মনে মনে) তবু ভাল আমার তো দোষ এইখানেই কাটানো হোলো, বোধ করেছিলেম যে বিবাহের সময়ে বা মার খেতে হবে। (প্রকাশ্যে) মোশায়! আমি তবে অদ্য আসি, আজ কালের মধ্যে যা হয় একটা শেষ কোত্তে হবে।

(ঘটকের প্রস্থান)

(বরের বাটী)

বর। (ঘটককে দূর হইতে দেখে) আসুন! আসুন!

(ঘটক বড়ালের প্রবেশ)

বর। (বড়ালের মুখের দিকে চেয়ে) জোগাড় কি কিছু কোত্তে পেরেছো?

বড়াল। মোশায়! যে মেয়ে ঠিক কোরে এসেছি, তার কথাই নাই, মেয়ের মতন মেয়ে, এগারো বচর পেরিয়ে গেচে, গড়নও খুব ছেয়ালো, দেখতেও তেমনি গোচ। মোশায়! বোধ কচ্চি আপনার স্ত্রীভাগ্যটী ভাল।

বর। এদিকের বিষয় কি কিছু চুকেছে?

বড়াল। একখানা বোলে ছিলো কষাকষি কোরে আটশো করা গেছে।

বর। মেয়ে যদি বড় এবং খুব ভাল হয়, তাতে আটকাবে না বড় হোলে দুশো জেয়াদা গেলেও এ সময় কাতর নহি। ব্রাহ্মণী মোরে যাওয়া পর্য্যন্ত কি কম কষ্ট পাচ্চি? স্ত্রী যার মোর্‌বে, যেন যৌবন অবস্থায় মরে। বুড়োমানুষের স্ত্রী মরা বড় দায় হে? আমার এক একদিন যাচ্চে বোধ কচ্চি যেন এক এক বচর যাচ্চে। এ সময়ে যদ্যপি বিবাহ না করি, তা হোলে শেষে ভারি কষ্ট পেতে হবে। দেখচো তো ছেলে চারিটী যেন চার ইয়ার। বড় ছেলেটা কি ছাই খেতে শিখেচে, দিবারাত্রি পিয়ারা পাতা পোড়াচ্চে, আর আফিং জাল দিচ্চে, বেটা যেন ময়রার ছেলে। মাথামুণ্ডু গুলি তয়েরি কোরে একটা কলসির টানাতে একটা ডাবা হুকো, তার মাথায় একটা ভাঙা কোল্‌কে বসায়ে বড় একটা নল দে টানে, খানিকটে বাদে পট কোরে একটা শব্দ; তাতে বাছার শরীর যে কি হোয়েছে তার কথাই নাই। হাত পা গুণো ছিনে ছিনে, পেটটা মোটা কুজো, জবড় জং এক রকম সংঙের মতন। মেজটী শুন্‌তে পাই নেশা টেশা বড় করে না; গুড়ুক তামাক সার, কখন২ দু এক টান চরস টানে; কিন্তু পোঁদে এমনি একটী রাঁড় আছে, কি রাত কি দিন সেখানেই পোড়ে আছে, হয়ত কোনদিন বাটীতে খেতে এলো নয় তো সেখানেই ভাত মাল্লেন। সেজোটীর গাঁজার আড্ডায় দুর্গ টুনটুনী নাম, একশো ছিলিম গাঁজা খেতে পারে। ছোটটী এমন দিন নদ্দমায় পড়ে

না যে সে দিনই নয়। স্ত্রীর আমার কোন দোষ ছিল না, তবে তার গর্ভ হোতে কেন এমত রত্ন বেরুলো তা বোলতে পারি না। বৌগুলিও যেমন হাঁড়ি তার তেমনি সরার মতন। সর্বদাই লোকের নিন্দে নে আছেন, কারো ভাল শুনলেন তো অমনি বুক চড় চড় কোত্তে লাগলো। ছেলেগুলি তো ভারী মানুষের মতন, বউগুণো আবার তাদের কাছে নাগায়, "যে বুড়ো আমাদিগকে দেখে নজরা মারে" এও কি কতা হ্যা? ঘরের কথা বারকোত্তে নাই কিন্তু না বোল্লেও মনের ভিতরটা গুমরে২ ওঠে। তাই মনে মনে কল্লেম যে এই বউ বেটারা আবার আমাকে অসময়ে দেখবে? যে কাল পোড়েছে কেউ কারো নয়; যে যার আপনার আপনার। আমি দেখেছি, কোথাও থেকে যদি একটা ভাল মন্দ আবার কোন জিনিস এসে, যাঁর হাতে পোড়লো কিম্বা যাকে যে দিলে, এমন কাল, যে ঘরের কারো হাতে একটু তুলে দ্যায় না, যে যার মাগ ভাতার পুত্র কন্যাতে অম্লানবদনে ভক্ষণ করিতে থাকেন। বিয়ারাম হোলে কেউ কাহারো সংবাদ নেয় না। বড়াল মোশায়! আমি এক্ষণে যদ্যপি বিবাহ না করি, শেষে আমাকে গুয়ে মুঁয়ে পোড়ে থাকতে হবে, কেউ তখন জিজ্ঞাসাও কোর্বে না।

বড়াল। তা আর বোল্‌তে? আপনি খুব ভাল বুঝেচেন, গৃহে থাকতে হোলেই গৃহিণীর প্রয়োজন হয়। আর যে কাল পোড়েছে তাতে বৌমারা যে কথা বলেন, আপুনি বিবাহ না কোল্লে অনেকেই বিশ্বাস কোরবে, এক্ষণেও বড় আশ্চর্য্য নয়। আপ্‌নি শোনেন নি কি? কে একজন বড় মানুষ এই সকল ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহাকে এ বিষয়ের কেহ কোন কথা কইলে জবাব কোত্তো "গাচ পুতেচি ফল খাবো না" তাই বলি মোশায়! ওবিষয় চোলেচে, এখন মিছি মিছি রটালেও অনেকে সত্য বোধ কোরবে।

বর। তাই তো বড়াল মোশায়! দিন কটা কাটিয়ে যেতে পাল্লে যে হয়? দিন২ দেখে২ অবাক হোয়ে যাচ্ছি। তাতে আমার যে ঘর "এক ভস্ম আর ছারঃ দোষ গুণ কবতার" সকল ছেলেগুলিরই ইচ্ছা, আমি বর্তমান

থাকতে তারাই কর্তৃত্ব করে, আমি অন্নদাসের মতন তাদের একমুটো ভাতের প্রত্যাসি হোয়ে থাকি। তা করিনে বোলে ছেলেরা এবং বৌমারা আমার উপর ভারি চটা। মোশায়! আমিও তা গ্রহণ করিনে। চটা হোলো তো বোয়েই গেলো, কারো তো প্রত্যাসি নই, যে ভয় হবে। বিয়ে কোরবো ও তার ভরণ পোষণের এবং তীর্থ ধর্ম্মের বেশ গুচিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট যা থাকবে, তাই ছেলেদের দোবো। বুড়ো বয়সে যে বিয়ে কচ্চি এতে কেউ নিন্দা কোত্তে পারবে না।

বড়াল। আপনি খুব বিবেচক মনুষ্য আপনার কেউ কি নিন্দা কোত্তে পারে?

বর। তবে আর দেরি কোরে নাহি প্রয়োজন।
অদ্যই তথায় বুঝি করহ গমন।।
নগ্ন পত্র করিতে যে কিছু তথা হবে।
অর্থ লয়ে যাও তূর্ণ সেরে এসো তবে।।

(বড়ালের প্রস্থান)

(রায় মোশায়ের সদর বাটী)

(রায় মোশায় এবং বড়াল মোশায়)

বড়াল। মোশায়! একখানা নগ্ন পত্র কোরে কিঞ্চিৎ টাকা গ্রহণ করুন।

রায়। (সহাস্য বদনে) তার বাধা কি আছে।

(রায় মোশায়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ)

(রায় মোশায়, স্ত্রীর দিকে চেয়ে)

রায়। আর কি দুঃখের নিশি রবে চিরকাল।
উদয় হোয়েছে প্রিয়ে সুখের সকাল।।

গৃহিণী। অকস্মাৎ দুঃখ দূর কি রূপে হইল।
খুলিয়ে বল না শুনি কি ফল ফলিল।।
নানা অমঙ্গল আমি দেখিতেছি মনে।
তোমার মঙ্গল হলো বলো কি কারণে।।

রায়। কন্যাটীর বিবাহের সম্বন্ধ হোয়েছে। আটশো টাকা পণ পাওয়া যাবে।

বিবাহের রাত্রে বর বামুন, পরামাণিক ও দুই জন বর যাত্র মাত্র আসিবেক। তাও চিঁড়ে দই দিয়ে সারবো। জোর পাঁচ সাত টাকা ব্যয় হবে। সাত আটশো টাকা হাতে পোড়লে এখানকার একজন গণনীয় মানুষ হবো।

গৃহিণী। পণ তো নিয়েচো শুযে কথা নাহি তার।
পাত্রটী কেমন আগে বল সমাচার।।

রায়। তা খুব ভাল, জমীদার লোক, ছি বলে নয়, ভাবিত্ব খুব আছে। এখনকার ছোকরা গোচের ছেলেরা যেমন গুলি গাঁজা ও মদটদ খেয়ে বোয়ে যায়, তাতে কোন দোষ নাই, তামাক ছিলিমটী পর্য্যন্ত খান না।

গৃহিণী। তোমার ও ছেঁদো কথা রেখে দাও তুলে।
বুড়ো তো হবে না বর তাই বল খুলে।।

রায়। বুড়ো হবে কেন? তবে একটু বয়েস হোয়েছে।

গৃহিণী। বুড়ো হলো আমি কিন্তু তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মোরবো?

রায়। তোমার মনের মতনও একটী পাত্র এসেছে, বড় মান্‌সের ছেলে। বয়স খুব কম, উকিলী শিখচে্।

গৃহিণী। তবে সেইটীকে কর না কেন?

রায়। এদিকে যে এগোয় না? জোর ডেরশো টাকা পোণ দিতে চায়।

গৃহিণী। প্রাণনাথ! এ পাটী বেচার টাকা থাকে না, আমার বাপ আমাকে তো ৫০০·টাকা পোণে বেচে ছিলেন কিন্তু তিনটী মাস না যেতে যেতেই যে দুঃখ সেই দুঃখ।

রায়। (মনে মনে) কি আপদ; বোলে যে ভারি গেরো কল্লুম (প্রকাশ্যে) সে উকিলী শিখ্‌চে, উকিলদিগের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক কোত্তে আছে। কোতা থেকে পাচিল ডিংঙে উত্তরাধিকারী হোয়ে যথা সর্ব্বস্ব নে বোসবে? হাউড়ি। উকিলকে কি আমি জামাই কোত্তে পারি?

গৃহিণী। তবে তুমি যা ভাল জান তাই কর, কিন্তু যেন পাত্রটী ভাল হয়, লোকে নিন্দে কোল্লে আমি কিন্তু অনত্ব কোরবো।

রায়। (মনে মনে) তাকে পারা যাবে। (প্রকাশ্যে) এ ভাল কথা।

(রায় মোশায়ের সদর বাটীতে গমন এবং নগ্ন পত্রাদি সমস্ত প্রস্তুত)

(বড়ালের প্রস্থান)

(বিবাহের রাত্রি)

(বর এবং কথিত বর যাত্রীদিগের প্রবেশ)

(গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রতিবাসিনী এবং পুরবাসিনী নারীগণের বর দর্শন)

প্রতিবাসিনী। ওলো! ওটা কি বর না বরের ঠাকুরদাদা তামাসা কোরে বরের বিছানায় টোপর মাথায় দে বোসলো।

২প্রতিবাসিনী। ঐ বর, লো এসময়ে কি কেউ তামাসা কোরে বরের বিছানায় বোসতে পারে?

প্রতি। তবেই চিত্তির আর কি? আমি তো ভাই এই বেলাই চল্লুম, বাসরে আর আসবো না, ওটা যে বুড়ো ও বুড়টার সঙ্গে বোসলে আমরা সুদ্ধ বুড়ো হোয়ে যাবো।

২প্রতি। ওলো! সকল শিয়ালের এক রা, তুই মনে কোরেচিশ্ আমিই কি আসবো?

কোনের মাতা। (বর দেখে উচ্চৈস্বরে কেঁদে ওঠে) ওরে বাবারে কি হোলেরে, আমাদের মিন্‌সে আমার মেয়ের হাতে পায়ে দড়ী বেঁধে জলে ফেলে দিচ্চে।

(লোকে লোকারণ্য)

বর। এমন শুভ সময়ে উনি কে ক্রন্দন কোরে উটলেন?

নিকটস্থ্ একটী বালক। বর! তোমার থাথুড়ী কাঁদথে।

বর। উনি কেন ক্রন্দন করিতেছেন।

বালক। তুমি বুড়ো বোলে কাঁদথেন।

বর। কান্না কেন, তুমি বলগে, আমি খধি খেতে পারি দধী খেতে পারি মর্ত্তমান রম্ভা খেতে পারি। কান্না কি? আমি তেমন বুড়ো নই।

(বাটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে দুজন মাতালের গলা ধরাধরি কোরে গমন)

১ম মাতাল। (দ্বিতীয় মাতালের প্রতি) এ বাটীতে এত গোল কিসের, চল বাবা দেখে আসা যাক্।

(উভয়ের প্রবেশ)

২য় মাতাল। ওহে বিয়ে বাড়ী, ঐ যে মাথায় টোপর পরা বুড়ো বরটা বোসে রয়েছে। বর তো বাবা যেন শিব, আমরা নন্দী ভৃঙ্গী দুটো চেলাও এসেছি, তবে আর আলো কেন?

(দ্বিতীয় মাতাল বরের সামনের দুটো আলো নিভিয়ে দিলে)

(দ্বিতীয় মাতালকে প্রহার)

২য় মাতাল। ও শিব! তোমার আর বারের বিয়ের সময় আমরা নন্দী ভৃঙ্গীতে আলো নিবিয়ে কত মজা কোরেছি। এবারের বিয়ে যে দক্ষযজ্ঞের উল্‌টো হোলো, আমরা মার খাচ্ছি তুমি কি একবার উটবে না?

(অপর দুইজন মাতালের প্রবেশ)

৩য় মাতাল। (চতুর্থ মাতালের দিকে চেয়ে) ওরে বাবা! এবেটা কোল্লে কি? আজ বাদে কাল মোরবে আবার একটা বিয়ে কোচ্চে।

৪র্থ মাতাল। ওহে বাবা যে।

৩য় মাতাল। উনি কি তোমার বাপ? তবে তো ভারি মজা হোলো, লোকে কথায় বলে তোমার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দোবো। আমি আজ কাযে তাই কল্লুম।

৪র্থ মাতাল। বাপের বিয়ে দেখতে নাই, চল বাবা! এখান থেকে যাওয়া যাক্।

৩য় মাতাল। তুমি একটু গা ঢাকা দে থাকো, আমাকে তোমার বাবা চেনেন না, আমি একটু মজা করি।

(৪র্থ মাতালের এক পাশে গমন)

৩য় মাতাল। (বরের কাছে এগিয়ে বরের দিকে চেয়ে) মোশায়! তোমার বয়স কত, লোকে কথায় বলে ষেটের বাছা, তুমি বাছা ষেটের কোটা অনেক দিন মাড়িয়ে এসোছো শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে। সোত্তোরের ঘর পবিত্র কোরে আসির ঘরে ঢুকেচো। এখন আসি বোলে যম যাত্রা কোরে থাকলেই ভালো হয়। জমাখরচে তোমার হিসাবের দুই মুখে মিলেচে। কাল খাতা খুল্লেই আগে তোমাকে তলব কোর্‌বেন।

এ বসয়ে তোমার কি একাজ করা আর সাজে যে এখন, বিয়ে কোচ্চে। এ তোমাকে পরমেশ্বর সাজা দিচ্চেন, বিয়ে কোরে কত সাজোয়ান পুরুষ তিতিব্রত হোচ্চে। কলির পুরুষাপেক্ষা মেয়েগুলো আটগুণ চতুরা। তুমি সেকেলে মানুষ তোমার এ গেরো আবার কেন ঘোটলো এবং পরামর্শই তোমাকে বা দিলে কে? তোমার সোনার চাঁদের মতন চার ছেলে রয়েচে, দ্বিতীয়তঃ বিষয় আছে, তুমি মোলে তারাই তোমার বিষয়ের উত্তরাধিকারীগণ হোয়ে তোমার শ্রাদ্ধ শান্তির ধুম লাগিয়ে দেবে? তুমি ছেলেদের একেবারে জন্মের জন্য মন চটিয়ে দিচ্চ? এ বয়সে একাজ কি ভাল কোচ্চো, এ আরতো ভোগ কোত্তে পারবে না? তুমি কি এমন ধারা দুটো একটা দেখেও শিখলে না যে তাদের কি দশা হোলো। ছি বাবা! তুমি মেজাজ বড় খারাপ কোরে দিলে, তোমার আর মুখ দেখতে নাই। এখনও বল্‌চি, ছেলেদের বুকের উপরে আর শূল পুতো না, যাও ঘরে ফিরে যাও।

বড়াল। যাও২ এখানে মাতলামো কত্তে হবে না।

৩য় মাতাল। তুমিই বুঝি ঘটক! খুঁজে২ আর বর পেলে না। শেষে নিমতলার ঘাট থেকে বুঝি এটাকে তুলে আন্‌লে? মোরে যাই আর কি? তোমাদিগের এমত ঘটকালির পায়ে দণ্ডবৎ। আর আমার মুখে ছাই। এ বয়সে যদি কেও বিয়ে কোত্তে চায়, ভদ্র লোক হোলে তাকে নিবারণ করে। আহা! মেয়েটাকে জনমের জন্য জলাঞ্জলী দেওয়া হোচ্চে। স্বামী যে কি বস্তু তাহা একদিনের জন্য জানবে?

১ম বরযাত্রী। (সাধারণের প্রতি) মাতালের কথা উপহাস করা যায় না, মাতাল যা বোলচে (very right)

বর। তোমরাও যে আবার মাতালের সঙ্গী হোচ্চো। তাহোলে আর কি আমার বিয়ে হবে? এখন মাতালদের এখান হোতে দূর কোরে দেও।

৪র্থ মাতাল। (এগিয়ে এসে) বাবা! আমিও যে একজন মাতাল গো। আজ এখানে গলাধাক্কা দিচ্চ, দুদিন বাদে বুঝি বাড়িতেও গলাধাক্কা দিবে। আমরা মদ খাই, তুমি মদ না খেয়ে কি মানুষের কাজ কোল্লে? মাসে সদাবধি

দুশো টাকা অনর্থক কেন ব্যয় কোল্লে না? সেও তোমার পক্ষে খুব ভাল ছিল। চিরদিনের জন্য আমারদিগের বুকের উপরে শত্রু স্থাপন করা এ ভাল হোচ্চে না। (কন্যা কর্ত্তার মুখের দিকে চেয়ে) তোমরা এ উপজীবিকা ছেড়ে দাও, পাঠী বেচা আর মেয়ে বেচা সমান পাপ। তোমার মনে কি দয়া নাই যে, আপনার কন্যাটীকে যাবজ্জীবনের জন্য দেহ ধারণের সুখ সৌভাগ্য বঞ্চিতা কোচ্চো?

১ বরযাত্রী। (৪র্থ মাতালের হস্ত ধোরে) বাবু! বুড়ো ক্ষেপেচে, কি কোরবে? বাপের বিয়ে দেখতে নাই, বাবা! এখান থেকে যাও।

৪র্থ মাতাল। মোশায়! বুড়োও ক্ষেপেছে, তোমরাও ক্ষেপেছো। তোমরাই বা বুড়োকে সঙ্গে কোরে নে কেমন কোরে বিয়ে দিতে এলে। লুচি খাবে বোলে কি?

১ বরযাত্রী। (চুপিচুপি) বাবা! সেসব কথা এখানে বোল্‌তে গেলে আর কিছু থাকে না, চাটুয্যে মোশায়ের সঙ্গে কর্ত্তার যে কথা নাই, তার কারণ কি জানেন? তিনি বিবাহ কোত্তে নিবারণ কোরে ছিলেন, সেই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ নাই। বুড়োর কপালে বুড়ো বয়েসে বিয়ে ছিলো। কে খণ্ডন ক্োরবে। তুমি কি কোরবে বাবা। ঘরে যাও।

৪র্থ মাতাল। বাবা! আমরা মাতাল তোমরা পাগল কেবল বাবা২ শব্দ হচ্চে আর বাবা এখানে থাকবো না শেষে কন্যার পেট থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে বাবাকে বাবা বোল্লে এখনি বিষয়ের অংশী হবে। আসি বাবা।

(মাতালদিগের প্রস্থান)

(কন্যার মাতা কন্যাকে নিয়ে চক্রবর্তীদের বাটীতে গমন)

(বিবাহের সময় রায় মোশায় কন্যাকে এবং গৃহিণীকে বাটীতে না দেখে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে গমন)

রায়। (গৃহিণীর দিকে চেয়ে) বা! বেশ খুব মজার বটে? বিবাহের নগ্ন বোয়ে যাচ্চে এ সময়ে কন্যাটীকে নে এখানে বোসে আছ?

গৃহিণী। আমি আমার মেয়ের বিয়ে দোবো না এবং তোমার ঘরেও যাবো না। আমি মেয়েটীকে নে ভিক্ষা কোরে খাব।

রায়। এখন ঝকড়ার সময় নয়, এরপর ঝকড়া কোরিস, যেমন বল্লি, তার আটগুণ শুনবি, এখন মেয়ে নে ঘরে চল্।

গৃহিণী। সবে মোর এক মেয়ে এ প্রাণ থাকিতে।
কখন দিব না বুড়ো বরে বিয়ে দিতে।।
তোমার শরীরে কিহে মায়া দয়া নাই।
কেমনে করিতে চাও এমন জামাই।।
বর্ত্তমান থাকে জানি জনক যাহার।
ঘর বর দেখে বিভা দ্যায় দুহিতার।।
তুমি ত জীবিত আছ নহতো হে মরা।
খুঁজিয়ে এনেছো ভাল বর বুড়োজ্বরা।।

প্রাণনাথ! এ দেশের এই একটী অত্যন্ত মন্দ দেশাচার বলিতে হয়, যাহার সঙ্গে যাবজ্জীবনের জন্য একত্রে ঘর ঘরকন্না করিতে হইবেক তাহাদিগের উভয়ের মনস্থ হইয়া পরিণয় কার্য্য সম্পাদন হওয়াই উচিত, এ বিষয়টী এদেশের ব্যবহার নাই বোলেই যা বলুন, কিন্তু মা বাপের এ বিষয়ে খুব বিবেচনা চাই।

রায়। এখন অত শোনবার সময় নয়, তুই না জাস নেই২ মেয়েটাকে বার কোরে দে নগ্ন বোয়ে যাচ্ছে।

গৃহিণী। না আমি আমার মেয়ে দোবো না।

রায়। (সক্রোধে) তোর বাপের মেয়ে যে আটকে রাখচিস। আরে মর যত না কিছু বোলচি তত যেন বেড়ে যাচ্ছে? তোকে কত টাকা দে বিয়ে কোরেচি মনে কি আছে? আজ পর্য্যন্ত আমার আর বাগানখানা বাঁদা রোয়েচে। বুড়ো জামাই হোক কিম্বা ছোকরা জামাই হোক তোর বাপের কি? তোকে তো নে সুতে হবে না। তুই অত গণগণ কচ্চিস কেন? আমি যা ভাল বুঝবো তাই কোরবো। দে মেয়ে বার কোরে দে।

গৃহিণী। আমার বাপের মেয়ে নয় তোমার বাপের মেয়ে নাকি? যাও আমি মেয়ে দোবো না তুমি কি কোরবে কর।

রায়। (বেগতিক দেখে নরম হোয়ে) দেখ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কেউ ঘুচাতে পারে না। আজ তুমি যদি বিয়ে না দাও তাহোলে আর মেয়ের বিয়ে হবে না লোকে দোপড়া বোলবে।

গৃহিণী। তাকে পারা যাবে তুমিও এখান থেকে যাও।

রায়। দেখ! টাকাগুলি তুমি সব নাও আজ আমার মান রাখ।

(টাকা বড় জিনিস কন্যার মা সব টাকার নাম শুনে নিমরাজী হোলেন। কান্না থামলেও ক্ষণেক ক্ষণ চোকের জল টস২ পড়ে, কোনের মার চোক দে দু এক টোশা জল পোড়চে এবং মৌখিক গণ২ কচ্চেন। ব্রাহ্মণ বরের নিকট হইতে আটশো টাকা এনে দিতে কোনের মার চোকের জল পোড়চে এদিকে আচলে টাকার পুটলী বাঁদচে) কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলী বাঁধে।

(বিয়ে হোয়ে বর কোনের গৃহে গমন)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী

ভূপতিপুর নিবাসী।

শ্রীমুন্সী নামদার কর্ত্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।

মূল্য /০ আনা মাত্র।

[1863]

শ্রীশ্রীহরিবজী।

শরণং।

কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী।

পয়ার।

অপূর্ব্ব কলির কথা শুন বন্ধুগণ।
কিঞ্চিৎ লিখিয়া যাই কলির বচন।।
কলি হলো কাল এবে বাঁশ গাছে নেবু।
ভদ্রের ভদ্রস্থ গেল ছুঁচো হলো বাবু।।
একিরে আশ্চর্য্য কথা শুনে হাসি পায়।
চামচিকা হইয়ে ক্রমে রাজ্য নিতে চায়।।
হাড়িতে উড়ায় শাল মেতরে আতোর।
দিনেতে মোল্লাজি হন রাত্রে নেশাখোর।।
এসব লিখিতে গেলে ভারি হবে পুথি।
কলিকালে বয়েদের শুন রীতি নীতি।।

গদ্যছন্দ।

সকল বাবু ভেয়েরা ফুল বাবু হয়ে বেড়ান, কিন্তু স্ত্রীলোকের অনুমতি ভিন্ন চলেনা, পিতা মাতার সেবা কিছুই করেন না, অত্যন্ত রমণী বস হইয়া থাকেন, সে কেমন, দেখ যত দিন পুত্র সন্তানাদি না হয় তত দিন পরমেশ্বরের নিকটে কত সেবা সাধনা করিতে২ যদি একটি পুত্র সন্তান হয়, তবে কত দুঃখ ভোগ করিয়া লালন পালন করে এবং লেখাপড়া সেখায়, কিছু কাল পরে কিঞ্চিৎ সিয়ানা হইলে পরকেটে উড়েন, আর পায় কে বিবাহ না দিলেই নয়, বাবু লজ্জায় মুখ ফুটে বল্‌তে পারেন না কিন্তু মনে২ মহা রাগ, একবার এদিগ পলায়ে জান, একবার উদিগ পলায়ে জান, ঘরের কর্ম্ম কার্য্য কিছুই করেন না, মনে২ করেন যে এ বুড়ো বুড়ি মলেই বাচি, বাবুর এইরূপ চাল চুল দেখিয়া মায়ের তো প্রাণ কাণে২ কাণ ভারি হয়, মনে ভাবে কি জানি

যদি আমার ছেলে কোন রাঁড় ভাঁড় লয়ে পলায়ে যায় তবে তো আমার সর্ব্বনাশ হবে, কেবল্ আমার একটি সন্তান তাকে না দেখিয়া তো প্রাণে বাচ্‌বো না, সুপরামর্শ এই যে একটি উত্তম কন্যা তত্ত্ব করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত, এবং বেটা বধূ নাতি পুতির মতন খেলা টেলা করবে তামাসা দেখ্‌বো প্রাণটা স্থির হবে, এই রূপে গিন্নি বিবেচনা করিয়া কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করেন, হেদে হে ও কর্ত্তা মহাশয় পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে সন্তানটী যে শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে ডাগর ডোগরটা হয়েছে বিয়ে বলে কি মনে নাই, এবং এ পাড়াতে এক বয়েসী প্রায় সকলেরি বিয়ে হয়েছে, আপনি যদি একটুকু মনোযোগ করেন তবেতো বিয়ে ছেলেটির দেওয়া যায় এবং আমিও বধূ চেষ্টা করি, আর ছেলের আইকেও জানাই, কর্ত্তা বলিলেন কি আশ্চর্য্য! ছেলের বিয়ে দিব বেনের বাড়ি যাব এত সুখের কথা তবে এ বচ্ছরটা থাক সামনে বচবে কিঞ্চিৎ টাকা উপার্জ্জন হবে সেই সময়ে শুভ কর্ম্মটিই করে দেওয়া যাইবে, গিন্নি বলিলেন তা নয়, দেখ আমরা কোন দিন মরে যাই কি হয় বরঞ্চ দশ টাকা কর্জ্জ পাতি হয় সেও ভাল কর্ম্মটা আর রাখা নয়, এবং এইরূপ গিন্নির প্রিয়ো বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা সায় দিলেন গিন্নি পরম সুখে বেটার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন, দেখ্‌তে শুন্তেও ভাল এবং রূপে গুণেও উত্তম সুধির স্থির করিয়া বিবাহ দিলেন, পরে বাবুর বিয়ে হতে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ঘরের কর্ম্ম কার্য্যেও মন দিলেন এবং চাকরি বাকরি করিতেও গেলেন, টাকাকড়ি গুলি সকল মায়ের হাতে এনে দেন, কিন্তু ওরি মধ্যে কিঞ্চিৎ লুকায়ে শ্বশুরালয়ে গমন করে, পরে বউটি প্রায় যুবক হয়ে এলো, তখন বাবুকে ক্রমে২ কাবু করিতে লাগিলেন, প্রায় ওঠ বল্লে উঠে বস বল্লে বসেন, কখন হাস্য রূপে গালে একটা ঠোনাই মেরে বসলেন, পরে কিছু দিন বাদে এমনি হলেন যে যুবতী যদি পৃষ্ঠে পালান দিয়া চড়িতে চান তো তাই স্বীকার, তাঁর কথা কোন প্রকারে আর লঙ্ঘিত হওয়া অসাধ্য, যদি যুবতী বলেন হেদে হে মিন্‌সে একখান ঢাকাই সাড়ি কিনে এনে দেতো, বাবু বলেন যে আজ্ঞা আনিতেছি, আর মা যদি একখান মাটাবালামের বস্ত্র চান তাও হওয়া অসাধ্য।

যুবতীর ভিন্ন হওয়া যুক্তি।

বউটি দেখিল যে এখন তো প্রায় স্বামীকে বস করে এনেছি তবে এই যে আমার স্বামী এত টাকাকড়ি উপার্জ্জন করেন সকল শ্বশুর শাশুড়ির হস্তগত হয়, যদি কোন

ক্রমে একবার ভিন্ন হৈতে পারি তবে সকলি আমারি হয় এবং আমার মাকেও ডেকে পাঠাব সেও আমার কাছে এসে থাকিবেক প্রায় আমিই গিন্নি হয়ে রব, তাই করা উচিত মিথ্যা কেন আর ভূতের বেগার খেটে মরি, শাশুড়ী ননদ থেকে জ্বালা হয়েছে, এইরূপ তো মনে২ করিয়া থাকেন পরে বাবু ওদিগে সমস্ত দিন কর্ম্ম কার্য্য করিয়া বাড়ি আইসেন, বউটি অন্য দিনের চেয়ে অতি শীঘ্র এক ঘটি গরম জল এবং এক ছিলিম তমাক সেজে দেন, পরে খাওয়া দাওয়ার পর শয়ন মন্দীরে দুজনে শয়ন করেন এবং বউটি অতি আহ্লাদে হয় তো একটি চরণ পুরুষের গায়ে তুলে দিলেন এবং দুই চারি রস ভাসার কথাও বল্লেন তার পর প্রিয় বাক্যে বলিতেছেন, যথা। শুন২ প্রাণনাথ একটি মনের কথা বলবো কদিন বলি২ করেও বল্তে পাই না, না না আর বল্বনা বল্লিই বা কি হবে মনের কথা মনেই থাক, আহা বলিয়া একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাবুর মন সহজেই কাবু হইল জিজ্ঞাসা করিলেন কেন২ প্রাণেশ্বরী কি হয়েছে বলনা চাঁদবদনী, যুবতী কহিল যাও আর কি বলিব, আমার কপাল, তুমি কি তেন্নি পুরুষ তা মনের কথা বল্‌ব, যুবক কহিল বলনা২ আমায় বল্‌বেনা তো কারে বল্‌বে, তোমাকে আমার মাথার দিব্বি, তখন যুবতী পতিকে অতি ব্যস্ত দেখিয়া ফোত্২ করিয়া প্রায় আল্‌গা চক্ষের জল দুই চারি ফোটা পড়েও যায়, হাঁপিয়ে২ বলেন শীঘ্র কথাও মুখে বেরোয় না, দেখ২ প্রাণনাথ তোমা তোমা তোমার মা আমাকে আজ খেতে দেয়নি, এবং গালাগালি কেবল দেয় মারতেই বাকী, বলে ভাইখাগি বেরো, দেখ আমি তোমার ঘরের লোক এবং কুলবালা সরলা হয়ে কোথা বার হবো, এও কি শাশুড়ী হয়ে বল্‌তে পারে, কি করবো খালি তোমার মুখ চেয়ে এতক্ষণ ছিলাম নতুবা গলে দড়ি দিতাম সেও ভাল, এ মুখ আর দেখাতে ইচ্ছা হয় না, বাবু তো এ কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ পাতাল হয়ে গেলেন কোচাঁর কাপড় দিয়ে যুবতীর মুখটি পুঁছে বল্‌ছেন, আচ্ছা তুমি সান্ত হও, কাল সকালে বুড় বেটীকে আচ্ছা তামাসা দেখাচ্চি, সে দিনত গেল গায়ের রাগ গায়ে মেরে সকালে বুড়িকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা বাবু বুড় বুড়ি এক জন হয়েছ, কথায় বলে বুড় হলে বুড়ভাম্ হয়, বয়ের সঙ্গে কি এমন করে কেও কাজিয়ে করে, তার মাতাঠাক্‌রোন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্‌ছেন, কেনরে বাবা কেনরে বাবা আমি কেন ঝকড়া করবো রে, বউ আমার প্রাণের তুল্য, বাবু মুখটা বেজার হয়ে বল্‌লেন, হারে বাবু হাঁ বুঝা গেছে,

সে দিন তো ক্রোধভরে অনাহারে আপন কর্ম্মে গেলেন।

দ্বিতীয় রাত্রের মন্ত্রণা।

বউটি মনে২ করিলেন যে কালকের রাত্রে তো কিছু হলোনা দেখি আজ কি করিতে পারি, পর দিবসের মতন শয়ন করিয়া যুবতী বলিতেছেন, দেখ প্রাণনাথ একটি মজার কথা শুনেছ, কি প্রাণ বলনা, বউটির উক্তি। দেখ গত রাত্রে তোমার সঙ্গে যে কথাগুলি কয়েছিলাম, সকল কথাগুলি গিন্নি কানাচ এড়ে শুনে গেছে, আই আই ছি ছি এও কি শাশুড়ীকে সাজে, তোমায় আমায় না জানি কত লজ্জা খেয়ে কথা হয়েছিল, কথায় বলে মেয়ে পুরুষের কথা, তিনি শুনিবার কে, যা নয় ননদ ... আই আই লাজে মরে যাই, সকালে কত আমাকে গাল দিতে লাগিল বলে নাগানি ভাঙ্গানি, আমি আর লজ্জায় মাথা তুল্‌তে পারিলাম না আর তোমাকে কত লাঞ্ছনা কর্ত্তে লাগ্‌লো, বলে যা রোজগার করে তার কাছে জমা রাখে কেবল সেই আশ্বিন মাসে কি ভাগ্যে ১০ দশটা টাকা এনে দিয়েছেন না জানি তুমি কত টাকাই জমা করেছ তোমার মা আমাকে শুনিয়ে২ বলে যেন রাত্র দিন ব্যঙ্গ গোঁজ্‌লায়, শাশুড়ী ননদের জ্বালায় প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে গেল, কি ক্ষণে তোমার সহিত আমি পড়ে ছিলেম, যুবতীর এই মন্ত্রণা শুনিয়া বাবুত একেবারে আকাশ পাতাল হয়ে গেলেন হাঁতো কানাচ এড়ে শুনে গেছে ইচ্ছা হয় যে এ বাটীতে আর থাকিনে এবং ঘরে দোরেও আসিনে, তখন বৌটী পুরুষের মন ভাঙ্গা দেখে বল্‌ছেন, দেখ প্রাণনাথ তুমিত আমার কথার নও আমিত পূর্ব্বেই বলেছিনু যে আমায় পিতার আলয় গিয়ে থাকি সেখানে তোমার কত আহ্লাদ আমোদ হতো এবং প্রাণনাথ তুমি যখন ভাত খাও আমার চক্ষু দিয়ে জল পড়ে, আমার বাড়িতে কত সামিগ্রী এবং জলপানের সময়ে কত রকম রকমের খাদ্য দ্রব্য তৈয়ার হয়, পরমান্ন গুড়পীঠে ক্ষীরপুরি সন্দেশ বাদামতক্তি ঘিয়েভাজা পুরি ইত্যাদি মিষ্টান্ন, তোমার সুখ আছে তা খাবে, তখন বাবু বল্‌ছেন হাঁ হাঁ যে রকম বাড়িতে দেখ্‌তে পাচ্ছি তাই হবে এ বাড়িতে থাকা আর সুখ নাই তবে কিঞ্চিৎকাল থাকি জায়গা জমীটুকু আছে ছেড়ে যাব, না হয় এইখানেই কদায় গুণ ফেলে থাকি, তখন বউটি মনে২ চিন্তা করিল যে এ পুরুষকে তো মায়ের বাড়ি নেজেতে পাল্লেম না তবে কি করি।

তৃতীয় রাত্রের মন্ত্রণা।

তৃতীয় দিবসের রাত্রে শয়ন ঘরে যুবতী অতি আহ্লাদ আমোদে নাগরের গলে ধরে প্রিয়বাক্যে ধিরে২ বল্‌ছেন, শুন প্রাণনাথ একটি কথা বল্‌ব, না না অমন বলিনে কথাটি রাখতো বলি, কি প্রাণ বলনা, যুবতী কহিল, দেখ তুমি যে এত টাকাকড়ি রোজগার পাতি কর্চ্ছে সকল গুনিই মায়ের হাতে দিতেছ, তবু তো নাম নাই, সব ভূতোগতেই যেতেছে, তাও না হয় গেল, তা বাদে দেখ আমার অঙ্গের গহনা পাতিও ক্রমে২ বন্ধক পড়তেছে, তা তুমি এক কর্ম্ম করনা কেন, আমাকে ভিন্ন করে দেও, আমি আপনার এক মুটো দুঃখের ভাত সুখ করে খাব এবং এ যন্ত্রণা থেকেও এড়াই, আর আপনি যদি একটি টাকাও খোরাকি দেও তবু তা থেকে আমি কিঞ্চিৎ বাচাব কোন প্রকারে দিন গেলেই হলো এবং বোধ করি যে এমনটা কল্যে পরে ক্রমে পুঁজি পাটাও হইতে পারে, আর একটা দেখ তুমিত বারো মাসটা খেটেই মরতেছ, তা হলে এত খাটতেই বা হবে কেন হলোত এক মাস কর্ম্ম কার্য্য কল্যে ১০ দশ দিন বসে খেলে বল এ কথা যথার্থ বল্‌চি কি মিথ্যা বল্‌চি। তখন যুব নাগর যুবতীর এই মন্ত্রণা শুনিয়া বল্‌ছেন, প্রাণ তুমি ঠিক বল্‌চ তুমি আমার বুদ্ধের সাগর, তাই করা উচিত তবে প্রাণ কি প্রকারে ভিন্ন হৈতে পারি তারতো একটা উপায় চাই, বউটি কহিল তা তখন পারা যাবে, প্রাণ কি বুদ্ধি করি বল দেখি, তবে এক পরামর্শ বলি।

বাবুর পরামর্শ।

বাবু কহিলেন দেখ প্রাণেশ্বরী তুমি কল্য সকালে কোন কথার কৌসলে মায়ের সঙ্গে ঝকড়া করবে পরে আমি আস্‌ব তখন তার বিবেচনা করব, যুবতী কহিল বেশ বলেচ তবে আজি করি। বাবু কহিলেন আজ আর না, কল্য এইরূপে সে দিনতো গেল পর দিনে বউটি সকালবেলা মন ভারি২ উঠিলেন পরে কোন কথার ঠেক করিয়া শাশুড়ির সঙ্গে মহা ঝগড়া লেগে গেল, প্রায় রাম রাবণের যুদ্ধ, কোন প্রকারেই আর থামে না, গণ্ডগোল শুনে পাড়ার লোক জমা হয়ে গেল, এমত সময়ে হোতা বাবুও এসে পৌছিলেন, যেন জেনেও জানে না, কেন গো কি হয়েছে ঝগড়া উপস্থিত কেন রে বাবু ভাল জ্বালা হয়েছে, ওদিগে যুবতী বাবুকে দেখিয়া

ছলনা ভাবে বল্‌ছেন, দেখ২ তোমার মা আমাকে আর এ বাড়িতে টিকতে দিলেন না, এই লও তোমার ঘরকন্না, ভাল জ্বালাটা জ্বালালে বলিয়া হয়ত এক ঘটি কিম্বা বাটিটা মাথায় মরিয়া রক্তপাত হয়ে গেলেন, তখন বাবুর তামাসা দেখতো বল কি, পায়তো বুড়িকে জেন্তই পুঁতে আসে লোকলজ্জায় কিছু বল্‌তে না পেরে হয়তো আপনিই মাথায় মেরে বসিলেন, হাঁতো আমার বুড় মায়ের সঙ্গে তুই ঝকরা করিস, আচ্ছা তার প্রতিফল কচ্ছি, ফের রাগভরে বউটিকে মারবে বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে কপাট দিয়ে তাকে না মেরে ঠেলে তক্তাপোসে ধুম ধাম জুতো ঠুকতে আরম্ভ করে দিলেন, হোতায় বুড়ির ঝকড়া চুলোয় যাউক সকলকে ডাকিতে লাগিলেন ওগো আমার বউকে মেরে ফেল্যে গো তোরা ছাড়িয়ে দেনা গো ওগো ছাড়িয়ে দেনা গো, ওদিকে ঘরের ভিতরে বউটি ফাঁকে দাঁড়ায়ে ছল্‌ করিয়া চিৎকার করেন, ওরে বাবা রে ওরে বাবা রে, পোড়ামুখো মেরে ফেল্যেরে, ওগো তোরা ধর্‌ না এসে গো ওগো তোরা ধর্‌ না এসে গো, আর মেরনা২ মরে গেনু মরে গেনু, তখন তাড়াতাড়ি পাড়ার সবাই গিয়ে ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে দিলে, কেহ২ ওরি মধ্যে বল্লেন, আহা আহা ছুড়িকে মেরে ফেল্লে গো কেমন শাশ্বড়ী শ্বশুর বাবু না বনিবনাত হয়তো ভিন্ন করেই দিকনা, রাত্র দিন ঝকড়াই কেন হবে, যে যার আপনার রান্দিবে খাবে, তখন বুড়ি বেটার বউদিগের রকম সকম দেখে সহযেই বল্লেন আচ্ছা বাবা বউটি যদি এক হাড়িতে খেতে না চায়ঁ তবে না হয় ভিন্ন করেই দেও, প্রত্যহ কেন হাড়ি কিচকিচি হবে, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা হবে, এইরূপে গোলমাল হইতেছে এমন সময়ে বউয়ের মা গিন্নি এসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মহা কাণ্ড হয়েছে এবং বউটি কান্দিতেছেন গায়ে ধূলা কেশ এলো চক্ষু দুটি ফুলো২ দেখেতো একেবারে তালপাতার আগুন হয়ে গেলেন, ওদিগে বউটি মাকে দেখ্‌তে পেয়ে শোক উথলে গেল, হাঁপিয়ে২ আরো কান্দিতে আরম্ভ করিলেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন কেনগা২ কেও২ এরিমধ্যে বলিলেন যে শাশুড়ী বউয়ে ঝকড়া করেছিল ভাই তোমার জামাই মেরেছে, এইতো আর কোথা যাবে, আরে বাপরে আরে মোর ঘরকন্না, আমি বুঝি আমার মেয়েকে মার্‌তে দিয়েছি, আরে কি মারবে রে, বুড়িকে বলেন, হারে আটকুড়ি আমি কি তোরে মার খাওয়াতে মেয়ে দিয়েছি কোথা গেল ডাক তো ডাক তোর বেটাকে না হয়তো তোর বেটার একটা বে দিগে

যা আজ এক একখানা করে যাব, সবুর কর পাড়ার লোক ডাকি, বলিয়া পাঁচ জন গিন্নিকে ডাকিয়া কহিলেন, হাঁগা বল তোমরা বিচার কর, একে আমার একটা আদরের মেয়ে, আমি কি জ্বালাতে পোড়াতে মারখাওয়াতে দিয়েছি গো, তোরা বল্না গো, থাক ঘর কন্না আমি আমার বেটীকে নিয়ে যাই, কেন আমি পেটে ঠাই দিয়েছি, হাঁড়িতে কি দিতে পার্ব না, প্রায় ঝিকে সাজায়ে নিয়ে যায়, তখন পাড়া পড়সি এবং বুড়ি তাড়াতাড়ি গিয়ে বেনের হাতে ধরে বলে কয়ে ফিরোতে যায়, সে কি শোনে, ঝট্কা মেরে চলে যায়, সকলে অনেক টানাটানি করিয়া বলিলেন, কেন বেন তুমি নিয়ে যাবে কেন আচ্ছা তোমার মেয়েকে তুমি থেকে ভিন্ন করে দিয়ে যাও, বউয়ের মা ভিন্ন হইবার নাম শুনিয়া ফিরিলেন, এবং এসে বেটির ঘরের ভিতরে বসিলেন, এমন সময়ে জামাইটিও এসে উপস্থিত হৈল, শাশুড়িকে দেখে বলেন, ঘোষের ঝি কতক্ষণ গো, প্রণাম হই আশীর্ব্বাদ কর, শাশুড়ী ক্রোধভরে বলিলেন, রাখ বাবু তোমার প্রণাম, ভাল জ্বালাটা জ্বালালে যাহক, কেন আমার মেয়ে কি করেছে তা এত যন্ত্রণা দেও ভালখাকিরা বলেছিল যে তোর মেয়ে বেশ সুখে খাবে পরবে গো, এইতো দেখ্তে পাচ্চি, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাব, জামাইটি তো শুনে কলুর বলদের মতন চুপ করে রইল, পাড়ায় গিন্নি সকলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলের মুখে জল টল দিলেন পরে জামাইটিকে হাঁড়ি কুড়ি কিনে বেঁচে দিয়ে ভিন্ন করে দিয়ে বাড়ি গেলেন।

বাবুর বাজার করা।

এইরূপে জুদা জাদা হয়ে গেলেন, পরে যখন বাবু বাজার টাজার জান তখন ভাল২ রোহিত মৎস্য এবং কত দ্রব্যাদি লন বুড়ো বুড়ির জন্যে যদি মনে পড়ে তবে এক আদ পয়সার চুনোচানা মৎস্য এবং নটে শাক আনিয়া দেন বাড়িতে বউটি অতি আহ্লাদ আমদে রান্না বান্না করেন মৎস্য মুগের দাইল ভাজা মৎস্যের অম্বল ছিমিমটর আলু কপিসাগ হোতায় বুড়ি বুড়ো নটেশাক গুলি এবং চুনো মৎস্য গুলি নিয়ে লাড়ে ঝাড়ে বেটা একবার মনেও করে না যে বুড়ো মিন্সে খেলে কি না খেলে, বেলোক ভাতে বাপ পড়শী, ভুলেও জিজ্ঞাসা করেন না যে তোরা কেমন আছিস গো, খালি মাগটা খেলেই হলো, স্ত্রীর জন্যে ভাল২ চেলির শাড়ি এবং তোলাপেড়ে রাস্তা পেড়ে বিছানাপেড়ে বেড়ে২ কাপড় কিনে আনেন, মা হোতা

ছেড়া কাপড়টুকু সাতটা গাইট দেওয়া পরেন, মাগের মস্তকে দিবার জন্য তৈল আনেন, চামেলি বেলার চুয়া চন্দন মজুমার সুগন্ধি এনে দেন, মাকে হোতা সরিষার তৈলও যোড়ে না, এইরূপ কিঞ্চিৎকাল পরে এমনি হয়ে জান যে, বাপ বলে বেটা কেটা বেটা বলে কে ওটা।

পয়ার।

রচে হীন কবিকার নামে নামদার।
ধিক২ শতধিক এমন বেটার।।
সাকিম ভূপতিপুরে বসতি আমার;
রচিয়া কলির কথা করিনু প্রচার।।
নামেতে ওম্মোদ আলি বড় নেকদার।
এ পুস্তক লিখি আমি ফরমাসে তাঁহার।।
তাওয়াল্লাদ নামা আগে করেছি সায়েরি।
তার পরে প্রেম সবাসি করিনু তৈয়ারি।।
প্রেম বাহার করিয়াছি অতি সুরচন।
নারী যোল কলা ফের হতেছে রচন।।
সেখ ওম্মোদ দোস্ত মোর অনুগ্রহ করি।
কলির বউ ঘর-ভাঙ্গা ছাপে শীঘ্র করি।।
এই সব পুথি যার হইবে দরকার।
পাইবে করিলে তত্ত্ব শুন সমাচার।।
কলিকাতা সুপ্রিমকোর্ট অতুল্য কাছারী।
আবশ্যক মতলবে সেথা তত্ত্ব করি।।
অন্য২ পুস্তক আর রসের বচন।
রস ভরা কথা খালি অতি সুবচন।।
প্রেম সাবসি নামে জেটা হয়েছে তৈয়ারি।
রস ভিন্ন কথা নাই পদে পদে তারি।।

পুস্তক সমাপ্ত।

কাশীতে হয় ভূমিকম্প।
নারীদের একি দম্ভ।

শ্রীমুন্সী নামদার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীকাজী সফিউদ্দীনের
অনুমত্যানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।
এই পুস্তক চাঁদনীর ১ নং গলিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

[1863]

কাশীতে হয় ভূমিকম্প।
নারীদের এ কি দম্ভ।

রাগিনী পাঁইট। তাল ঢলে পড়ি।

গড় করি মেয়েদের পায়। মেয়ে তো সামান্য নয়।।
মেয়ের পায়ের চিঁড়ে কোটা মহাপ্রভুর ভোগ লাগায়।
হেন সাধ্য কার আছে, মেয়ের বর্ণিমা রচে, মান করে
রাধিকা দেখ, কৃষ্ণচন্দ্র পায় ধরায়।।

গীত।

ধন্য২ কামিনীরা জন্মেছে এ কামিনী।
কামিনী বিহনে কোথা সুখে পোহায় রজনী।।
মনে করে যে যুবতী, দাস করে সে আপন পতি,
পাপের ঘরে জ্বালায় বাতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম মজানি।
মেয়ে রাজা মেয়ে প্রজা, কার্ত্তে পারে আস্থা সাজা,
পরে মাথায় রেখে বোঝা, খেমটা বাজা বাজানি।।

রসিক বাবুর তারামণির সহিত উক্তি।

রসিকবাবু। কোথা গেলেহে২। ঢেলে কাদ্‌তে লাগলো দুধ দেওনা, মর উত্তর পাওয়া ভার যে।

তারামণি। বলি কেন এত ডাক পড়েছে, ভাঙ্গা ঘরের কাঁস পড়েছে। ছেলে কাদ্‌বে তা ঠিক করবো, ছেলে কি কোলে করেই বসে থাকবো নাকি, কেমন জন্ম দোষে ছেলে হয়েছে তা এক দণ্ডও কোলে থেকে ভুঁয়ে নামে না।

রসিকবাবু। ছেলের জন্মের দোষ বই আর কি, তা তুমিই জান মেয়ের ঘরে প্রত্যয় কি? কি না কর্ত্তে পারে, মনে কল্লে চাই কি দুপাশে দুজন থাকে।

তারামণি। হেঁতা বটে পুরুষের মনটাই বড় ভাল, আমরা তবু পুরুষের বোঝা বুকে করে বই, পুরুষ তো তা পড়েন্নি, যদ্যপিও বয় তবে একটা সুন্দর মেয়ে মানুষ দেখলেই অন্নি চুপ করে ফেলে দেয়, তেমন যদি আমাদেরো হতো তবে আর পোঁদে কাছা দিতে হতো না, নারি যদি না জন্মাইত তবে না জানি কি হত।

রসিকবাবু। তবেই তো ভাল বল্লে, তত আর ঠাট করে কায নাই, ঐ যে কে বলেছিল, আমি না থাকলে বে কত্তে কাকে, বলে তোর মাকে, তাই হয়েছে, মেয়ে জেতে পাপী বই তো নয়।

তারামণি। আমরা পাপী বই কি, মনে বুঝে দেখ দেখিল, পুরুষরাই পাপী, তাইতে স্ত্রীলোকের পায়ে ধরে পাপ ক্ষয় করে।

রসিকবাবু। এই কথাটি বলে খালি যেতো বৈ তো নয়, কেমন মেয়ে জেতের এক স্বধর্ম্ম, কিন্তু খালি পায়ে ধরাতো নয়, তাতো বুঝ না, খালি বলো পায় ধরা, তোমার লজ্জা নাই তাই বল, নৈলে কি বল্‌তে।

পয়ার।

ধিক্ ধিক্ নারী জেতে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
বুঝিলাম নারী লোকে বড় অধার্ম্মিক।।
মেছুয়া বাজারে দেখ কত নারীগণ।
বারান্ডাতে বসে থাকে পুরুষ কারণ।।
বউবাজার কলুটোলা গঙ্গারামের গলি।
চাঁদনির বাজারে আর হাড়কাটার গলি।।
পুরুষের জন্যে তারা করে গীত নাট।
ছিছি তবু লজ্জা নাই কর নারী সাট।।
দশ হাত কাপড়ে নেঙটা নারী পাপ মতি।
চারি আনা দু-আনা পেলে দান করে রতি।।
তবে আর নারীগণে কিসের গুমর।
পায়ে ধরা বল তবু লজ্জা নাই তোর।।
পায়ে ধরা বল কিন্তু না থাকি ধরায়।
তবু যে উপরে থাকি ভ্রমরের প্রায়।।

তারামণি। (হাস্যরূপে) তুমি যে বড়ই বল্লেগা, পুরুষ জেতে কি কিছু করে না তা বলবো কি, বল্লে আর কিছু থাকে না, এক্ষনি আদা বাড়ি কাদা হয়, থোতা মুখ ভোতা হয়, তুমি যেম্নি আমি তেম্নি হতেম যদি তবে তো পোষাতো, যেমন উনুন মুখো ঠাকুর তেম্নি ঘুটের ছাই নৈবিদ্দি।

রসিকবাবু। বলুন না কি বলবে মনে খেদ থাকে কেন, পুরুষরা তো মোড়া নিয়ে দ্বারে বসে, ও মানুষটি শুনে জানা ও মানুষটি শুনে জানা বলেনা তার একটা ভয় কি।

তারামণি। হাঁ হাঁ তাই না হয় ডাকে তবু পুরুষের মতন তো কোট্‌নামী করে আদা ভাগ খায় না, কথায় বলে গাছে চড়তে পারবো না, বড় ছানাটি নিব তোমার মতন এমন কত ঢিলে সোগা নাগর তাদের জল গরম করে দেন এবং গোরাদের লাথি খেয়ে, লাল মাকড়া জুটিয়ে আনেন, মিছে আর বকাও কেন, মানে২ যাক, মেয়ের কড়িতে কত লোকের শান্তিপুরে ধুতি পরা হয় তবু সাট করেন।

রসিকবাবু। তাও বলেছ মিথ্যা নয় কিন্তু যত দিন যৌবন থাকে তত দিন যা করে নেয়, তার পর টুকনী হাতে করে যদি ঘরে ঘরে জয় রাধাকৃষ্ণ জয় রাধাকৃষ্ণ বলে।

ত্রিপদী।

যত দিন থাকে মধু তত দিন আসে বঁধূ,
তার পরে অন্ন পাওয়া দায়।
বুড়ি হলে কি দুর্দ্দশা, কেবল কাকের বাসা,
চাসা বই নাহিক উপায়।।
যত দিন আছে রস, কত জনে হয় বশ,
অহরহ তৈল দিয়ে পায়।
যৌবন বহিয়া গেলে, ছেঁড়া চুলে খোঁপা দিলে,
কি আর হইবে বল তায়।।
পাকিলে মাথার চুল, কি কায বেলের ফুল,
হাঁসিতে আসিবে সদা কাশী।

এক্ষণে গিয়াছে ভুলে,   লাল মাকড়া না আইলে:
তখন হইবে কাশী বাসী।।
এ দুটি আছেন কসা,   পরস্পর হবে রসা,
ঝক মারে খিরা ফুটি কদু।
মাথা নাই মাথা ঘসা,   কান নাই পরে পাশা,
কি লোভে আসিবে আর বঁধূ।।
আই আই মরি লাজে,   গোদা পায় ছড়া বাজে,
ধিক ধিক নারীর চরিত্র।
তবে যে মোড়ায় বসি,   মেড়েতে লাগায় মিসি,
দেখিয়ে শীহরে উঠে গাত্র।।

তারামণি। (মুচকি হাঁসি) যাহক তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা ভার, একেবারে যেন সীতে হরণের পালা গাইতে আরম্ভ করে দিলে, এখন খেতে দেতে হবে না এই ঝকড়া নিয়ে থাকবে, অধিক রাত্র হয়ে পল্লো চল এখন কাজের ঝকড়া করি গে।

রসিকবাবু। চল শুইগে, ছেলে ঘুমল কিনা জেগে আছে।

তারামণি। কেন! ছেলে ঘুমুক না ঘুমুক সে কথায় কাজ কি, কিছু মনে আছে নাকি, তেম্নি২ লাগচে, যে এই ততক্ষণ কতকগুলি বকলে ঝকলে এখন একলা ঘুমাও না জেয়ে, আমার সঙ্গে কি, একলা কি আর ঘুম ধরে না দুজন না হলে।

রসিকবাবু। ঘুমবো তো বটে, সুদুই কি ঘুম ধরে, না সুদু হাত মুখ উঠে, এখন বুঝে দেখ আমার মানুষটা কি আছে।

তারামণি। বুঝেচি২ বুঝতে আর বাকি নাই, কথার বলে, পল্লে কথা বুঝে নাই সেই বা কেমন মেয়ে। ঢেউ দেকে যে না ডুবায় সেই বা কেমন নেয়ে।

যুবতীর গান।

যাও যাও প্রাণনাথ, আজ আমাকে ছুঁওনাকো।
বিধাতা বৈমুখ মোরে, বসনে নিশান দেখ।।

আজ কাল পরশু পরে, তবে প্রাণ পরশো মোরে,
রাখিব অধরোপরে, শান্ত হয়ে ক্ষান্ত থাক।

রসিকবাবু। তবেই তো সর্ব্বনাশ, এখন ভেঁড়ার কাছে দুর্ব্বঘাস রাখাও তো মহা দায়।

তারামণি। (ব্যাকুলিনী) সে কি প্রাণনাথ! তুমি ভেঁড়া নাকি, হো হো সবাইকে বলে দিব, বলে দিব।

রসিকবাবু। যাওনা একটা কথায় ঠকে গেছি বলে কি আর ভদ্রস্ত নাই, কথায় বলে, হাতিটারো পা হড়কালে ও পড়ে যায়, পুরুষের কথায়২ অমন হড়কে যায়।

তারামণি। তুমি কথায়২ আমাকে বেশ উত্তর দিলে গা, হড়কে যাওয়া কথাটা তো কম নয় বুঝে দেখ দেখিন কমনে যায়, কথায় বলে ভিতর২ গিয়ে ভূষ করেছে খেয়ে, নাজানি তোমাকে এত কথা কে শিখিয়েছে, যাহক তুমি এক জন, কিন্তু সরে বসো আমি শুই।

রসিকবাবু। সে কি প্রাণেশ্বরী। তুমি শুই তবে এখনি শুতো দিয়ে রাখি এস না, কি জানি হারিয়ে টারিয়ে যাবে।

তারামণি। হাঁ হাঁ (হাঁসি পূর্ব্বক) যাও২ আর বকোনা হাঁস্তে পারি না, তোমার কথায় হেঁসে২ পেট ফেটে গেল গড় করি চুপ কর।

উভয়ের শয়ন

পয়ার।

এই রূপে ব্যঙ্গ ঠাট করিয়া দুজন।
শয্যার উপরে পুনঃ করিল শয়ন।।
স্ত্রী পুরুষে ঝকরায় না বসে সালিশ্য।
আপনি ঝকড়া হয় আপনি যে ভস্ম।।
কথায় কথায় হয় অতিশয় মান।
আপনি যে মান পূর্ণ হয় পরিত্রাণ।।

তাই বলি এ সংসারে স্ত্রী পুরুষ ধন।
না হেরি এমন দীর্ঘ অমূল্য রতন।।
রসবতী সতী যদি হেঁসে কথা কয়।
তুচ্ছ হয় স্বর্গপুরী প্রিয় সে সময়।।
তাই যে প্রণাম করি স্ত্রী লোকের পায়।
বিরচিয়া নামদার সকলে হাসায়।।

রসিকবাবু তারামণির সঙ্গে দ্বিতীয় বার
বিচ্ছেদ আরম্ভ।

তারামণি। বলি ঘুমুলে কি গা, অদ্য আমারো পোড়া চক্ষে ঘুম ধরেও ধরে না, কি জানি আজ কি হয়েছে, হাঁ গা তুমি নাকি অনেক গান টান জান লোকের মুখে শুন্তে পাই, তা কই একটা বলোনা শুনি।

রসিকবাবু। হেঁ গান গাইবো, ও ঘরে মা শুয়ে আছেন কি মনে করবেন, বলবে মাগ ভাতারে গান গাচ্চে, এলেই যে প্রদীপ নিবুতে হয়।

তারামণি। তিনি কি আর এত রাত্রে জাগ্‌ছেন তা শুন্তে পাবেন, তিনি কি আর কান জাগিয়ে রয়েছেন সে এক দিন যা ননদ হলেও হত, ধিরে২ গাইবে আর কি, বাইরে বাইরে এত হয়, আর ঘরে গাইতে কি লজ্জা পায়, তোমায় আমায় লজ্জাই বা কি, কত লজ্জা পেটের ভিতর গেছে বল্লিই হয়।

রসিকবাবু। তাও বটে আমারো আজ দুই চক্ষের পাতা এক হয়নি তাতে তুমি আমার মনটা খারাব করে দিচ্ছ তাইতে মনটা যেন ধুকুর পুকুর কচ্ছে, তবে একটা যেমন তেমন ছড়া বলি শোন।

ছড়া।

শুন তবে এক ভাবে, ওহে প্রিয়জন।
আর এক দিন মোর, উড়ু উড়ু মন।।

(প্রাণটা ধৈর্য্য নাই) প্রাণটা ধৈর্য্য নাই কিবা খাই কোথা যাই বাবুর ঘাটে বসে। এমন সময় এক যুবতী ঘোমটা টেনে আসে।। (কিবা তার ঘোমটাখানি) কিবা তার ঘোমটা খানি, কর নয়নি বিনোদিনী পরে ঢাকাই শাড়ি। দাতে মিসী, মুচকে হাসি যাচ্ছেন বাপের বাড়ি।। (নয়ন ঘুরিয়ে দেখি) নয়ন ঘুরিয়ে দেখি, একি একি কাদের সখি, পিঞ্জরের পাখি। শিকলি কেটেছে বুঝি কারে দিয়ে ফাঁকি।।

মোর কপালে এই আছে, হায়২ বেশ।

তারামণি। (ক্রোধমনে) ওরে! তাইতে বলি হাঁগা তুমিত বড় মজার কথাটি বল্লে, মনে এইটি জোগাড় করে রেখেছ নাকি, হাঁ হাঁ বুজেচি রাগির মুখেই ব্যক্ত হয়েছে, তাই তোমার মনটা ভাঙ্গা২ দেখি পচিশ টাকা মাইনে হয়েছে নাকি, তারতো পঁচিশ কড়াওতো বাড়ীতে আসে না।

পয়ার।

বলো২ তারে তুমি রেখেছো কোথায়।
নহে দিব রজ্জু গলে শুন মহাশয়।।
দেখিব২ তারে দেখাও নয়নে।
মোর দিব্য বল কোথা আছে সে সতীনে।।
যেমন সতীন তিনি হয়েছে আমার।
সাক্ষাৎ হইলে দিব প্রতিফলন তার।।
মস্তক মুড়ায়ে তার দিব চুল কালি।
ইহা যদি নাহি করি শালির বেটী শালি।।
এত দিন তোমারে হে জানি কর্ম বালি।
অদ্যবধি হলে মোর দুচক্ষের বালি।।
নহেত তোমার পদে ত্যাজিব পরাণী।
রাড় রাখা ফল তবে বুঝিবে আপনি।।
বোধ হলো দিবা নিশি সেইখানে যাক।
প্রবঞ্চনা ভাবে বুঝি মোর মন রাখ।।
যাও২ সেথা যাও হেথা কেন আর।
ঠাকরোণে বলিয়া কল্য করিব বিচার।।

এতবলি রসবতী রাগান্বিত হয়ে।
মান করি রহিলেন পাশ ফিরে সুয়ে।।
নামদার বলে ভাই নারী মহা দায়।
গান গেয়ে ফের বুঝি পায়ে ধত্তে হয়।।
এ জন্য প্রণাম করি নারীর চরণ।
কথায় কথায় মান একি বিলক্ষণ।।

রসিকবাবু। একি প্রাণেশ্বরী। তোমার তো মহা রাগ দেখতে পাই, আমি কি বল্লুম তুমি কি বুঝলে, তুমিতো বোঝবার ঢেকি দেখতে পাই, ঐ যে কে বলেছিল, হাটে গেল মামির মা, দেখে এল বাঘের পা। তুমি বল্লে আমি শুনলেম, মরে হেজে যাই বাগ দেখলেম, তাই যে কল্যে।

যুবতীর উক্তি।

যাও২ মিছে আর বকাইছো কেনে।
কল্য তুমি ঘরকন্না নিও দেখে শুনে।।
কথায় কথায় কেন কর বাড়াবাড়ি।
অদ্যবধি তোমার সঙ্গে কুটো ছেঁড়া ছিঁড়ি।।
বিধাতা এতেক দুঃখ লিখেছে ললাটে।
দেখনা তোমার দশা কাল কিবা ঘটে।।
ভিটাতে চরিবে ঘুঘু করিব সে কর্ম্ম।
তাহা না করিলে বৃথা নারী কুলে জন্ম।।
কবিকার বলে একে নারীর চরিত।
হাসিতে২ হয় হিতে বিপরিত।।

যুবতীর গলে দড়ি।

কলিকালে মেয়েদের খুরে দণ্ডবত।
যেতে কাটে আস্তে কাটে সাঁকের করাত।।
ঘর কর্ত্তে ঝকড়া হয় সকলের বাড়ী।
ভাতারে দেখান ভয় গলে দিব দড়ি।।

ওঠ বল্‌তে তাড়াতাড়ি মায়ের বাড়ী ছোটে।
কলিকালের ছুঁড়ি গুণ বুড়ির কান কাটে।।
ভাতারে কুকুরে প্রায় করেন সমান।
কথায়২ করে যেন বুনো মান।।
হয়তো গলে দড়ি দিয়ে মনে আপনি।
পাড়া পরশী লোক নিয়ে করে টানাটানি।।
তাই যে প্রণাম করি নারীদের পায়।
কিঞ্চিৎ রাগিত হলে প্রাণ দিতে চায়।।
সে ভয় বিষম ভয় কি জানি কি করে।
ক্ষতি নাই তাতে ভাই একা যদি মরে।।
প্রাণ লয়ে টানাটানি সকলেরি হয়।
এজন্য নারীর সঙ্গে কথা কওয়া দায়।।
রচে হীন কবিবার নামে নামদার।
বলিয়া ভূপতিপুরে বসতি আমার।।

গীত।

একি হলো গো ঘোর কলিকাল।
এমনি রমণী জাতি তিলে করে তাল।।
যারে তুমি ভাল বাস, সেই করে অপযশ, মুখেতে
মধুর বাণী পেটে রাখে শাল। ঐ
রমণী এমনি বীর, এক দণ্ড নহে স্থির, সামান্য কথায়
পুনঃ রেগে হয় লাল।। ঐ
রমণীরা কথা কয়, যেমন অনল প্রায়, না হয় তাপিত
অগ্নি ঢাল মহাজল। ঐ
পায়ে ধরে যদি তার, তবু মন পাওয়া ভার, নামদার
বলে তাই নারী মহাকাল।।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি কবিকারের এবং আমার নাম উঠাইয়া কিম্বা লুকাইয়া ছাপেন তবে বোধ হবে যে তাহার জন্মের কিছু কুকর্ম্ম আছে, এবং এক পিতার পুত্র নহে। আমার নামের মোহর দৃষ্টি করিয়া লইবেন বেগর মোহর চুরি জানিবেন।

প্রকাশক।
শ্রীকাজী সফিউদ্দীন।

বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীবেহারিলাল দের
আদেশানুসারে
দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।
মূল্য /০ আনা মাত্র।

[1863]

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে বিদিতার্থ জ্ঞাত করা যাইতেছে যে "কুলিন হওয়া দায়, মরি বঞ্চনায়" নামক একখানি অভিনব পুস্তক বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি দুই আনা বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি তিন আনা নির্দ্ধারিত হইল। এই পুস্তক যে কোন মহাত্মাদিগের প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সাং আহিরীটোলা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেন।
তারিখ ১২ শ্রাবণ ১২৭০ সাল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৃদ্ধা-বেশ্যা তপস্বিনী

গদ্য।

কোন প্রদেশে চূড়ামণি নামক এক জন প্রসিদ্ধ লম্পট বাস করিতেন। একদা এক তপস্বিনী আসিয়া তাহাকে কহিলেন। মহাশয়! আপনার জয় হউক, অদ্য আপনার আশ্রমে অতিথিনী হইলাম, আহার প্রদানে মদীয় জঠরানল পরিতৃপ্ত করুন। চূড়ামণি তাহার মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন হা! অদৃষ্ট ইনি যে সেই সৌদামিনী, ইতি পূর্ব্বে এক জন বিখ্যাত বেশ্যা ছিলেন, সে যাহা হউক যখন আমার নিকটে তপস্বিনী হইয়াছে তখন এ বিষয়ে বিমুখ হওয়া অতি অকর্ত্তব্য, চূড়ামণি এইরূপ মনে২ বিবেচনা করতঃ তৎক্ষণাৎ তাবৎ আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। তপস্বিনীর রন্ধন-ভোজনের কিয়ৎক্ষণ পরে চূড়ামণি কহিলেন, যে আপনাকে যেন চেন২ করিতেছি আপনার নাম সৌদামিনী না? তপস্বিনী কহিলেন আপনি আমাকে চিনিয়াছেন? যদ্যপি চিনিয়া থাকেন তবে তাহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না। কারণ, পূর্ব্বেই শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন। যথা!

অশক্ত তস্করঃ সাধুঃ কুরু নাচেৎ পতিব্রতা।
রোগেচ দেবতা ভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।।

অতএব এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় তপস্বিনী ব্যতিত আর উপায় কি? চূড়ামণি কহিল যে যাহা হউক এক্ষণে আপনার সহিত স্পষ্টরূপেই আলাপণ হইল অতএব আমার একটি বাসনা পরিপূর্ণ করিতে হইবে। তপস্বিনী কহিলেন আমি যথার্থই কহিতেছি আপনি যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার উত্তর প্রদানে কখনই বিরত হইব না। চূড়ামণি কহিলেন তবে তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মদীয় অন্তঃকরণে আনন্দ বর্দ্ধন কর। তপস্বিনী কহিলেন তবে শ্রবণ করুন।

প্রথম অবস্থা বর্ণন।

ত্রিপদী

শুন শুন মহাশয়, বলি মম পরিচয়,
শ্রবণে শ্রবণ কর দান।

সৌদামিনী মম নাম, বিধাতা হইল বাম,
কাঞ্চন নগরে বাসস্থান।।
জনক কুলিন অতি, ধনে জিনি ধনপতি,
মানেতেও বিখ্যাত ভুবন।
আমি এক কন্যা তার, আমা বিনে নাহি আর,
বড় ছিনু আদরের ধন।।
বয়স্থা দেখিয়া পরে, বিবাহ দিবার তরে,
পিতা মোর চিন্তিত অন্তর।
হয়ে অতি সযতন করি বহু অন্বেষণ,
নাহি পাইলেন যজ্ঞঘর।।
দৈবের শুন২ কর্ম্ম, কার সাধ্য বুঝে মর্ম্ম,
বুড়ো এক আইল বিয়া আশে।
কি করে উপায় নাই, সে পাত্রে আমারে তাই,
সঁপিলেন পিতা অনায়াসে।।
দেখিয়া যে পোড়া মুখ, আমার মনের দুঃখ,
যত ছিল উথলে পড়িল।
বলি হায় ওরে বিধি এই কি তোমার বিধি,
কোন বিধি তোরে বা গড়িল।।
ভাল হে বিচার তব, কি আর অধিক কব,
উত্তমেতে অধম মিলাও।
আমি হে নবীন নারী, তেমতি দিলে কাণ্ডারি,
অবলা বলিয়া নাহি চাও।।
আজি বাদে মরে কাল, তুব্ড়ে পড়েছে গাল,
মাথে চুল যেন শোন নুড়ো।
ললীত গাত্রেয় মাস, বাকি মাত্র আছে স্বাস,
এমন যে জন হয় বুড়ো।।
চলিতে টলিয়া পড়ে, হেন শক্তি নাহি নড়ে,

কবে যায় শমন সদন।
হায় হায় মরি লাজে,   কেমনে এমন কাজে,
প্রবত্ত হইবে বল মন।।
যা হোক কব ভাই,   কুলিনের মুখে ছাই,
কুল কুল করে যত বোকা।
আমি যে কুলের নারী,   বেরলে গৌরব ভারি,
তখন ধরিবে কুলে পোকা।।

পয়ার।

ধিক২ শতধিক কুলিনের কুলে।
এক টুক নাহি সুখ ভুলে তার মুলে।।
এমন কুলের প্রথা করেছে যে বুড়ো।
ইচ্ছা হয় গিয়া তার মুখে দিই নুড়ো।।
যার দোষে কুলিনের কুলবালাগণ।
সদত মনের দুঃখে হয় জ্বালাতন।।
বহু দিন সে জনার হয়েছে মরণ।
তথাপি এখন করে কুল আচরণ।।
এখন তো বহু লোক আছে বর্ত্তমান।
ভুলেও নয়ন তুলে বারেক না চান।।
ভালো মন্দ বিবেচনা নাহি করে কেহ।
চোখ খেগো লোকেদের গেছে বুঝি স্নেহ।।
কত শত ঘটীতেছে অনিষ্ট আচার।
তবু কুল কুল করে একি ব্যবহার।।
জানে না যে কুল খালি অনর্থের মূল।
কুল হেতু নিরয় হইবে নাহি ভুল।।
জগদীশ নারীরে করেছে পরাধীন।
তাই দীনাভাবে লয় করিতেছি দিন।।

নতুবা এ পোড়া দেশের কি হয় এমন।
দেশাচারে সকলেরে করে জ্বালাতন।।
হায় হায় এ দুঃখ কাহারে আর কই।
কি করি উপায় নাই মুক হয়ে রই।।
পরে শুন রসরাজ করি নিবেদন।
অনঙ্গ আসিয়া মোরে ঘেরিল যখন।।
যার শ্বরে জ্বর জ্বর করে কলেবর।
কলি সম কুচ-পদ্ম হৃদি পদ্মোপর।।
তখন আমার মন নাহি মানে হিত।
কিন্তু পতি কাছে আছে কাজে বিপরিত।
অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারি।
ঝর ঝর ঝরে দুটি নয়নের বারি।।
ঘরে পাপ ননদিনী অতিশয় দড়।
তাহার পদেতে করি শত২ গড়।।
ফুকুরে কান্দিতে নাহি ননদির তরে।
উদ্দেশেতে টের পেলে একে শত করে।
ভয়ে ভীত হয়ে কারে কিছু নাহি কই।
মনে২ মনাগুণে সদা দগ্ধ হই।।
ভাবি মনে উপায় নাহিক কিছু আর।
কেমনে অপার দুঃখে হয়ে যাব পার।।
নাবিক নাহিক মোর আমি নব তরি।
কাণ্ডারি বিহীন হয়ে কি রূপেতে তরি।।
তারামণি নামে এক ছিল মম দাসী।
গোপনে তাহার কাছে কহিলাম আসি।।
সে কহিল চন্দ্রাননি ভয় কিবা তার।
উপায় করিব এর না ভাবিও আর।।
সময় পাইলে পরে কহিব তোমায়।

সেজে থেক যেন কেহ্ টের নাহি পায়।।
এতেক বলিয়া দাসী বিদায় হইল।
দুতিন দিবস পরে পুনঃ দেখা দিল।।
হাসিয়া কহিল মোরে শুন সৌদামিনী।
আসিব তোমার কাছে হইবে যামিনী।।
বাটীর তাবৎ লোক নিমন্ত্রণে যাবে।
এমন সময় আর কভু নাহি পাবে।।
সেরে শুরে থেকো ভাই টাকা নিও কিছু।
দরকার হৈলে পরে লেগে যাবে পিছু।।
শুনিয়া দাসীর কথা যায় দিনু তবে।
সে সব বিষয় মোরে কহিতে না হবে।।
প্রহরেক হলে নিশি এস গো হেথায়।
এতেক বলিয়া তারে করিনু বিদায়।।
আমিও আনন্দার্ণবে হইয়া মগন।
করিতে লাগিনু বেশ মনের মতন।।
মনে হল পরিহারি রমণীর রূপ।
বাসনা হইল করি পুরুষের রূপ।।
গায়েতে দোহারা জামা পরিলাম তুলি।
পিঠের উপরে বেণী ফেলিলাম খুলি।।
তেকোচ্চা করিয়া ধূতি পরি কটীদেশে।
দোপাট্টা লইয়া গায় দিইলাম শেষে।।
সাঁচ্ছা ফুলকাটা কায তাজ লয়ে হাতে।
মনের সুখেতে আমি পড়িলাম মাথে।।
রেশমি রুমাল করে লইলাম ছড়ি।
চেইন দিলাম গলে গাঁথা তাহে ঘড়ি।।
গন্ধ দ্রব্য আতর গোলাপ ছিল যত।
গায়েতে মাখিনু পরে নিজ মন মত।।

সারা শোরা হল বেশ বাকী ছিল যাহা।
পুঁটুলি বান্ধিয়া কাছে রাখিলাম তাহা।।
হেনকালে দাসী আসি হল উপনীত।
চিনিতে না পারি মোরে চমৎকিত চিত।
বাক্য নাহি সরে মুখে মিটি২ চায়।
বোধ হয় ভয় বুঝি পলাইয়া যায়।।
আমি কহিলাম দাসী কেন কর ভয়।
আমি সেই সৌদামিনী জানিহ নিশ্চয়।।
দাসী বলে ভাল২ করেছ এ ঠাট।
বুড়া হইয়াছি তবু না পড়ি ও পাঠ।।
যা হোক বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
গোপনে গোপনে চল যাই দুই জন।।
এত বলি গিয়া খিল খুলি খিড়কীর।
হইলাম দুজনেতে বাটীর বাহির।।
যাইতে যাইতে পথে চারিদিকে চাই।
পাছে কেহ দেখে মনে বড় ভয় পাই।।
কাঁপে বুক দুপ দুপ মুখে ধুলা উড়ে।
বলি দাসী যাইতে হইবে কত দূরে।।
দাসী বলে এই দেখা যায় যে ভবন।
কল্য ভাড়া করিয়াছি তোমার কারণ।।
হেথায় লম্পটগণ করে আনাগোনা।
সদত পাইবে সুখ ঘুচিবে বেদনা।।
কহিতে কহিতে দোঁহে হেনরূপ কথা।
অবশেষে উপনীত হইলাম তথা।।
প্রেবেশি গৃহেতে দেখি দ্রব্য নানা মত।
সাজায়ে রেখেছে দাসী প্রয়োজন যত।।
পরে গিয়া বসিলাম পালঙ্গেতে সুখে।

তাম্বুল যোগায় দাসী মনের কৌতুকে।।
এইরূপে থাকি তথা সেবা করে দাসী।
হেনকালে এক জন জিজ্ঞাসিত আসি।।
কহ কহ সুরূপসী শুনি পরিচয়।
কতদিন এখানেতে কিবা নাম হয়।।
শুনিয়া তাহার কথা ভাবি মনে মনে।
কিরূপে কহিব কথা পুরুষের সনে।।
লজ্জায় বদনে বাস দিই আমি যত।
সে আমারে অনুরোধ করে আর তত।।
হেনকালে দাসী আসি কহিল বচন।
না বল উহারে কিছু নূতন এ জন।।
আসিয়াছে সম্প্রতি হইল মাসদ্বায়।
কথায় এখন ইনি বড় পটু নয়।।
যদ্যপি বাসনা তব জিজ্ঞাসিতে আছে।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মম কাছে।।
সে কহিল কি কহিব বাসনা আমার।
উনি মম প্রাণধন আমি কর্ণধার।।
এত বলি কোলে বসাইল লোয়ে মোরে।
অমনি অনঙ্গে অঙ্গ আতঙ্গে সিহরে।।
বলিলাম ছি ছি কিবা কর ছেড়ে দাও।
ধরি পায় ক্ষমা কর মোর মাথা খাও।।
সে কহিল বিধুমুখী কেন কর ভয়।
এখন তো নহে তব ভয়ের সময়।।
এই ত যৌবন তব প্রথম অঙ্কুর।
ফলিবে প্রেমের ফল শ্রম যাবে দূর।।
বাসনা হইবে পূর্ণ দিলে ঘৃতাহুতি।
কহিনু স্বরূপ কথা শুন রসবতী।।

এত বলি কুচপদ্মে কর পদ্ম দিল।
পূজা করি মদনের স্নান করাইল।।
পরে পুনঃ পালঙ্গেতে বসিয়া দুজন।
তাম্বুলাদি আনন্দেতে করিনু ভক্ষণ।।
এরূপেতে রসরঙ্গে যত যায় দিন।
ক্রমেই তাহাতে আমি হইনু অধীন।।
আমিও তাহার কাছে যখন যা চাই।
খুলিতে মুখের কথা তখনি তা পাই।।
বড় ভাল বাসাবাসি হইল দুজনে।
তিলকেতে হারা হই সয়নে স্বপনে।।
তাহাতে বৈভব মোর হইল বিস্তর।
বিখ্যাত হইনু ক্রমে তাবৎ সহর।।
যতেক লম্পটগণ মোর নাম করি।
আসেন আশার আশে দিবা বিভাবরি।।
আমিও ধনের লোভে হইয়া লালসা।
আশেতে তেজিনু পুর্ব্বকার ভাল বাসা।।
নিত্য নিত্য নব রঁস রসিকের সঙ্গ।
প্রবল হইল মনে সুখের তরঙ্গ।।
রাখিলাম দাস দাসী কিনিলাম বাড়ি।
ইয়ারকীতে অতিশয় হল বাড়া বাড়ী।।
নিত্য নিত্য খাসা খাসা নেশা হয় করা।
একবারে তৃণতুল্য দেখিলাম ধরা।।
বগি কি টেরেন্ট ভিন্ন নাহি হয় বার।
পরিধান চিকন অঙ্গেতে চমৎকার।।
একবার সেই জন চোখ তুলে চায়।
কে না বল সে সময় কেনা হতে চায়।।
তখন গরবে গায় আদর না ধরে।

কবি কয় ভাল ভাল জানা জাবে পরে।

দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন।

এই মত দিন মোর যত হয় লয়।
বিবর্ণ হইল বর্ণ পাইয়া সময়।।
কটীদেশ হলো মোটা ভাবি মন দুঃখে।
পিনোন্মত পয়োধর কাঁদে অধোমুখে।।
করেছিনু যত সব অর্থ উপার্জ্জন।
প্রেম অনুরাগে সব হইল নিধন।।
অলঙ্কার আদি সব করিয়া বিক্রয়।
কিছুদিন তাহাতেই দিনপাত হয়।।
এক খানি অঙ্গে আর নাহিক বসন।
যেন তেন প্রকারেন জীবন ধারণ।।
বড়ই ভাবনা মনে হইল আমার।
ঘরে চাল নাই কাল চালি কি প্রকার।।
কি করি তাহাতে আর উপায় তো নাই।
কিরূপে কাটাই দিন মনে ভাবি তাই।।
হায় হায় করি সদা নাহি দেখি চারা।
কাঁচের আশয়ে মণি হইলাম হারা।।
অবশেষে সোনা নামে ছিল প্রতিবাসী।
যাইয়া তাহার কাছে হইলাম দাসী।।
অনু দিন সেবা তার করি অনুক্ষণ।
যোগে যাগে খালি মাত্র কাটাই জীবন।।
তাহাতে ব্যাঘাত পুনঃ দিলেন গোঁসাই।
না বনিতো গালাগালি হইত সদাই।।
তথাপি ছিলাম মন যোগাইয়া তার।

কি করি উপায় মোর নাহি ছিল আর।।
এইরূপে কিছুকাল করিলাম গত।
মনের যে দুঃখ মনে লয় হয় তত।।
একদিন শারীরিক অসুস্থ কারণ।
যাইতে নারিনু সোনামণির সদন।।
পরদিন তথায় করিলে আগমন।
রাগে যথোচিত মোরে করিল ভর্ৎসন।।
মনেতে হইল রাগ ছেড়ে যাই সব।
বাঁকা মুখে ঠেঁটা কথা কত আর সব।।
আমি কহিলাম আর কেন কর জাঁক।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক।।
আকাশে ফেলিতে হেঁশ গায়ে এসে পড়ে।
কুকুরে আদর পেলে কাঁধে আসি চড়ে।।
ভাগ্য করে মানে তোর বাড়ি আমি আসি।
সময়ে তোমার মত ছিল কত দাসী।।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর তাই হেথা রই।
নতুবা কি তোর মুখে এত কথা সই।।
অভিমানে মনে দুঃখে হইয়া মগন।
তখনি সেখান হতে করিনু গমন।।
যাইতে যাইতে পথে মনে ভাবি কত।
হায় বিধি তোমার মনেতে ছিল এত।।
আগে ভাগে সুখ ভোগ বিধিমতে দিয়া।
কি দোষেতে পুনঃ তাহা লইলি হরিয়া।।
এমন হইবে যদি জানিতাম আগে।
তবে কি খোয়াই ধন প্রেম অনুরাগে।।
যা হোক এক্ষণে আর নাহি তার চারা।
অন্ন বিনে ক্ষুণ্ণ দেহ প্রাণে যাই মারা।।

কবি বলে ভাবিলে কি হবে বল আর।
আগেতে উচিত ছিল ভাবনা ইহার।।

তৃতীয় অবস্থা বর্ণন।

এইরূপে মন দুঃখে ভাবি অনুক্ষণ।
কেমনে এমন করি বাঁচিবে জীবন।।
ভাত বিনে ভাবনায় অস্থি চর্ম্ম দেহ।
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাহি হেন কেহ।।
পূর্ব্বের আলাপ ছিল গোলদার সনে।
কাযেই যাইতে হলো তাহার ভবনে।।
অভিমান আদি সব তেজিলাম লাজ।
করিতে লাগিনু সুখে গোলাতেই কায।।
গোল্‌দার মোর প্রতি সদয় হইয়া।
আমারে দিলেন পরে সর্দ্দারণী করিয়া।।
ভাবনা হইতে মুক্ত হই আরবার।
লোকজন যত মোর হলো তাঁবেদার।।
দুঃখের উপরে সুখ একটু না হতে।
অমনি আসিয়া রোগ ধরিল দেহেতে।।
অসুস্থ শরীর তাহে হল অতিশয়।
কোনমতে কিছুতেই সুখ নাহি হয়।।
সয়নে সদত থাকি কি কহিব আর।
কাযে কাযে কায বন্ধ হইল আমার।।
বহুদিন এইরূপে রোগ ভোগ করি।
পরেতে হইনু সুস্থ নানা যত্ন করি।।
কিন্তু না হইল আর পূর্ব্বকার বল।
চলিতে চরণ সদা করে টল টল।।
নড়িতে চড়িতে নারি হল মহা দায়।

বিপদ হইল ভারি করি হায়২।।
পুনঃ ভাবি গুরুদেব যা করে এবার।
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।।
এত ভাবি বাবাজীর আকড়ায় গিয়া।
ভেকধারি হইলাম পাঁচ সিকা দিয়া।।
বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করি বেড়াই তখন।
তাহাতেই হয় মম উদর পুরণ।।
হইতে থাকিল ক্রমে প্রফুল্ল অন্তর।
যথা যাই তথা অতি পাই সমাদর।।
ভালোবাসে গৃহস্থের যত বউ ঝি।
ভুলাইয়া আনি কত কব আর কি।।
নিত্য নিত্য চাল কড়ি অন্ন ধামা ভরি।
তাহাতেই কিছু দিন কষ্ট হতে তরি।।
কবি কহে আগে মজা করেছ যেমন।
তার প্রতি ফল ভোগ হতেছে এখন।।

চতুর্থ অবস্থা বর্ণন।

তার পরে এক জন সন্ন্যাসী মিলিয়া।
তীর্থ দরশনে মোরে চলিল লইয়া।।
গয়া গঙ্গা বারানসী করিয়া ভ্রমণ।
অবশেষে পথে তার হইল মরণ।।
ফাঁফরে পড়িনু আমি উপায় না পাই।
কেমনে যাইব ভাবি পথ চিনি নাই।।
সম্মুখে ভবন এক দেখি পরিপাটি।
লোকে জিজ্ঞাসিতে জানিলাম দেববাটী।।
গমন করিয়া তথা পরিচয় কই।
এসেছি তীর্থেতে আমি সন্ন্যাসিনী হই।।

যাইব পুরুষোত্তমে এই অভিলাষ।
কিছুকাল বাসনা এখানে করি বাস।।
এত বলি তথায় রহিনু কিছু দিন।
ঠাকুরের প্রসাদের হইয়া অধীন।।
পূজার তাবৎ দ্রব্য করি আয়োজন।
বাসনাদি সর্ব্বদাই করি যে মার্জ্জন।।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সদা সুখে থাকি।
একদিন পুজারি বলিল মোরে ডাকি।।
ঠাকুরের চুরি গেছে গহনা গায়ের।
জান যদি বল তুমি সবিশেষ এর।।
নতুবা পুলিসে দিব ডাকি চৌকীদার।
অনুমানে বোধ হয় এ কর্ম্ম তোমার।।
আমি কহিলাম ভাল মন্দ নাহি জানি।
দোহাই ধর্ম্মের সত্য কহিতেছি বাণী।।
ভর্ৎসনায় অতিশয় ভীত হয়ে মন।
তথা হতে শীঘ্রগতি করি পলায়ন।।
তারপরে ভ্রমিয়া বেড়াই কত দেশ।
তোমার নিকটে আইলাম অবশেষ।।
কহিলাম পরিচয় এই ত আমার।
এখন বিদায় কর করি নমস্কার।।
এত বলি তপস্বিনী হইয়া বিদায়।
কবি বলে এইবার করিলাম সায়।।

বেশ্যা কর্ত্তৃক যুবতী দিগের উপদেশ।

যতেক যুবতীগণ, শুনিলে তো বিবরণ,
ঘটে ছিল আমার যে রূপ।

এ পথ সুপথ নয়,　　কেবল বিপদ ময়,
সত্য সত্য কহিনু স্বরূপ।।
কিছু মাত্র নাহি সুখ,　　ফুটি সম ফাটে বুক,
সে অসুখ কি কহিব আর।।
দুখের নাহিক পার,　　সুখে মাত্র হাহাকার,
আনিবার যেন শবাকার।।
পোড়া কাযে কি বালাই,　　বেশ্যার মুখেতে ছাই,
বেশ্যা পথে পথিক যে জন।
বিফল যৌবন তার,　　বহিতে পাপের ভার,
বৃথায় খোয়ায় এ জীবন।।
অতএব নারীগণ　　শুন মম নিবেদন,
যদি চাও আপন মঙ্গল।
থাকো নিজ২ পদে,　　মাজো না কুক্রীড়া হ্রদে,
এড়াইবে যাতনা সকল।।
দেখ২ সাবধান,　　যদি হবে পরিত্রাণ,
রেখো রেখো ঘৃণা কিছু মনে।
হৈও না লালসাধীন,　　হৈওনা আশাতে লীন,
মোজনা কুরীতি নীতি সনে।।
দেখ মনে করি ধ্যান,　　পাপানল দীপ্তিমান,
রহিয়াছে যে পথে যখন।
পতঙ্গ সমান প্রায়　　পোড় না২ তায়,
হারাইবে তা হলে জীবন।।

সমাপ্ত।

হুড়্কো বউয়ের বিষম জ্বালা

নামক নাটক।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেন

প্রণীত।

শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭০।

মূল্য /১০ আনা মাত্র।

[1863]

হুড়্কো বউয়ের বিষম জ্বালা

রঙ্গভূমি

প্রথমাঙ্ক

(যবনিকা উত্থনানন্তর)

(নিষ্কর্ম্মাপুরে ঘোষেদের বাটীর প্রলোভ বাবুর পুত্রবধূ
নলিনী ও তাহার সহচরি রমণীর প্রবেশ।)

নলিনী। সহচরি আজগে আমার মনটা হু হু করে উট্‌চে ক্যান, বোধহয় মা, বাপের বিপদ বা হয়ে থাকবে, নইলে মনটা উড়ু উড়ু করবার কারণটা কি?

রমণী। ক্যান শ্বশুর শাশুড়ীকে বলে একবার বাপের বাড়ী গিয়ে মা-বাপকে দেখে আয় না, না হয় একজন লোক দিয়ে খবরটা জেনে পাঠা।

নলিনী। না ভাই ওকথা বলোনা, ওকথা বল্লে অনর্থ হয়ে যাবে, ননদীকে তো জান, তিনি একে পেলে আরে চায়, বাবা, তার নামে গায়ে জ্বর আসে, আবার তার ভাইও তেন্নি, এক বার শুনলে তো হয়। তাহলেই আমার দপা সারবে, এখন উপায় কি করি বল্ দেখি, আমি যে বিষম বিপদেই পড়লেম।

বল বল সহচরি ইহাতে কি রূপ করি
কেমনে দেখিব বাপ মায়।
ব্যাকুল হতেছে প্রাণ কিছুই নাহিক জানি
অনুমানি ঘটেছে কি দায়।।
এসেছি অনেক দিন বারি ছাড়া যেন মীন
তদ্দ প্রায় আছি এই বাসে।
হাহা করি দিন যায় চাতকি পাতকি প্রায়
নিরূপায় উপায় না আসে।।
শাশুড়ি পাপিণী প্রায় ননদী নাগিনী তায়
পতি জিনি কালান্তের কাল।

যদি কোন কথা কই　　তবে যেন চোর হই
অমনি খাইতে হয় গাল।।
কি করি অধিনী হই　　কাযেই সহিয়া রই
তাহে আরো মনোদাস হয়।
আমি যেন কাঙ্গালিনী　　পড়ে থাকি একাকিনী
দিনাবেশে দিন করি লয়।।

রমণী। ক্যান বল্‌তে কি মুকে বাকরোধ ধরেচে নাকি, তা বলতে পারিশ না না হয় আমিই কাল কথার পিঠে কথা দিয়ে বল্‌বো, তার আর ভাবনা কি, আজকের দিনটা সবুর কর, কাল এর বিহিত কর্‌বো।

নলিনী। না ভাই তা হবে না, বল্লে একুল ওকুল দুকুল যাবে, মাজে থাক্‌তে জাতো যাবে পেট ভরবে না, সে কিছুই নয়, এমন একটা উপায় বল্‌তে পারিশ, যে দুদিক বজায় থাকে।

রমণী। কৈ ভাই এমন তো কিছু দেখ্‌তে পাই নে।

নলিনী। ওহো, আমি ভাই একটা ঠাউরেচি, তুই যদি কাকেও না বলিশ তবে বলি।

রমণী। হাঁ, তাকি বল্‌তে পারি, তুই বলনা আমার প্রাণ গেলেও প্রকাশ হবে না।

নলিনী। আমি বলছিলুম কি, দেখ আমার আর এখানে একদণ্ডও মন টেকে না, বাপের বাড়ী যেতে চাইলেও, যেতে দেয় না, আমি আজ রাত্রিরে পালিয়ে যাব, তা তুই কি বলিশ।

রমণী। না ভাই, আমি তোর ও সব কথা-বাত্রায় নাই তুই যা জানিশ তা করগে যা, পরে লোকে বল্‌বে ওই ছুঁড়ির পরামর্শ শুনে আমার বউ পালিয়ে গিয়েচে, শেষকালে কি আমি দোষের ভাগি হব।

নলিনী। আমার তোর ভয় কি, তুই বল্লিই তো হবে আমি জানিনে, তাতে আর তোর কি করবে।

রমণী। তবে তোর মনে যা আছে তা করগে, আমি এখন যাই।

(রমণীর প্রস্থান)

(নলিনী স্বচিন্তিত হইয়া) হায় এখন কি করি, সঙ্গিনী ছুঁড়িও ভয়ে পালালো, এখন

প্রায় রাত্রি উপস্থিত, যাব কি না যাব, তা কিছু স্থির কর্‌তে পাল্লেম না, যা হগ এই সময় বৈতো সময় নাই, না হয় এই বেলাই যাই।

রবির ছবির ছটা, ক্রমে হয়ে নাশ।
গগণে কুমদী নাথ, হইল প্রকাশ।।
আইল গোধুলি কাল, লোকে জ্বালে দীপ।
তাহাতে দৈবাৎ বৃষ্টি হয় টীপ টীপ।।
স্বপষ্ট নজর বড় নাহি চলে আর।
যে যার চলিলো সবে ঘরে আপনার।।
নলিনী ললনা হেন পাইয়া সময়।
যাত্রা করিলেন যেতে জনক আলয়।।
সহজেতে হয় ধনি সুন্দরির শেষ।
তাহাতে মনের মত করিয়াছে বেশ।।
চলিয়াছে রূপে আল করি দশ দিক।
চঞ্চল চরণে মণি ফণিহারা ঠিক।।
পথ পরিশ্রমে বহে ঘনঘন শ্বাস।
সভয়ে সুন্দরী অঙ্গে না সম্বরে বাস।।
এলায়ে পড়েছে বেণী পাগলিনী প্রায়।
যায় যায় পাছুপানে ফিরে২ চায়।।
হেনকালে চৌকিদার তাহারে দেখিল।
দাড়াও দাড়াও বলি কহিতে লাগিল।।
তাড়াতাড়ি চৌকিদার উত্তরিয়া তথা।
কহিতে লাগিল তারে রোষ ভরে কথা।।
একাকি সুন্দরী কোথা করেছ গমন।
কিবা নাম কোথা তব হয় নিকেতন।।
সত্য করি মোর কাছে কহ পরিচয়।
নতুবা ফটকে দিব, কহিনু নিশ্চয়।।
চৌকিদারে সম্মুখেতে নিরক্ষিয়া ধনি।

ভয়েতে চমকি প্রাণ উড়িল তখনি।।
থর২ কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
রাহু দেখি শশী যেন মলিন হইল।।
ভাবে মনে এইবার উপায় কি করি।
এমন বিপদ হতে কি রূপেতে তরি।।
এত ভাবি কহে ধনি, শুন চৌকিদার।
ঐ দেখা যায় দেখ, ভবন আমার।।
যাইতে জনকালয়ে করেছি মনন।
ছেড়ে দাও পথ শীঘ্র আছে প্রয়োজন।।
চৌকিদার কহে ভাল কহিলে বচন।
ছাড়িতে তোমারে আমি না পারি এখন।।
থানায় যাইতে হবে কহিলাম সার।
এত বলি করে দুটি ধরে চৌকিদার।।
শিহরি সুন্দরী পুনঃ কহিতেছে তায়।
কি কর কি কর ছিছি ছুওনা আমায়।।
অবলা সরলা একে কুলবালা হই।
ছেড়ে দাও ধরি পায় অপরাধী নই।।
এই দেখ অঙ্গে মোর আছে যে ভূষণ।
ইচ্ছায় তোমারে আমি করিনু অর্পণ।।
এত বলি খোলে ধনি অঙ্গ অলঙ্কার।
অভরণ দৃষ্টে শিষ্ট হলো চৌকিদার।।
হেন কালে সেই পথ দিয়া সারজন।
গমন করিতেছিল রোঁধের কারণ।।
সার্জনে নিরক্ষি লাগে, চৌকিদারে ভয়।
অমনি ফিরায়ে মুখ কটু কথা কয়।।
সাবধান ও কথা বলো না মুখে আর।
পড়েছ আমার হাতে নাহিক নিস্তার।।

আস পাস কথা তোর আর না শুনিব।
অবশ্য থানাতে আমি লইয়া যাইব।।
এত বলি পুনঃ তার ধরি দুটি পাণি।
অমনি চলিল লয়ে অবিলম্বে টানি।।

(সারজনের প্রবেশ)

সারজন। ওইউ চৌকিদার ক্যা হ্যায়।

চৌকি। (ছেলাম করিয়া) খোদাবন্দ একঠো রেন্ডি লোক ভাগ্‌তা ওসকো পাক্‌ড়া হায়।

সারজন। আচ্ছা উসিকো সাত, আউর কৈ হায়।

চৌকি। নেই আউর কৈ হায় নেই।

সারজন। সৃছ কহ।

চৌকি। হাম তো আউর কিসিকো নেই দেখা।

সারজন। (আলো ধরিয়া) এসকা আংমে বহুত চিজ-উজ হায়, এসকো হামরা সাত২ থানামে লেয়াও।

চৌকি। যো হুকুম, চলগো সাহেব তোমাকে সঙ্গে২ যেতে বল্লে।

সারজন। (থানায় প্রবেশ করিয়া) হেঁগা টোমার নাম কি, টুমি একলা য়েটো রেটে কোটায় যাচ্ছিলে, টুমি সট্টি করে বল, তোমার ভয় নাই, টোমাকে ছেড়ে দেব।

নলিনী। (ভিত হইয়া নিস্তব্ধ)

সারজন। বলো না বল, টোমার ভয় কি।

নলিনী। (মনে২) ওমা, আমি কি ঝকমারি করিছিনুন মা, আমি মেয়ে মানুষ হয়ে ক্যামন করে সাহেবের সঙ্গে কথা কব এর চেয়ে যে মরণ ভাল। (প্রকাশ্যে) এঁ ওঁ।

সারজন। টোমার নাম কি।

নলিনী। আমার নাম নলিনী।

সারজন। আচ্ছা টুমি এত রাট্টিরে একলা কোটায় যাচ্ছিলে।

নলিনী। আমি বাপের বাড়ি যাচ্ছিলুম।

সারজন। টবে টুমি থানায় থাক, টোমার বাড়ির লোক এশে নিয়া যাবে, টোমার ভয় নাই।

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

(প্রলোভ বাবুর বনিতা কাদম্বিনী ও তাহার কন্যা বিদুর প্রবেশ)

কাদম্বিনী। (প্রভাতে গাত্রখান পূর্ব্বক) ওমা বিদু বউ কোথায় গেল, বউকে দেখতে পাইনি যে, তুই কিছু জানিশ।

বিদু। (অবাক হইয়া) ওমা আমি তো এমন কোতাও দেখিনি, রাত্রিরের মধ্যে বউ কি উড়ে গ্যালো, আটকুড়ির ব্যাটীকে যে কাল রাত্রিরে দেখেচি গা, যাহগ, সে বেটী বাপের বাড়িই পালিয়েচে, তার আর কোন সন্দেহ নাই, আমি এক দিন ও কথা শুনেছিনুন, কিন্তু আজ কালের মেয়ে গুণদের বুকের পাটা দেখে আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে জায়, বেটীদের কিছু ভয় নাই, যে একলা মেয়ে মানুষ হয়ে পালিয়ে গ্যালো।

পয়ার।

মেয়ের বুকের পাটা এত ভালো নয়।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে নাহি রাখে ভয়।।
একে নিশা অন্ধকার তাহে ঘোরতর।
কেমনে পালালো শুনে লাগিতেছে ডর।।
ধন্য ধন্য বলি তারে ধন্য ধন্য বলি।
এরাই অনাশে পারে করিতে সকলি।।
কালের স্বভাব গুণে ঘটিতেছে যত।
বাচিল দেখিতে পাব আর কত শত।।
হায় হায় এখন সে সব ঘুচে গেছে।
নূতন২ দাড়া সকলে শিখেছে।।
খেয়েছে লাজের মাথা জনমের তরে।
গুরুজনে হেরে নাহি অম্বরে সম্বরে।।

ভাতারেরে ভ্যাকা করে থাবা দিয়া মুখে।
শত দোষে দুষি হয় দাড়ায়ে সম্মুখে।।
তথাপি তাহার মুখে নাহি সরে বাক্।
অবাক হইয়া মোরে, লাগিয়াছে তাক্।।
আমরাও হুই বটে একালের মেয়ে।
কোন কালে ভাল মন্দ নাহি দেখি চেয়ে।।
এই দেখ এখানেতে যত দিন রই।
মুখ ফুটে কারে কভু কিছু নাহি কই।।
বউ মত হতো যদি স্বভাব আমার।
তবে কি থাকি তো মম এমন আকার।।
যা হউক গড় করি এ বোয়ের পায়।
জন্মে এ বাতাস যেন নাহি লাগে গায়।

কাদম্বিনী। বলি বিদু এখন কি করি বল দেখি, সে আবেগের বেটী তো কোথায় গেলো, তার তো কিছু ঠিকানা হল না, এখন কর্ত্তাকে বলিগে, নৈলে তো আর উপায় নাই।
(কর্ত্তার নিকট গমন করিয়া)
বলি কিছু শুনেচো কি, তোমার সর্ব্বনাশ হয়েচে যে।

প্রলোভ। কি ব্যাপারটা কি, তোমার রকম দেখে যে আমার প্রাণটা উড়ে গেলো।

কাদম্বিনী। আর কি বলবো, সংসার পানে তো একবার চেয়ে দেখ না, যত ঝোক্ মাগির ঘাড়ে দিয়ে বোসেচো, আমারি যত জ্বালা।

প্রলোভ। কেন কি হয়েচে বল্না ছাই।

কাদম্বিনী। আর আমার মাথা মুণ্ডু কি বলব, বউ ছুঁড়ি কাল রাত্রিরে কোথায় পালিয়ে গিয়েচে, মোল কি বাচলো কিছুই বলতে পারিনে।

প্রলোভ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হা কি সর্ব্বনাশ, আমার উচ্চ মুখ একেবারে নিচু করে দিলে আমি কেমন করে লোকের কাছে মুখ দেখাবো। একে বুড় হয়েচি, তাতে মেয়ে গুলোর জন্যে ভাবতে২ প্রাণটা গেলো।

পয়ার।

ছিছি কি লাজের কথা শুনিলাম আজ।
কেমনে দেখাব মুখ লোকের সমাজ।।
যদি ছুঁড়ি থানাতেই হয় গেরেপ্তার।
এখনি ত মোর মান হবে ছারখার।।
একেবারে যত গর্ব্ব সব খর্ব্ব হবে।
মোরে চেয়ে কত লোক কত কথা কবে।।
একি সর্ব্বনাশ হলো একি সর্ব্বনাশ।
না রবে গোপনে পরে, হইবে প্রকাশ।।
বুড় হইয়াছি আমি গেল তিন কাল।
জানিনে শেষেতে এত ঘটিবে জঞ্জাল।।
হুড়ুক হয়ে পলাইসে, আগে নাহি জানি।
তা হলে এমন বউ ঘরে নাকি আনি।।

(ক্ষণেক চিন্তিত হইয়া) যা হক আর বিলম্বে কাজ নাই শিগ্‌গির করে ছেলেটাকে ডেকে দাও।

কাদম্বিনী। তবে ডেকেছি, ওরে নীলমণি তোকে একবার কর্ত্তা ডাকচে শুনে আয়।

(নীলমণির প্রবেশ)

নীলমণি। বলি আমাকে ডাকচেন কেন?

প্রলোভ। নীলমণি বাপু কালকের ব্যাপারটা তো শুনেচো, কালকে বউ মা কোতায় পালিয়েচে, তার কি করা যায় বল্‌ দেখি।

নীলমণি। মশাই তার আর কি হবে, সে বাপের বাড়ীই পালিয়েচে, তার খাবার ভাবনা কি।

প্রলোভ। নাহে তুমি ছেলেমানুষ কিছু বোজনাতো যদি যেতে২ থানায় গ্রেপ্তার হয়ে থাকে তা হলেই তো মুশকিল, এখনি মহা গোলযোগ হয়ে উঠবে, তুমি একবার শীগ্‌গির করে থানায় গিয়ে খবরটা জেনে এশো।

নীলমণি। (মনে২) তবেই তো শাল্লে, এমন বিপদে কি মানুষ পড়ে, যাহ্গ কর্ত্তার কথাটা ঠেল্‌তে পারিনে। (প্রকাশ্যে) তবে কি একবার থানায় যাব, কি তার বাপের বাড়ী যাব।

প্রলোভ। আগে থানায় যাও দেখি।

নীলমণি। তবে চল্লুম।

(থানার দ্বারে উপস্থিত ও চৌকিদারকে সম্বোধন করিয়া)

নীলমণি। বলি চৌকিদার কালকের খবর কিছু বলতে পার।

চৌকি। হাঁ কাল রাতমে একঠো রেন্ডি পাক্ড় গিয়া আজ ওসকো পুলিসমে চালান হোগা।

নীলমণি। আচ্ছা উসিকো সাত মুলাকৎ করনেকো কৈ ফিকির হ্যায়।

চৌকি। হাঁ সাহেবকো পাশ জানেসে মুলাকাত হোগা।

নীলমণি। সাহেব আবি ঘরপর হায়।

চৌকি। হাঁ ঘরপর হায় ভিতরমে যাও।

নীলমণি। (নিস্তব্ধে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক সারজনকে দৃষ্টি করিয়া) গুড মরনিং স্যার।

সারজন। হোয়াড্ ডু ওয়ান্ট।

নীলমণি। স্যার মাই ওয়াইফ ওয়াইফ (বলিয়া নিস্তব্ধ)।

সারজন। (ক্রোধ করিয়া) ওইউ, ডনটেল ইংলিস ইশ্পিচ, ইউ টেল বেঙ্গলি ল্যাঙ্গওইজ।

নীলমণি। (ভিত হইয়া) মশাই কাল রাত্রিরে আমার স্ত্রী পালিয়ে বাপের বাড়ী জাচ্ছিলো, আপনি তাকে গ্রেপ্তার করেচেন, আমি তাকে নেজেতে এসেচি।

সারজন। নেই২ সো হোগা নেই, আসামী নেই ছোড়ে গা। (ক্ষণেকক্ষণ পরে) আচ্ছা টোমার স্ত্রীর নাম কি।

নীলমণি। আমার স্ত্রীর নাম নলিনী, আমার ঠাকুরের নাম প্রলোভচন্দ্র ঘোষ।

সারজন। ওহো, প্রলোভবাবুকো হামারা মালুম হায়, আচ্ছা থোড়া হিঁয়া বৈঠ। (বাহিরে আসিয়া) জমাদার হিঁয়া আও।

(জমাদারের প্রবেশ)

জমাদার। ছেলাম খোদাবন্।

সারজন। দেখো কাল রাতমে জো রেন্ডিলোক গ্রেপ্তার হায় উসকো লেকে বাবুকে

সাতমে যাও আউর আচ্ছা রকম তজবিজ করকে, চিজ উজ যে কুচ হায় সব ওসকো দিজ।

জমাদার। জো হুকুম।

(জমাদার ও নলিনী নীলমণির বাটীতে প্রত্যাগমন)

প্রলোভ। (জমাদারকে দ্বারে দৃষ্টি করিয়া) এই যে জমাদার সাহেব আশ্চে, ভালই হয়েচে, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ আছে।

জমাদার। কি গো প্রলোভ বাবু, তোমারি পুত্রবধূ নলিনী নাকি, বেশ তবে ভাল আছ তো।

প্রলোভ। আর যেমন দেখচো, আর তো তোমার সঙ্গে দেখা হয় না, সে সব দিন গেচে হে।

জমাদার। যা হোক মশাই এই তোমার পুত্রবধূর যিনিশপত্র দেখে শুনে নাও। আমরা চল্লেম।

প্রলোভ। তোমার কাছে আর কি দেখবো।

জমাদার। না তবু একবার দেখে নাও, আমাদের যেমন দস্তুর আছে।

প্রলোভ। আচ্ছা তুমি যাও তোমার আর সে ভয় নাই।

(জমাদারের প্রস্থান)

নীলমণি। (বাটীর ভিতর নলিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) হেরে হারামজাদি কাল কোতায় পালিয়ে ছিলি, তা জানিসনে (এই বলিয়া উত্তম রূপে প্রহার পূর্ব্বক ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া ও নীলমণির প্রস্থান)

(নলিনীর স্বকাতরে খেদ)

হায় হায়, নিরূপায় কব আর কায় হে।
গেল প্রাণ, নাহি ত্রাণ, বাচি কিসে তায় হে।।
একি দেশ করে দেশ, অবলা মজায় হে।
দয়া নাই, ভাবি তাই, একি হলো দায় হে।।
দুরাচার, দেশাচার, তাহাতে জ্বালায় হে।
নারী পক্ষ, করি লক্ষ, বিপক্ষ ঘটায় হে।।

নারী জন্ম, কি অধর্ম্ম, শত্রু পায় পায় হে।
ফণি যিনি, ননদিনী, আসিয়া দংশায় হে।।
নহে দুষি, তবু রুষি, পতিরে জানায় হে।
একি ভ্রান্ত, শুনি কান্ত, কৃতান্তের প্রায় হে।।
সৃষ্টি ছাড়া, হেন দাড়া, না দেখি কোথায় হে।
হায় হায়, নিরুপায়, কব আর কায় হে।।

এদেশ এদেশ নয় সদা দেশে ভরা।
অন্তরে অন্তরে সবে করিয়াছে জ্বরা।।
বিশেষ রমণী পক্ষে আরো হয়ে কাল।
ঘেরেছে কামিনীদল পাতি মায়া জাল।।
অধীনর্থ শৃঙ্খলেতে করিয়া বন্ধন।
অজ্ঞান অনল জ্বালি করিছে দাহন।।
সে জ্বালা বিষম জ্বালা কিবা কর আর।
সহ্য করিবারে নারে করে হাহাকার।।
লাজ খেয়ে মুখ ফুটে দুঃখ নাহি বলে।
দিবা নিশি মনে মনে মনানল জ্বলে।।
তথাপি তাহার মনে নাহি দয়া লেশ।
হায় হায় একেবারে গিয়েছে এদেশ।।
করিয়াছে ষটতায় সুশিক্ষা সুন্দর।
রোধা-বোধ রোধ মাত্র নিরস অন্তর।।
কথায় কেবল মাত্র কাটে হেন হীরে।
রমণী কণ্টক পানে নাহি চায় ফিরে।।
অধিনী বলিয়া স্নেহ না করে প্রকাশ।
ইহাতেই সকলের হয় সর্ব্বনাশ।।
দেখ কুলিনের আছে তুলবালা যত।
নিয়ত তাদের দুখ অন্তরেতে কত।।

বালিকা কালেতে যারা হইয়াছে রাঁড়।
দুঃখেতে তাদের হয় ভাজা ভাজা হাড়।।
যে সব নারীর কান্ত নাহি থাকে বাশে।
তাদের যে গতি নাহি লেখনিতে আশে।।
এসকল দোষে কিসে বাঁচে নারিগণ।
জিজ্ঞাসি হে বল বল যত বিজ্ঞগণ।।
মনের গোচর পাপ নাহি শাস্ত্রে কয়।
জেনে শুনে তবে কেন করে মহাশয়।।
জেগে নিদ্রা গেলে পরে কি হইবে বল।
অনিষ্ট কেবল তাহে ফলিবেক ফল।।
তাই বলি নিদ্রা ভাঙ্গি উঠ জ্ঞানী গণ।
দেশাচার হতে সবে করহ মোচন।।
সৌগন্ধে ভরুক দেশ এড়াই যাতনা।
সত্য কহিলাম মোর মনের বাসনা।।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

লুক্‌য়ে পিরীত্‌ কি লাঞ্ছনা।

আদ্যরসাশ্রিত কাব্য

শ্রীনন্দলাল দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা: ১৭৮৫।

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

[1863]

লুক্য়ে পিরীত্ কি লাঞ্ছনা

বসন্তে যৌবন প্রাপ্তা প্রকৃতি সুন্দরী।
রূপের মাধুরী কিবা আহা মরি মরি।।
নবীন পল্লবে শোভে তরুরাজী যত।
প্রস্ফুটিত পুষ্প পুঞ্জে মুঞ্জু শোভা কত?।।
সুবাস ভাণ্ডার তার করিয়া হরণ।
সঞ্চারে মধুর মন্দ মলয় পবন।।
স্পর্শে হর্ষে মুনি কায় লোমাঞ্চিত হয়।
কামের পরম প্রিয় মাধব সময়।।
হাস্য মুখে কমলিনী ভাসিতেছে জলে।
বদন চুম্বিছে অলি মধু পান ছলে।।
প্রিয়া মনে শ্রেণী বান্ধি মরাল বিহরে।
শ্বেতপদ্ম মালা যেন শোভে সরোবরে।।
মধুর পঞ্চম স্বরে কুহরে কোকিল।
বিদরে বিরহী হৃদি শিহরে অখিল।।
সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, ক্ষোভন।
স্তম্ভনাদি পঞ্চশর করিয়া গ্রহণ।।
ভ্রমিছে কৃষ্ণের সুত শাসিয়া মেদিনী।
বাঁচে কিসে বিরহিনী কুলের কামিনী।।
অকলঙ্ক শশীমুখী সম্মূর্ণ যৌবনা।
হেমলতা নামে অতি ধনী কুলাঙ্গনা।।
স্বভাবে সুন্দর চারু চম্পক বরণ।
বিপুল নিতম্ব ভারে গমনে বারণ।।
কটী ক্ষীণ, কুচ পীন, রক্তিম অধর।
নিবিড় নীরদ নীল নিন্দিত চাঁচর।।

কিন্তু হায়! বিনোদিনী বিধাতা বঞ্চিত।
অভাগিনী ভাগ্যে সুখ ছিল না কিঞ্চিৎ।।
বালিকা সময়ে বালা হারাইয়া পতি।
সদা রহে শূন্য মনে সকাতরা অতি।।
বসন্তের আগমন দেখিয়া সুন্দরী।
নিয়ত কেবল উঠে শিহরি শিহরি।।
কথঞ্চিৎ বঞ্চে দিবা ভাজুদের সনে।
পরশ প্রমাদ ঘটে নিশা আগমনে।।
একাকিনী অভাগিনী পালঙ্ক উপরে।
বিকারের রোগী যেন ছট্‌ফট্‌ করে।।
নিদ্রা নাহি নয়নে শয়নে মহাদুঃখ।
ফুল্ল নেত্র নলিন, মলিন চাঁদমুখ।।
চাহিয়া গগণ তারা স্থির আঁখি তারা।
বদন ভাসিয়া বহে তারাকারা ধারা।।
একদা রমণী মণি কষ্ট নষ্ট তরে।
বৈকালে উঠিল গিয়া অট্টালিকা পরে।।
একাকিনী বিরহিনী সঙ্গে নাহি কেহ।
মলয় সমীর স্পর্শে শিহরিল দেহ।।
পুষ্পশরে বিন্ধি হৃদি হইল চঞ্চল।
জ্বলিল অন্তর মধ্যে প্রেমের অনল।।
ভাবে ধনী বৃথা আমি ধরি এ জীবন।
বৃথা এই রূপরাশি, বৃথায় যৌবন।।
চাহিয়া কুলের মুখ ভেসেছি অকূলে।
বিরহে বিগত প্রাণ কি হবে এ কুলে।।
আহা! যদি পাই কোন রসিক রঞ্জনে।
ভজিব, মজিব প্রেমে, কি করে গঞ্জনে?।
চন্দ্রাননী চিন্তি হেন ভ্রমে ইতস্তত।

কপোত বিহনে যেন কপোতী বিব্রত।।
সেই পল্লিবাসী এক ভদ্রের তনয়।
ছাদের উপর সেও ভ্রমে সে সময়।।
পরম সুন্দর যুবা অভেদ মদন।
তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ ছটা, পূর্ণেন্দু বদন।।
বহু গুণে গুণময়, রসিক, চতুর।
নয়নে সঙ্গতি হৈল উভয়ে অদূর।।
তরুণীর রূপ রাশি করি দরশন।
একেবারে বিমোহিত তরুণের মন।।
তরুণী তরুণ রূপ দেখে যতবার।
পলক ফেলিতে তত নাহি পারে আর।।
নব তৃণ হেরি যথা ধেনুকুলাকুল।
রমণী রমণ তরে তারি সমতুল।।
মনে গণে বুঝি আজি বিধি অনুকূল।
অকূল সাগরে তাই মিলাইল কূল।।
যদি হায়! পাই এই নবীন নাগরে।
দুহেঁ মিলি সুখে ভাসি প্রেমের সাগরে।।
আশ্রয় করিয়া এই প্রেম কর্ণধার।
বিরহ-বারিধি-বারি হেলে হই পার।।
রসিক রতন যুবা বলে আহা মরি!।
দেখিলাম নেত্রে আজি কার এ সুন্দরী।।
রমণীর শিরোমণি, কিবা রূপবতী।
কামে ত্যাজি একাকিনী এসেছে কি রতী।।
কিবা শশী খসি আসি উদয় ভূতলে।
কিম্বা স্থির সৌদামিনী ত্যাজি মেঘদলে।।
অথবা এ জীবিত সরসীরুহ হবে।
এমন লাবণ্য কোথা মানুষে সম্ভবে?।।

যদি পাই এ রতনে প্রাণপণ দিয়া।
কিনিব পিরীতি নিধি সর্ব্বস্ব অর্পিয়া।।
উভয়তঃ মনোমধ্যে চিন্তা এই মত।
নয়ন, বদন, করে ভঙ্গি করে কত।।
কিন্তু হায়! ক্রমে ক্ষিতি তিমিরে পুরিল।
নিরাশা মনের দুঃখে উভয়ে উলিল।।
জাগ্রত উভয় রূপ হৃদে পরস্পর।
নিশায় তটিনী নীরে যেন শশধর।।

তরুণ তরুণী তরে, সারা নিশা চিন্তা করে,
অন্তরে নিরাশ নাহি হয়।
ভাবে মনে এ নবীনা শুনিয়াছি পতি হীনা
মিলন তো অসম্ভব নয়।।
দেখিব যতন করি যদি পাই এ সুন্দরী
যতনে রতন লাভ বলে।
সাহস বান্ধিয়া মনে পর দিন সংগোপনে
নাগর নাগরী তত্ত্বে চলে।।
সেই ধনাঢ্যের দাসী মুখে মৃদু মন্দ হাসি
গলে হেলে, হেলে দুলে যায়।
রঙ্গিণী তাহার নাম ডাকি তারে গুণধাম
হাস্য আস্যে কহে অভিপ্রায়।।
"ও রঙ্গিণী চাও ফিরা আমার মাথার কিরা
আছে এক কথা তোর সনে।
যদি নাহি কর ছল স্বরূপে সকল বল
যা চাহিবি দিব এইক্ষণে।।
তোদের বাটীতে, ধনী, প্রফুল্ল পঙ্কজাননী
কেবা সে যুবতী রসবতী।

হেরিতে হয়েছে প্রাণ সর্ব্বস্ব করিব দান
পার যদি মিলাতে সম্প্রতি।।"
শিহরিয়া কহে দাসী ও কথা না ভাল বাসি
সে যে স্বামীকন্যা হেমলতা।
বিষম এ কথা তায় কখন কি বলা যায়
সবে জ্ঞাত তার যে সততা।।
পুনশ্চ তরুণ কয় উচিত তোমার নয়,
ও রঙ্গিণী কহিতে এমন।
সর্ব্বস্ব দিলো তোরে পরিত্রাণ কর মোরে
সে বিহনে রহেনা জীবন।।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কহে দাসী রসবতী
রসরাজ, ধৈর্য্য ধর মনে।
আমার ক্ষমতা যত দেখিব হে সাধ্যমত
পারি যদি ভুলাতে সে ধনে।।

সঙ্গোপনে আসি দাসী হেমলতা ঘরে।
হাস্যমুখে কহে কথা সুমুখী গোচরে।।
"চন্দ্রমুখী এ তোমার কিবা আচরণ।
কি করিলে ছাদে কাল হয় কি স্মরণ?।।
কারে দেখি হেসেছিলে কত্ত রসবতী"।
"সে কি গো রঙ্গিণী" বলি চমকে যুবতী।।
দাসী কয়, রসময়ী কেন কর ছল।
আদ্য অন্ত, বিনোদিনী, জানি গো সকল।।
ও বাড়ির ছোটবাবু ভুবনমোহন।
করিতেছিলেন একা পবন সেবন।।
দেখিয়া তাহারে, ধনী চাহিয়া রহিলে।
নয়ন ভঙ্গিতে কত সঙ্কেত কহিলে।।

দেখেছি সকলি, আর লুকাইবে কারে?।
"চুপ চুপ" বলি বালা স্তব্ধ করে তারে।।
বলে, ও রঙ্গিণী, কেহ নাহি ছিল তথা।
দেখেছ বলিছ তুমি মিথ্যা এই কথা।।
আমার মাতার দিব্য, সত্য বল মোরে।
ভুবন কি কোন কথা কহিয়াছে তোরে।।
দাসী কয় সে কথায় কায কি সুন্দরী।
তোমার যৌবন দেখে আমি খেদে মরি।।
যৌবনে রমণ বিনা বৃথায় জীবন।
কর্ণধার বিনা বৃথা তরণী যেমন।।
কার তরে বহ, ধনী, যৌবনের ভার?।
হবে কি মরণ কালে, সাক্ষী সে তোমার?।।
বুঝিয়া বাক্যের ছল কহে বিনোদিনী।
রঙ্গরস রেখে দিয়া বল লো রঙ্গিণী।।
সহায়তা আমার কি করেছে মদন।
আছে কি আমার প্রতি ভুবনের মন?।।
আমারে যেমন কাম বিন্ধিয়াছে শরে।
বিন্ধিছে কি সেই মত তাহার অন্তরে?।।
পুনঃ রঙ্গে রঙ্গিণী কহিছে সঙ্গোপনে।
কি দিবে আমায় যদি মিলাই সে জনে।।
হেমলতা কহে তোরে অদেয় কি তবে।
প্রাণ দিলে ঋণ নাহি পরিশোধ হবে।।
অতঃপর পত্র এক লিখি সমাদরে।
সপিল দাসীরে ধনী অর্পিতে নাগরে।।
শিখিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যা কুল কন্যাচয়।
প্রেম লিপি লিখনেই সুনিপুণা হয়।।
সঙ্কেতে লিখিল তাহে "ওহে গুণমণি।

যখন হইবে আজি দ্বিযাম রজনী।।
অন্তঃপুর দ্বার দেশে আছে সরোবর।
আসিবে তথায় নাথ, গুণের সাগর।।
একান্তে অধিনী তোমা অপেক্ষিয়া রবে।
মিলনান্তে, কান্ত, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"।।
পত্র দিয়া দাসীরে প্রফুল্ল রসবতী।
মিলন চিন্তায় মন সচঞ্চল অতি।।
পুরুষ কেমন কভু জানে না অঙ্গনা।
প্রেমের বিষয়ে হৃদে কতই কল্পনা।।
হৃদি করি গুরু২ কম্পিত শরীর।
উড়ু২ করে প্রাণ সদাই অস্থির।।
দিনমণি প্রাত ধনী চাহে প্রতিক্ষণ।
চন্দ্রমা উদয় মাত্র মনে প্রতিক্ষণ।।
রবি প্রতি কহে রামা, নলিনী নায়ক।
জানতো বিচ্ছেদ যত যন্ত্রণা দায়ক।।
ত্বরা চল অস্তাচল পদ্মিনীর স্বামী।
পাইয়া হৃদয়কান্তে জুড়াই হে আমি।।
এই মতে যুবতী যামিনী আশা করে।
দাসী গিয়া পত্র দিল ভুবনের করে।।
পত্র পাঠে প্রেমিক সুধাংশু হাতে পায়।
গলে ছিল স্বর্ণহার খুলে দিল তায়।।

ক্রমে অস্ত দিনমণি সরোজিনী নতাননী
চন্দ্রাননী বেশ ভুষা পরে।
সঙ্কেত সময় স্মরি রহে অভিসার করি
সঙ্গোপনে সরোতীরোপরে।।
যামিনী দ্বিযামাতীত আমার কি সুশোভিত

উদ্যানস্থ সেই সরোবর।
শীতল সমীর ধীর   বহে, রহে স্থির নীর
নিরখি জুড়ায় কলেবর।।
নলিন মলিন মুখী   কুমুদী প্রমোদে সুখী
বনমধ্যে দুভাবে দুজন।
হেরে হয় ভাবোদয়   কিছু তার স্থির নয়
কার ভাগ্যে কি হয় কখন।।
নীলাকাশ নিরমল   তারা কুল সমুজ্জ্বল
মধ্যে বসি সুধার আধার।
যামিনী কামিনী সনে   সুখে প্রেম আলাপনে
করে ক্ষরে সুধার সুধার।।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে আসি   নিবিড় নীরদ রাশি
শশী ঢাকি করে ঘোরতম।
যেন সে ক্ষরীর চর   হরিয়া অরির কর
প্রকাশে প্রভুর পরাক্রম।।
বসিয়া সরসী তীরে   আহা মরি মরি কি রে
এমন সময় শোভা পায়।
নিন্দি রতী নিরুপমা   রূপবতী মনোরমা
হেমাঙ্গিনী প্রেম আকাঙ্ক্ষায়।।
হাস্য পূর্ণ হেট মুখে   নিরবে মনের সুখে
স্থির চক্ষে নীর পানে চায়।
যেন তার প্রতিরূপ   নভোপরে অপরূপ
পূর্ণ শশধর শোভা পায়।।

নাগর নাগরী সনে মিলনের তরে।
সময় বুঝিয়া মনে রম্য বেশ পরে।।
ধীরে২ চলে সে সঙ্কেত সরোবর।

চলিতে চরণ কাঁপে, কাঁপে কলেবর।।
হৃদি করে দুরু দুরু বিচঞ্চল মন।
চারি দিকে চেয়ে দেখে চোরের মতন।।
যায় আর ফিরে চায় অতি সাবধান।
শুনিলে কিঞ্চিৎ শব্দ উড়ে যায় প্রাণ।।
দেখে গিয়া প্রাণ প্রিয়া বসি তটোপরে।
প্রেম আসে আশা পথ নিরীক্ষণ করে।।
রঞ্জিতে রমণী চিত্ত রসিক রঞ্জন।
রসাভাসে কৌশলে করিছে সম্বোধন।।
এ ঘোর নিশায় কার কুলের কামিনী।
সরসী শোভিছে যেন মেঘে সৌদামিনী।।
হেরিতে হেরিলে চিত্ত গজেন্দ্রগামিনী।
অন্তরে আশঙ্কা বুঝি যায়লো যামিনী।।
নাগরের রসিকতা শুনি সুরসিকা।
সরস উত্তর দিল চতুরা নায়িকা।।
একে একাকিনী আমি কুলনারী তায়।
কেমনে এমন কথা কহিলে আমায়।।
চল চল শঠরাজ ঠেকাবে কি দায়।
যদি কেহ দেখে তবে মহাদায় তায়।।

অমিয়া জড়িত ভাষা শ্রুতির পিপাসা নাশা
শ্রুতিপথে পিয়া রসময়।
তুষিতে প্রেয়সী মন করি প্রিয় সম্বোধন
পুনরায় সুধাস্বরে কয়।।
একে প্রাণ তব রূপে ডুবিছে প্রণয় কুপে
চুপে চুপে গলে গেছে মন।
সোনায় সোহাগা প্রায় সুধা মাখা কথা তায়

দিলে যেন কাটায় লবণ।।
দেখ পোড়া পঞ্চশর   হানিতেছে পঞ্চশর
কলেবর হতেছে দহন।
কব কি দুঃখের কথা   হুতাশনে হবি যথা
বহিতেছে মলয় পবন।।
বলি তাই চাঁদমুখী   কর প্রাণ প্রাণে সুখী
বাক্য ছলে কিবা প্রয়োজন।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার   বল শুনি একবার
কি নাম হেথায় কি কারণ।।
প্রেমিকের বাক্য ছলে   প্রেমিকা অন্তরে গলে
পুনঃ ছলে কহে মৃদু স্বরে।
ওহে হে রসিক রাজ   কি কথা কহিলে আজ
কহিতে কি লাজ নাহি ধরে।।
একে আমি কুল কন্যা   সঙ্গে নাহি নারী অন্যা
কেমন সাহসে গুণমণি।
অবলার পরিচয়   জিজ্ঞাসিলে রসময়
পরিচিত না হয়ে আপনি।।

কথায় কথায় বৃদ্ধি বুধগণে কয়।
হাসি হাসি ভাষিছে সরসে রসময়।।
চন্দ্রাননী যার প্রতি যার মন ধায়।
তার প্রতি তার লাজ শুনে লাজ পায়।।
মন পাব বলে মন দিয়াছি তোমায়।
তবু কিলো লজ্জাবতী লজ্জা নাহি যায়।।
যদি পরিচয় বিনা না কবে সুন্দরী।
শুন তবে, করারোহে পরিচয় করি।।
বসতি আমার প্রেম কল্পতরু তলে।

প্রেম প্রিয় নাম মোর প্রেমিকেই বলে।।
প্রেম পিপাসায় প্রাণ একান্ত কাতর।
দেখি তব লাবণ্য সুন্দর সরোবর।।
জুড়াতে এলেম জলে ওলো রসবতী।
শুনিয়া কৌতুকে পুনঃ কহিছে যুবতী।।

———

কি কথা কহিলে প্রাণ শুনি হৃদি কম্পমান
তোমারে করিব প্রেম দান।
কেমনে প্রত্যয় হয় কর্ম্ম সাধি রসময়
যদি তুমি করহে প্রস্থান।।
পুরুষের যে আচার মধুকর সাক্ষী তার
নলিনীর সঙ্গে প্রেম করে।
সরোজ সরলা নারী চাতুরী বুঝিতে নারি
প্রেমে ভাসে সুখের সাগরে।।
লোয়ে বঁধু মধুব্রত করে সদা সদাব্রত
কখন বিরূপ নহে মনে।
কিন্তু অলি শঠরাজ সাধিয়া আপন কায
অনায়াসে যায় অন্য বনে।।
বলি তাই রসময় মনে হয় অপ্রত্যয়
প্রণয়ে বিচ্ছেদ পাছে ঘটে।
শুনি কহে গুণমণি ওলো চারু চন্দ্রাননী
কেন হেন বলিছ কপটে।।
পুরুষ পাষাণ অতি স্থির নহে রতি মতি
রসবতী, ও কথা বলোনা।
ভ্রমরার ব্যবহার দেখায়ে প্রমাণ তার
মিছে আর ছলোনা ছলোনা।।
জান না কি সুধা ধরা ললনা ছলনা ভরা

সুপ্রমাণ তোমারি কমলে।
প্রস্ফুটিত রবি করে ভৃঙ্গে মধু দান করে
করে করে প্রতিফল ফলে।।
প্রেমময়ই বলি তাই ও কথায় কায নাই
কৃপা নেত্রে চাহ একবার।
পাইয়া প্রণয় ইন্দু না রহিবে দুঃখ বিন্দু
উথলিবে প্রেম পারাবার।।
শুনি ধনী কহে হাসি শুন ওহে গুণরাশি
কেন এত উতলা এখানে।
চল আগে যাই পুরে হৃদয় পিঞ্জরে পুরে
তুষিব হে প্রেমামৃত দানে।।

অতঃপর নায়ক নায়িকা দুই জনে।
হেমলতা পুরমধ্যে প্রবেশে গোপনে।।
কিন্তু হায়! সুখ কোথা দুঃখ ছাড়া রয়।
এমন সুন্দর পদ্ম বোঁটা কাঁটাময়।।
নয়ন রঞ্জন শশী কলঙ্কে পূর্ণিত।
পরম সুন্দর শিখী চরণ কুৎসিত।।
সুখের সহিত দুঃখ ছায়া সম রহে।
বিশেষে কুকর্ম্মে সুখ কদাচই নহে।।
যখন আলাপ করে নায়িকা নায়ক।
গোপনে শুনিয়াছিল কন্যার জনক।।
প্রতিহিংসা করণাশে প্রতীক্ষিয়া ছিল।
দেখিল উভয়ে পুর প্রবেশ করিল।।
অর্মান করিয়া রুদ্ধ খিড়কির দ্বার।
"চোর চোর" বলি মহা করিল চিৎকার।।
শুনিয়া চোরের নাম যত পুর জনে।

আলো জ্বালি ছুটাছুটি আইল প্রাঙ্গণে।।
ভুবনের শিরে বজ্র হইল পতন।
কোথা বা রহিল হায় প্রেম আলাপন।।
আসিয়া সুখের আশে কি দশা ঘটিল।
না পেতে সুখের স্বাদ প্রমাদ পড়িল।।
রঙ্গ রসে ভঙ্গ দিয়া মুখ ম্রিয়মান।
যেন সে প্রকৃত চৌর শুকাইল প্রাণ।।
হারে বিধি নিদারুণ এই ছিল মনে।
কি দশা এখন তুই ঘটাবি ভুবনে।।
বিশিষ্ট সন্তান যুবা শিষ্ট শান্ত অতি।
এ কর্ম্মে হয়েছে মাত্র নূতন সে ব্রতী।।
বিষম বিপদে পড়ে বুদ্ধি হারাইল।
দেখিতে দেখিতে আসি তাহারে ধরিল।।
কামিনী কনক কায় হইল মলিন।
মহাতঙ্কে শুকাইল বদন নলিন।।
কন্যা স্নেহে তারে কেহ কিছু না বলিল।
কেশে ধরি বাবুজিরে বাহির করিল।।
"প্রহারেণ ধনঞ্জন" মন্ত্র উচ্চারিয়া।
করিল মৃতের মত মারিয়া মারিয়া।।
ভদ্রের তনয়, কায় স্বভাবে কোমল।
অবসন্ন হয়ে শয্যা করিল ভূতল।।
মৃতপ্রায় দেখি তারে ছাড়ি দিয়া ক্ষণ।
আছে কি মরেছে সবে করে নিরীক্ষণ।।
জাতি জন্য জাতক্রোধ তবু নাহি যায়।
চৌর বলি চৌকিদারে ধরে দিল তায়।।
গোটা কত দ্রব্য দিল সাক্ষীর কারণ।
করিতে নূতন প্রেম চলিল ভুবন।।

প্রভাতে পুলিষে আসি দিল দরশন।
নিবেদিল নিশাপাল নিশির ঘটন।।
ধরেছে অৰ্দ্ধেক রাত্রে বাটীর ভিতরে।
সাক্ষী আর তাহাতে কি প্রয়োজন করে।।
দাণ্ডাইতে দণ্ড আজ্ঞা হইল বিচারে।
মহা কষ্টে ছয় মাস বাস কারাগারে।।
হায় রে ভদ্রের ছেলে মানে মানে ছিলি।
খানা কেটে লোণা জল কেন ঢুকাইলি।।
করিতে এমন প্রেম কে তোরে বলিল।
লেখাপড়া শিখে এই ফল কি ফলিল।।
কি বলে দেখাবি মুখ মানব সমাজে।
জনক জননী তোর মরিবে যে লাজে।।
যার জন্যে গিয়াছিলি কোথায় সে ধনী।
এখন করিবি নিজে ঝম ঝম ধ্বনি।।
অধৰ্ম্ম কুধৰ্ম্ম করি সুখ যদি হবে।
ধৰ্ম্মের সাধনা আর কে করিত তবে।।
দিবা নিশী একজন আছেন জাগ্রত।
দেখিছেন মানবের ক্রিয়া কাণ্ড যত।।
পক্ষপাত মাত্র নাই তাঁহার বিচারে।
ফল লাভ করে জীব ক্রিয়া অনুসারে।।
তাঁর পথ পরিহরি পাপে হবে রত।
কৰ্ম্ম অনুরূপ ফল পাবে এইমত।।

সংপূর্ণ।

রোগের মত ওষধি।

প্রথম অঙ্ক।

শ্রীসন্ন্যাসিচরণ পাল কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা।

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল /১০ আনা।

[1863

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণ সন্নিধানে সবিনয়ে নিবেদন। অধুনা নানা পুস্তক বিচরণ দেখিয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহস করিলাম। ইহাতে বর্ত্তমান অবস্থার যুবক দল, যাহারা পরিণীতা প্রণয়িনির মুখারবিন্দ অবলোকনে অশক্ত হইয়া অর্থ শোষিণী মান নাশিনী বার সীমন্তিনী গমনে চিত্তকে চরিতার্থ রাখে তত্তাবৎ ভাবি অবস্থা বর্ণন মাত্র। অতএব মহোদয়গণ সময় বিশেষে অত্র পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ ঔদার্য্যগুণে সমূহ. দোষ মার্জ্জনা করিলে সন্তোষ লাভ করিব।

কলিকাতা }
বঙ্গাব্দ } শ্রীসন্ন্যাসিচরণ পাল।
৭ আশ্বিন }

রোগের মত ওষধি

প্রথম অঙ্ক।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াঠেকা।

মন হও সাবধান। ললনা ছলনা জাল সর্ব্বত্রে

পতন।। আস্যে হাস্য সুমধুর, কিন্তু বিষাক্ত অন্তর, বলে তুমি প্রাণেশ্বর, আমি তবাধীনী জন প্রণয়িরে প্রাণে মেরে, অর্থের দাসীত্ব করে, লজ্জা ধৈর্য্য নাহি ধরে, করে অপমান।।

প্রমথনাথ নামক এক ব্যক্তি স্বীয় বাসাবাটী হাড়-কাটাতে শশী ও বসন্ত বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে নিয়ত গীত বাদ্যে মনোনিবেশ করত অহরহ ব্যস্ত থাকে। কদাচ বিষয় কর্ম্মের উদ্যোগ পায় না, সুদ্ধ "ইয়ারকি" অহিদংশনে বিষাক্ত কলেবরে চেতনাশূন্য হইয়া আমোদ কৌতুকে কাল অতিপাত করে।

(শশী ও বসন্তের প্রবেশ)

শশী। কি হে প্রমথ ভাল আছ ত! তোমার সঙ্গে অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই, বিশেষ এহপ্তায় ছুটি লয়ে বর্দ্ধমান বেড়াতে গিয়েছিলাম, তাতেই আসা হয় নাই, তবে চাকরি বাকরি করিছ কেমন।

প্রমথ। আরে—এস মাইডিয়ার।
(ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া)
সেধো এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

ভৃত্য। আঁগে যাই।

প্রমথ। চাকরি সেই এইচ্ টোটোর বাড়ি গুদাম সরকারী, যা চিরকাল করে থাকি।

শশী। প্রমথ বাবু তোমার বাসাটি অতি মনোহর. গুডপ্লেস; এখানে রকম সকমও ঢের আছে, তুমি তবে আজকাল কেমন. আমোদে আছ।

প্রমথ। ভাল মলের শব্দে কাণ গেল।

পয়ার।

আমোদ প্রমদ করে যত দিন যায়।
শ্বাদাপ্রাণে সদা থাকি দুঃখ কভু নয়।।
শনিবার আরাম্ভন সোমবারে শেষ।
পরোটা পোলাও ভুনি খিচুরি বিশেষ।।
সেতার তম্বুরা বাঁয়া ফুলুটের স্বরে।
রাগ তাল লয় মানে মন মুগ্ধ করে।।
যার যা হতেছে ইচ্ছা সংগ্রহ করত।
অবাধে সম্পদ ভোগ মমালয়ে নিত্য।।
বিশেষ শশী প্রকাশে আনন্দ অসীম।
পুলোকে ভূলোকে সুখী কে আমার সম।।

শশী। ওহে তুমি যে বড় বক্তা হয়েছ, তোমার সঙ্গে যখন একত্রে ইস্কুলে পড়ি, তখন তুমি খুব ঠাণ্ডা ছিলে; এখন কলিকাতায় থেকে কলির মত হয়েছ, আর বাড়ি যাবার নামও কর না, হাড়কাটায় যে হাড়টা কালি করিলে, চল আগত শনিবারে পাঁচটার ট্রেনে দুই জনে বাড়ি যাই।

প্রমথ। (স্বগত) বিবাহ্ অবধি প্রিয়োসীর শশীমুখ অবলোকন করি নাই, এবার সুকুমারির বিবাহেতে যদি আসে তবে দিন কতক বাড়ি থাকিব; (প্রকাশ্যে) শশী বাবু আমার ছোট ভগ্নির মাঘ মাসে বিবাহ হবে তাতেই বাড়ি যাব ইচ্ছা আছে।

(শশী ও বসন্তের প্রস্থান)

শান্তিপুর শ্রীকৃষ্ণ দত্তর বাটির অন্তঃপুরস্থ জ্যেষ্ঠ মধ্যম বধূ আর অনূঢ়া সুকুমারীর একত্রে উপবেশন।

বড়। মেজ বৌ! এবার ছোঠ্ঠাকুর অনেক দিন বাড়ি আসেনি না? বোধ করি কল্‌কেতায় রাঁড় করে থাকবে? তা আস্‌বেই বা কেন? তাঁর বে পর্য্যন্ত ঠাক্‌রণ এক্কবারও ছোট বউকে আন্‌বার কথা মুখেও আনেন না; এখনকার লোক সে যার আপনার ধারণে বোঝনা কেন ভাই।

মেজ। তাহক্‌ত! বড়দিদি, ঘরে মাগ না থাকলে মন বোসবে কেন ভাই; এবার

সুকুমারির বেতে ছোটকি এলে আমরা আর ছেড়ে দিব না, তা আঁবুই যা বলেন বল্‌বেন।

সুকুমারি। (বিবাহের নাম শ্রূতে হর্ষে বিরক্ত হইয়া মুখবক্রে) আঁা... তোদের আর ঠাট্টা করতে হবে না, আমি বুঝি তোদের কিছু বল্‌ছি লা; তা যখন তখন আমাকে বল্‌বি।

মেজ। কেন্‌লা ছুঁড়ি তোরে মন্দ বল্লুম কিলা; তোর কি বিয়ে হবে না থুবড়ো হয়ে থাক্‌বি।

সুকুমারি। তুই যে বল্লি ছোটদাদা বাড়ি আসে না, তা আমি কি মানা করেছি।

মেজ। ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত। তা কেন্‌লা ছুড়ি? ঠাকুর নানা দিকে ঘটক পাঠায়ে বর অন্বেষণ করছেন; তা মানা কোরে দিয়ে, তুই তোর ভাইকে বে করে ঘরে নিয়ে থাক।

সুকুমারি। তোদের বুঝি এমনি হয় লা! মাকে বলে দোব দেখবি।

মেজ। দিগে যা বলে; তার আর ডবডবানি দেখাস কি।

বড়। তুই ছুড়ি এখানে এলি কেন্‌লা! তোরে কেউ পান, গো, দিয়ে ডেকে ছিল।

সুকুমারি। (উচ্চৈস্বরে মাতাকে সম্বোধন করিয়া) ওগো মা-মা।

কর্ত্তৃ। কেন লো মা মা করছিস! কি হয়েছে?

সুকুমারি। দেখমা, বড়বউতে মেজবউতে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

কর্ত্তৃ। তুই ওদের কাছে যাস্‌ কেন লো মুখ পুড়ী; চত যাই, (কর্ত্তৃ সক্রোধে বধূ দ্বয়ের নিকট প্রবেশ)।

কর্ত্তৃ। কেন গা বাছা! তোরা ছেলে মানুষের সঙ্গে লাগিস, ও কি তামাসা বুঝে।

মেজ। না গো ঠাক্‌রণ, আমরা ত কিছুত বলিনি।

কর্ত্তৃ। না মা, ওরে তোমরা কিছু বলো না।

(কর্ত্তৃর প্রস্থান)

বড়। মেজবউ! তোর বড়ঠাকুরও শান্তিপুরে আসায় ক্ষান্ত দেছে; অবলার প্রাণ মনে করি না আসুগ্যে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

পয়ার।

বিরহ বিষম নদী অশ্রু ঘন রস।
হতাশ বাতাস তাতে বহে অহর্নিশ।।
লোক লজ্জাকুলভয় উভয় পুলিনে।
গঞ্জনা লাঞ্জনা নক্র ভ্রমে সংগোপনে।।
রসময় না আসায় হরিষে বিষাদ।
যৌবন তরঙ্গে ভাঙ্গে প্রবোধের বাঁধ।।
ভ্রম বাক্য পাক চক্র আছে ঠাই ঠাই।
অসতর্ক চোরা বলি প্রকাশে সদাই।।
একে নারী দেহ তরী পয়োধর ভারে।
টলমল করে সদা যেতে পারাবারে।।
ভরসা ধৈরয ধজি ধরেছে দুকর।
নাবিক অভাবে রক্ষা কার নহে কর।।
মনে করি নাহি করি ভরসা তাহার।
অপমান ভয়ে মান করে উপকার।।

শুনলি মেজবউ, একি সামান্যি জ্বালা? বয়স কাল, থাক্‌তে পার্‌ব কেন ভাই! আমরা ভাল মানুষের মেয়ে তাই, মুখে চারটি ভাত গুঁজে খাঁচার পাখির মত ঘরের ভিতর মাথা গুঁজে থাকি, দেখ্‌লিনে? ওপাড়ার তাতিদের বউটো ভাতার বিদেশে চাক্‌রি কর্‌তে গেছে; ছমাস হয়নি বেরিয়ে গেল।

মেজ। তবে বড়দিদি তোমাকে আমাতে বেরিয়ে যাই চল? ঘরের ভিতর শাউড়ি ননদের গঞ্জনা কেন সব।

বড়। দূরলো? তোর কিসের দুঃখ; বেরতেই কি বল্‌ছি এবার তোর, বঠ্‌ঠাকুর অনেক দিন বাড়ি ছাড়া, তাই।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সুকুমারির বিবাহ।

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘটক। কৈগো! কর্ত্তা কোথায়; চাকর বাকর কাকেও যে দেখিনে।

কর্ত্তা। (শ্রীকৃষ্ণ দত্ত বাটীর অভ্যন্তর হইতে কাষ্ঠ পাদুকার চটস্ চটস্ শব্দে বৈঠকখানায় আসিতেছেন হঠাৎ ঘটককে সম্মুখে দেখিয়া) আসুন মহাশয়, কিকরে এলেন?

ঘটক। হাঁ মশয়! আমি আবার কি করে আসবার পাত্র? আপনার আশীর্ব্বাদে একেবারে ফলারটা পাকিয়ে এসেছি; এক্ষণে মহাশয় লগ্নস্থির করে সম্বাদ দেন; হরিদ্রার কাযটা সারা হোক।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। (নারায়ণ নারায়ণ) বাবুর উন্নতি নিয়ত ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থিত আছি।

কর্ত্তা। প্রণাম খুড়ঠাকুর, এই আপনার কথাই হচ্ছেল! বা। মেঘ চাহিতেই একেবারে জল উপস্থিত! তবে বলুন দেখি, এরমধ্যে কবে ভাল দিন আছে। শুনেন নাই! সুকুমারির বিবাহ (স্বগত) আমি তোমার কন্যার জন্মাধি দিন গন্‌ছি, কবে ফলারের যোগাড়টা হবে আর দশ টাকা প্রাপ্যও আছে, (প্রকাশ্যে) কৈ না তাত শুনি নাই, তবে কোথায় সম্বন্ধ ছিল হল।

কর্ত্তা। খুড়ঠাকুর। সেই, নন্দীগ্রামে ঘোষেদের বাটী; পূর্ব্বে যার কথা আপনাকে বলে ছিলাম, আর কোথায় খুঁজিব? পাত্রটি ভাল, লেখাপড়ায় সুযোগ্য, প্রেসিডেন্সী কালেজের প্রশংসিত ছাত্র।

পুরো। বেস হয়েছে? শুনে সন্তুষ্ট হলাম; আপনার কন্যাটি যেমন সুন্দরী পাত্রও তদুপযুক্ত গুরু পুরোহিত প্রসন্ন থাকিলে তার সর্ব্বথা মঙ্গল।

(পুরোহিতের প্রস্থান)

বিবাহের দিন উপস্থিত।

(রসময়ী নাপ্তিনির প্রবেশ)

নাপ্তিনী। কৈগো! বোয়েদের যে দেখিনে; বে বাড়ি, ওমা একি পাঁচজন লোক আসিবে

যাবে, তা কিছুই নাই (স্বগত) কায়েতদের আর সেকাল নাই; যে, আগেকার মত ঘটা করবে! এখন খরিয়ে গেছে, (মেজবউ উপরের বারাণ্ডা হইতে) কে-গা ডাকা ডাকি করছে।

নাপ্তিনী। ওগো আমি গো, নাপ্তিনী, তোরা কোথায় সব।

মেজ। কেগা নাপ্তে ঠাকুরঝি, এস এস! এই তোমাকে ডাকিতে পাঠাছিলুম; তা হল ভাল, সকলকে কামাতে হবে।

নাপ্তিনী। তবে ভাই তোমরা নেমে এসো, আমাকে আবার ঐ, ওদের বাড়ি যেতে হবে।

মেজ। নাপ্তে ঠাকুরঝির পোঁদে এক দিন ত ল্যাঠা ছাড়া নাই।

নাপ্তিনী। হ্যাঁ ভাই আমার পোঁদে ল্যাটাও থাকে শোলো থাকে তোমরা যেমন কাত্‌লা পাড় তেমন নই।

পয়ার।

কবে যে হয়েছে বিয়ে ভুলে গিছি ভাই।
কোড়ে রাঁড়ি হই বটে কোন দোষ নাই।।
বাঘাভাল্‌কো ভ্রাতৃদ্বয় শমন সমান।
ছুতে মাছি কাটে সদা সর্ব্বদা শাসন।।
কতলোকে কত বলে যামিনী বাসরে।
আমি তাই থাকি ঘরে অন্য নারী নারে।।

শুন্‌লিলা মেজকি; তোরা বড় সতী, সবজানি এখন নেমে আয়, আমার আর কর্ম্ম আছে।

মেজ। (বড় বউকে সম্বোধন করিয়া) বড় দিদী? রসী কি বল্লে শুনেছিস।

বড়। হ্যাঁ, ওকি হড় বড় করছিলো বটে, তা, ওর সঙ্গে কি আমরা কথায় আঁট্‌তে পারব, ও ঢের কথা জানে, কথায় বলে, (স্বভাব যায় মলে বিষ্ঠা যায় ধুলে) ও যেমন তেম্নি সকলকে দেখে তা ওর সঙ্গে উত্তর করিস নি।

(ভুবনমোহিনী সৌদামিনী
ও যামিনির প্রবেশ।)

ভুবন। কৈগো। এ বাড়ির গিন্নিরা কৈ, এই আমরা এলুম।

নাপ্তিনী। (দূর হইতে উহাদের দৃষ্টি করিয়া স্বগত) বাবা আবার এক দঙ্গল আসছে, আমাকেই সারল্লে (প্রকাশ্যে) উপরে আছে সব; কিছু না দেখলে কি নাব্‌বে?

মেজ। ভুবন এসেছ? আর তোমাদের কৈ।

ভুবন। এই আমি এসেছি, দামিনী দিদী এসেছে, আর বেনেদের যামিনী এসেছে।

মেজ। এস এস! তোমরা সব বোস, এক সঙ্গে কামাতে হবে (সকলে বাটীর প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট এবং ক্ষৌর আরম্ভ)।

মেজ। দামিনী আগে কামাত বাছা? এর পর তোদের অনেক কায আছে।

দামিনী। মেজ ঠাকুরণ। ভুবনকে বল, আমি একটু বসি।

মেজ। (ভুবনকে সম্বোধন করিয়া) ভুবন নে ভাই নে, একে একে সকলে কামা; এরপর অনেক কর্ম্ম আছে।

ভুবন। আচ্ছা যাই।

পয়ার।

সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ ভুবনের বর্ণ।
তুলনা তুলোনা নাহি ভুবনে সম্পূর্ণ।।
চন্দ্রাননে চন্দ্রাননী বোধ হয় মনে।
আছে ধরে শশধরে নিজাবগুণ্ঠনে।।
কেবলে অপূর্ব্ব ধনু ধরে পঞ্চবান।
কদাচ না হবে ভুরু ভঙ্গিমা সমান।।
কোকিল নিন্দিত ধ্বনি আহামরি মরি।
দামিনী দেখিয়া হাস্য ভরে থরহরি।।
মুক্তামালা দন্তমালা উপমার নয়।
তাহলে হৃদয়ে ছিদ্র হতনা নিশ্চয়।।
দেখিয়া সুদৃশ্য ওষ্ঠ বিম্ব সুগঠন।
মন দুঃখে ঝুলে বৃক্ষে ভূমেতে পতন।।
গৃধিনী গঞ্জিত কর্ণ অতি মনোহর।

হেমাদ্রি রয়েছে বনে হেরে পয়োধর।।
কুরঙ্গ ঈক্ষণ করি নয়ন তাহার।
খেদে কেঁদে বনে বনে করে হাহাকার।।
ভুজদ্বয় বোধ হয় যেন শুণ্ড করি।
কোটি দেখে কোটি কোটি পলাল কেশরি।।
অপরূপ নাভিকূপ লোমাবলি সার।
নিতম্ব উপরে সোভে স্বর্ণ চন্দ্রহার।।
জঙ্ঘার শারল্য দেখে রম্ভা অভিমানে।
অধৈর্য্য হইয়া তনু ত্যাজে অল্প দিনে।।
নখর মুকুর ভিন্ন কে ভাবিবে বল।
চারু চন্দ্রাতপ তুল্য অতিব উজ্জ্বল।।
হেলে দুলে হাসি মুখে সন্তোষ হৃদয়।
বসিল আসনোপরে ভূমে চন্দ্রোদয়।।

ভুবন। তবে নাপ্তেবউ! দেখবো? তুই কেমন কামাস।

নাপ্তিনী। আমি এই করতে করতে চুল পাকালাম, নে ভাই তোর আর ঠাট্টা করতে হবে না কালকের মেয়ে, অবাক্! সে দিন তোকে হতে দেখলাম।

দামিনী। ভুবন! তোর এত বাহারে কিহবে লা, মিনিবাহারেই তোর ভাতার হাত ধরা।

পয়ার।

ধবতব অনুগত নয়নে নয়নে।
উভয়ে প্রণয়ে আছ সদা সুখ মনে।।
প্রতিবেশী কি বিদেশী সকলের পাশে।
করিয়াছ যশলাভ বিচ্ছেদ বিনাশে।।
চারু অলক্তক রাগ দেখিলে দুপদে।
সোনায় সোহাগা হবে নিন্দি কোকনদে।।

ভুবন। দামিনি! তোর ভাই এক কথা! কেবল্লে লা আমায় ভালবাসে, তুমি যেমন, লোকে, লোকের ভাল দেখতে পারেনা, ভাই।

দামিনী। তোর আর ঠাট্ দেখে বাঁচিনা, এ আব নিন্দে কি লা তোর আরো সুখ্যাৎ, আমাদের সে তেমন নয়, লোকেও কিছু বলে না।

পয়ার।

লোকেও করেনা কিছু সুখ্যাতি কুখ্যাতি!
পতিরতা হই কিন্তু পতি অন্য গতি।।
অশান্ত বসন্ত ঋতু হইলে উদয়।
দক্ষিণ অনিলে অগ্নি দেয় দেহময়।।
অবলা অখলা নারী নাথ ভিন্ন দেশে।
দগ্ধবারে বেঁধে মারে আরো বা কি শেষে।।
অকুল সাগরে সখী কুল দেখি নাই।
ভাবিতেছি ভাবি পাছে দুকুল হারাই।।

শুন্‌লি ভুবন! আমার দশা! সে কেবল নাম মাত্তর, পোড়াকপাল মুখপোড়া ত বাড়িতে মুখ দেখায় না সুধু খান্‌কির বাড়ি হাঁড়িকেঁড়ে দিন কাটাচ্ছেন।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

———

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রমথ ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ।

প্রমথ। সেধো! ব্যাগটা বাড়ির ভিতর রেখে এক ছিলিম তামাক সেজে আন।

ভৃত্য। আঁগে যাই।

ভৃত্য বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া (উচ্চৈস্বরে) ওগো মাঠাকুরণ! ছোট বাবু এসেছেন, এই গুলো রাখ।

কর্ত্তৃ। সাধু কোথা রে তোর ছোটবাবু? বাড়িতে কায, দুদিন আগে থাক্‌তে আস্তে হয়, তুইও একটু ত্বরা করিসনি।

ভৃত্য। ঠাকুরণ বাবু বার বাড়িতে আছেন, আমি তামাক দিতে যেয়ে ডাকি দিচ্ছি।

ভৃত্য। (তাম্রকুট প্রস্তরক করত কল্‌কেতে ফুৎকার দিতে দিতে সমীপে যাইয়া) বাবু, আপনাকে বাড়িতে ঠাকুরণ ডাকিছেন।

প্রমথ। তামাক খেয়ে যাই।

প্রমথ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ইতঃস্তত নিরীক্ষণ করত প্রিয়া অদর্শনে (স্বগত) কৈ! দেখিনে যে! মনে করেছিলাম সুকুমারির বিবাহেতে কর্ত্তা আনাবেনি "গেড়ের চাং কি স্বর্গ দেখে" এবার বাড়িতে গিয়া প্রয়োসির মুখশশী অবলোকন করে চক্ষুকে চরিতার্থ করিব তাহা সকলি বিফল, হা কপাল।

পয়ার।

হায় রে অদৃষ্ট মম ধিক তোরে শত।
সঞ্চিত ধনেতে বুঝি করিলে বঞ্চিত।।
বহু দিন ছিল মনে প্রয়োসী বদন।
পুলকে পূর্ণিত হয়ে করি নিরীক্ষণ।।
সে আশা নিরাশা হল প্রিয়া না আসায়।
চারি দিক শূন্য দেখি সব দুঃখ ময়।।
এমন আমোদে বাটী আনন্দে পূরিত।
মম পক্ষে দুঃখ নদী হইল প্লাবিত।।
দগ্ধিভূত করিতেছে দগ্ধ ফুল ধনু।
প্রিয়া হীনে দিনে দিনে ক্ষিণ্ন হল তনু।।

কর্ত্তৃ। (প্রমথকে উপস্থিত দেখিয়া) বাছা বাড়িতে কায! দুদিন আগে আস্তে হয়, তোদের কেমন বিবেচনা তোরাই জানিস।

প্রমথ জননিকে প্রণাম করিয়া বিমর্ষ মনে আপন উপর নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক সোপানে অধিরোহণ করিতেছেন, অকস্মাৎ চিরবাঞ্ছিত প্রণয়িনীকে সম্মুখে পতিতা দেখিয়া অন্ধের নেত্রলাভের ন্যায় সন্তুষ্ট হওত কমল কর ধারণ পূর্ব্বক প্রিয়াকে প্রিয় সম্বোধনে। ভাল আছ ত? মনে করেছিলাম মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা কবনা, আবার না কহিলে কে যেন পিঠে বাড়ি মারে; সেই গিয়াছিলে আর এই, ভাগ্যি বাড়িতে বিবাহ ছিল। যা হোক্ কাঠের প্রাণ।

ছোট। ধিক্, মুখ নেড়ে আর কথা কয় না, আমার আবার কাঠের প্রাণ? সেই পূজার সময় আশ্বিন মাসে গিয়েছিলুম; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ পাঁচ মাস, মলো; কি বাঁচ্‌লো অন্যেও জিজ্ঞেস করে, তুমি একবার চক্ষের

দেখা দেখনি, পোড়াকপাল! তোমার দোষ নাই, আমার কপালের দোষ; এখন ছাড়, নীচে যাই, ঠাকুরণ ডাকছেন।

(দম্পতির প্রস্থান)

(নিশা সমাগতা হইলে স্বামী-জায়া আপন শয়নাগারে শয়নার্থ প্রবিষ্ট হইলে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল)

ছোট। দেখ! তুমি আমাকে কিছু বল না, আমার মনে আর সুখ নাই, এতদিন বে হয়েছে, এম্‌নি কপাল! ভাল খেতেও পেলেম না, ভাল পরতেও পেলেম না, তাও যাগ্‌ স্বামী সহ বাস সুখে থাকি, যে, মন এক মনই থাক্‌। ভাতার ত অবতার, দেখ, তেলিদের কামিনীর সে দিন বে হল, গহনাতে কাপড়েতে ঝলাবাত, দেখে চোক যুড়ায়, তুমি তার ভাতারের পা ধুয়ে জল খাওগে!

পয়ার।

জানি হে যেমন তুমি সরল অন্তর।
অবলা অখলা পেয়ে সদা মনান্তর।।
বিবাহিতা পত্নী প্রতি অসন্তুষ্ট চিত।
বারবধূ ফুল মধু পানে নিত্য রত।।
হায় রে বিধাতা কেন করেছ রমণী।
গৃহ পিঞ্জরেতে থাকা আরো পরাধীনী।।
যে সুখে করেছ সুখী বণিতা মণ্ডলে।
সে সুখের সেতু ভগ্ন অভাগী কপালে।।
সতী রামা পতি গতি এক প্রাণেশ্বর।
বিরহ সাগরে ফেলে বাস বেশ্যা ঘর।।
পয়োধর প্রিয়কর, প্রিয়কর বিনে।
মনদুখে অধোমুখে রহে দিনে দিনে।।
গৃহ দ্বার ইতস্ততঃ সকলি অরণ্য।
তবাভাবে ভেবে ভেবে শ্রীহীন লাবণ্য।।

প্রমথ। (স্বগত) সাধে বলে! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গিতে হয়। এইবার

বিবাহেতে বাড়িতে গিয়া চিরবিরহের মূল উৎপাটন করে উভয়ে প্রণয়ে কাল হরণ করিব; তা যা ভাবিলাম সকলি বিফল। (প্রকাশ্যে) তোমার মনে কি আবার পাঁচ মন আছে? তবে ক্ষুধা হলে দুই হাতে খাও; তোমারদের চেনা ভার কিছুতেই বিশ্বাস নাই।

ছোট। অবাক সে আবার কি! আমি অত ঠার বুঝি না, সোজা করে বল যে বুঝ্‌তে পারি!

প্রমথ। নেকটিং আর কি! আস্কে খাও ফোড় গণনা, ধন্য তোমায়, এক মনে কেমন করে পাঁচ মন সহ্য কর।

ছোট। ও তুমি কটুত্ব ভাব্‌ছ, আমি তা বুঝতে পারি নাই, চোরের মন পুই আঁধারে, তুমি নিজে যেমন খান্‌কির বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর সংসার ভুলেছ; আমি তেমন হলে তোমার চাগুাপানা মান ছরকুটে যেত।

প্রমথ। কেন হারম্‌জাদী, তুই বল্লিনি! ভাতার বশ থাকিলে মন একমন থাকে, তবে তোর অন্য মন হয়েছে বেস্‌ যা তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না, আমার কাছে থেকে দূর হ, তোর যা ইচ্ছা তাই করগে যা।

(প্রমথ সক্রোধে অভ্যন্তর হইতে নিশীথ সময়ে পলাইয়া সংগোপনে একাকী বহির্বাটীর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলেন।)

ছোট। ওমা! আমার আজন্মই দুঃখে গেল।

পয়ার।

হায় হায় একি দায় কথায় কথায়।
অমৃতে উঠিল বিষ করি কি উপায়।।
কি করিব কোথা যাব বলিব না কারে।
কে আর অবলা বলে উপকার করে।।
নিশীথ সময়ে নাথ শূন্য করি ঘর।
একা ফেলে কোথা গেলে ওহে প্রাণেশ্বর।।
আর না করিব আমি কোন অপকান।
আর না কহিব কভু অপ্রিয় বচন।।
আর না করিব হেলা চরণ সেবিতে।

আর না করিব মানা যথা তথা যেতে।।
আর না চাহিব আমি অলঙ্কার রত্ন।
আর না করি প্রাণ থাকিতে অযত্ন।।
কে আর ধরিবে কর প্রয়োসী সম্ভাষি।
কে আর করিবে শান্ত বসন্তের নিশী।।
কে আর দাসিরে রাখে নয়নে নয়নে।
কে আর করিবে পার যৌবন তুফানে।।
কে আর কামিনী জন মনোহর সাজ।
আদরে আমারে দিবে বিনা রসরাজ।।
কুলবালা কোন জ্বালা জানি না কখন।
বিচ্ছেদ অর্ণবে এবে কে করে মোচন।
দেখ হে বিপদ মম অখিলের পতি।
করুণা নয়নে হের অভাগিনী প্রতি।।

প্রমথ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় বাসাবাটী হাড়কাটায়, পুন উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর নিজ প্রণয়িনীর ব্যবহার মনে মনে আন্দোলন করিয়া স্থির করিলেন, যে, অত্র বেশ্যা গমনে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত রাখি, আর কদাচ গৃহপথে পদার্পণ করিব না। একদা লম্পট জন প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ সজ্জিত হইয়া, বৈকালে ভ্রমণার্থ প্রসিদ্ধ সোণাগাছি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বাটীতে বারাণ্ডার উপর চিত্তচঞ্চল কারিণী ভুবনমোহিনী গোলাপ নাম্নী বেশ্যা বসিয়াছেন।

পয়ার।

বারাণ্ডায় বারাণ্ডার সোভা মনোহর।
কর্ণেতে ইয়ারিং ঝুমকা ঝুলিছে সুন্দর।।
কবরী রচিত তার স্বর্ণ প্রজাপতি।
কণ্ঠে কণ্ঠি ধুক্‌ধুকি ঝালরেতে মতি।।
বক্ষোপরে জিলদানা ঝলমল করে।
কুচশম্ভু শিরে যেন ভাগিরথী ঝরে।।
হাতেতে তাবিজ তাড় জসম চিক্কণ।

ঝাঁপা ঘুণ্টি ঝাঁকা ঝাঁকা নানা আভরণ।।
কিবা চারু চন্দ্রহার নিতম্ব উপরে।
দেখিয়া লম্পট লোক মনদুঃখে মরে।।
নীলাম্বর পরিধেয় দিগাম্বরী প্রায়।
অন্যপরে কোথা আছে মুনি মোহ যায়।।
করিয়া মোহিনী বেশ ধরি কাম বাণ।
যুবক জনের হৃদি করিছে সন্ধান।।
অকস্মাৎ তথা গেল প্রমথ অশান্ত।
ধরিছে কৃতান্ত তারে কে করিবে ক্ষান্ত।।

প্রমথ। কি হে বিবি! ঘর খালি য়াছে? যেতে পারি কি।

গোলাপ। আছে এসো। (দাসীকে সম্বোধন করিয়া) ঝি বাবুকে প্রদীপটা দেখাও ত।

দাসী। দেখাই বাছা।

(প্রমথ দাসীর আলোকে বেশ্যার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইলেন)

প্রমথ। কেমন মেয়ে মানুষ? তোমার বাঁধা লোক টোক আছে কি?

গোলাপ। না ভাই! আগে বাঁধা ছিল; এখন আল্‌গা হয়ে পড়েছে, আর কল্‌কাতার লচ্ছাদের সে দিন নাই, এখন সব খাঁক্তি হয়ে পড়েছে; ভাগ্যি পাড়া গেয়ে বাঙালরা ছিল তাই সহরের রক্ষা; রাঁড়েরা অন্ন করে খাচ্চে।

প্রমথ। ওহে তবে আমি তোমার কাছে আসিব, কিন্তু বাজে জটলা কর্‌তে পার্‌বে না, কেবল আমার বন্ধুলোক যারা আস্‌বে তাদের পান তামাক দেবে।

গোলাপ। হানি কি, আমার ঘর সংসারের ভার যে বইতে পার্‌বে তারি আমি! আর আমার অন্য প্রত্যাশা নাই, যার তার কাছে আব্‌রু খোয়াতে আমার লজ্জা করে, ছুটো নাং মলেও করি না।

প্রমথ। গোলাপ বিবি! তোমার কি হলে চলেভাই! (এতাবচ্ছ্রবণে গোলাপ লজ্জাবনতমুখী রহিবাতে) লজ্জা কি! নাচ্‌তে নেবেছ ঘোম্‌টা দিও না!

গোলাপ। আমার ত্রিশদিনে তিরিশ টাকার কম চলে না, বাড়ী ভাড়া আছে, দাসী আছে আর আপনার ঘর খরচ আছে, তা আপনি বিবেচনা করুণ।

প্রমথ। আচ্ছা তবে আজ অবধি কাহাকে ঘরে আস্‌তে দিও না। আমি তোমায় কাল কিছু টাকা দিয়া যাব। যাতে আপাতত খরচ চলে।

(প্রমথর প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

পয়ার।

পরদিন অপরাহ্নে ইয়ার সহিত।
প্রবেশিল রঙ্গস্থলে খাদ্য নানা মত।।
বরপি গুজয়া গজা অমৃতি কচুরি।
মতিচুর সীতাভোগ খাজা কারিকুরি।।
লালমোহন মহনভোগ রাতির সন্দেশ।
সেউ ভাজা দাল ভাজা "ভাজার বিশেষ"।
গোলাপী পানের দোনা কুসুমের মালা।
বেলোয়ারি ডিষগ্লাশ সাজাইল মেলা।।

(প্রমথ বেশ্যা প্রস্তুত পুপ ব্যঞ্জনাদি লইয়া পরিবেষণার্থ গৃহান্তরে গমন)

শশী। (বসন্তকে সম্বোধন করিয়া) তুমি এখানে এক বারো এসেছিলে কি? এ যোগাড় কবে হলো?

বসন্ত। না বাওয়া! আমি এক দিনো আসি নাই! এ হালে বোধ হয়।

শশী। এ যে গুল্‌জার দেখছি? বেহাল হবার গোচ্‌টা হয়েছে এই সময় মজাসজা যা কর্‌তে পার।

বসন্ত। তা বৈকি? আমি অল্পে ছাড়্‌বার পাত্র নই।

শশী। দেখ? যেন চটিও না? তা হলে হাত ছাড়া হবে।

বসন্ত। হাঁ-তাকি চটাই! ওর ঘড়ী আঙ্গটি বেচে শেষ কিছু না থাকলে আমরাই চোট্‌বো ভাবছ কেন!

(প্রমথ বন্ধুবরকে সম্বর্দ্ধনা করত আহারার্থ অনুরোধ করিলেন)

প্রমথ। শশী এস ব্রাদার! কিছু খেয়ে বসা যাগ।

শশী। হাঁ চলুন বেট্‌র্ ইউগো এণ্ড বি রেডি।

(বসন্ত বেহাগ রাগে ফুলুট বাজাইতেছেন)

প্রমথ। বসন্ত এখন বাশী রাখ? এরপর শোনা যাবে আগে কিছু খৈঁটা যাগ এসনা।

(সকলের প্রস্থান)

প্রমথ এবম্বিধ বেশ্যাশক্তিতে নিয়ত আবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত ক্রমশ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, এবং দুই তিন মাসের গোলাপের বেতন প্রদানে অপারক হেতু সত্বর উহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইল তাহাতে পরাজিত হইয়া প্রমথ পলায়িত হইলেন, তথাচ গোলাপ ওয়ারেন্ট করিয়া সারজন সমভিব্যাহারে গলি গলি অন্বেষণ করত ধৃত করিলেন।

সারজন। ওইউ রেণ্ডী? এই টোমরা আডমি হ্যায়।

গোলাপ। হাঁ সাহেব! ওকে ধরো, যেন পলায় না।

সারজন। বাবু! টেক্ ইওয়ার ইনভি টেসন লেটার এণ্ড কাম উইথ রেসপেক্ট।

প্রমথ। সার! ডোন্ট ক্যাচ মাই হ্যান্ড আই গোইঙ্গ ইন পানসন।

গোলাপ। সাহেব! তোমরা ভাব করবে নাকি! ওরে ছেড়ে দিও না যেন।

সারজন। টোম কেসা রেণ্ডী হ্যায়? আমি কি ছাড়িতে পারি।

(সকলের প্রস্থান)

প্রমথর বোধোদয়ে খেদোক্তি।

উচিত ছন্দ।

হায়রে! অবোধ বোধ সম্পদ সময়ে।
প্রিয়তর সহচর বশীভূত হয়ে।।
বিবেচনা ধৈর্য্য ধীর করি অপমান।
বারবধূ ফুলমধু করেছিলে পান।।
অমৃত বলিয়া তব ছিল সম্ভাবিত।
এখন করে বা মৃত সব বিপরীত।।

তোষামদে আনুগত্য দুঃখের জলধি।
যাদৃশ হয়েছে রোগ তেমনি ওষধি।।
পতিপ্রাণা প্রিয়তমা প্রণয়িণী প্রতি।
কখন করনি তুমি তাহাতে সম্প্রীতি।।
মিষ্ট বাক্যে রুষ্টভাব তুষ্ট কভু নও।
কষ্ট ভোগো শিষ্ট হবে স্পষ্ট কথা কও।।
কোথায় আছে হে তব অমাত্য উভয়।
সুজন ত নয় তারা কুজন তনয়।।
আমোদ প্রমোদ করে তুমি হলে আধি।
যাদৃশ হয়েছ যোগ তেমনি ওষধি।।
কোথায়? রহিল তব কোঁচা লম্বমান।
ফ্রেস্ ড্রেন্ ওয়াচগার্ড ঘড়ী, সুশোভন।।
বিচিত্র পাদুকা পদে পদে পদে হাসি।
গোলাপ প্রলাপ জালে লাগিয়াছে ফাঁসি।।
তব লাগি দুঃখ ভাগী করিলে আমারে।
কে করে মোচন এবে কে আছে সংসারে।।
পরিমিতি বিপরীতি সম্পূর্ণ অবিধি।
যাদৃশ হয়েছ রোগ তেমনি ওষধি।।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কর্ত্তা।	শ্রীকৃষ্ণ দত্ত।
প্রমথ।	কর্ত্তার কনিষ্ঠ পুত্র।
শশী ও বসন্ত।	প্রমথর বন্ধুদ্বয়।
ঘটক।	বিবাহ সম্বন্ধক।
ভৃত্য।	প্রমথর ভৃত্য।
কর্ত্তৃ।	শ্রীকৃষ্ণ দত্তের স্ত্রী।
ভুবনমোহিনী। সৌদামিনী। ও যামিনী।	প্রতিবেশী স্ত্রী।
রসময়ী।	নাপ্তিনী।
গোলাপ।	সোনাগাছির বেশ্যা।
বড়। মেজ। ছোট।	শ্রীকৃষ্ণ দত্তের পুত্রবধূগণ।
সারজন।	বিচারালয়ের প্রেরিত লোক।
দাসী।	গোলাপের কর্ম্মচারিণী।

বাল্যবিবাহ উচিত নয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল মিত্র
প্রণীত।
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা বিবেচিত
ও সংশোধিত হইয়া প্রণেতার আদেশানুসারে
প্রথমবার মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা।

সাহস যন্ত্রে

সন ১২৭০ সাল।
মূল্য ৯০ দুই আনা

[1863]

বিজ্ঞাপন।

এই "বাল্যবিবাহ উচিত নয়" পুস্তকখানি যাহার প্রয়োজন হইবেক সহর কলিকাতা আহিরীটোলার শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র মহাশয়ের বাটীতে মূল্য সম্বলিত লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন। দূরদেশীয় গ্রাহকেরা মূল্য এবং ডাক মাষুল স্ট্যাম্প প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীক্ষীরোদগোপাল মিত্র।

'আপনার মুখ আপুনি দেখ' অতি সত্ত্বরেই প্রকাশিত হইবেক।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আমার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদগোপাল মিত্র।

শ্রী উমানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

জগদীশ্বরায় নমঃ।

বাল্যবিবাহ্ উচিত নয়

(নিধিরাম* বিদ্যানিধির টোল)

(বিধিবাম বিদ্যাবাচস্পতির প্রবেশ)

বিধি: (উচ্চৈস্বরে) বিদ্যানিধি মোশায়! ভাল আছেন তো? প্রণাম হই।

নিধি: কেগা বাবা? আমি যে চিন্তে পাচ্চিনে?

(একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বোল্‌লেন) চক্ষু গেলো যার তার বাঁচাই বৃথা।

বিধি: আজ্ঞে! আমি "বিধিরাম"।

নিধি: ভায়া! কি মনে কোরে হে? এপথটা তো একেবারে ভুলে গেছো? মরেছি কি বেঁচে আছি, এক দিনের জন্য কানাদাদার সংবাদ নাও না? যে কটা দিন বেঁচে আছি, এক একবার খপর নিয়ো হে?

এইত সময় মম কখন কি হবে।
এখন না দেখ যদি কি দেখিবে কবে।।
ভাই বন্ধু সবার এ দেখিবার কাল।
কদিন বাঁচিব আর নিকট সে কাল।।
আমার আমার আমি করিবো যদিন।
তোমরা আমার বোলে ভাবিবে তদিন।।

নিধিরাম বিদ্যানিধির একশ বারো বৎসর বয়েস হোয়েচে, চোকে দেখতে পান না। এবং কানেও একটু কম শোনেন। বেদ, বেদাঙ্গ ও উপবেদ্যাদিতে বিচক্ষণ, পূর্ব্বে তিরিশ বত্রিশজন ছাত্রকে অন্নপ্রদান কোরে বিদ্যামান কোত্তেন। পৈত্রিক পাঁচশো বীঘে ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, ছাত্রদিগকে অন্নপ্রদান কোরে কেবল দশ পনেরো বীঘেতে ঠেকেছে। আজকাল চোকে দেখতে পান না, তথাপি দশটা ছাত্র আছে, তাদের মুখে২ পাঠ শিক্ষা দ্যান।

সরিলে বলিতে ভাই আসিব না আর।
বল মোরে "গঙ্গা দিবে" কর অঙ্গিকার।।

বিধিঃ দাদা মহাশয়! আপুনি এখন কিছু দিন বেঁচে থাকুন, ও কথা মুখে আনবেন না? আমরা আজ পর্য্যন্ত বড় গাছের আড়ালে আছি। একটা বিষয়ের পরামর্শ দেবার তরে মহাশয়ের কাছে আসা হোয়েচে! পুরাণলোক এখন আর বড় নাই, একালের যুবাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন বিষয় ঐক্য হয় না, তাই মহাশয়ের নিকটে এলেম। বলি কি? আপনাদের যে উপজীবিকা, আজ কাল তাতে আর কিছু হয় না? দুজন পাঁচজন ছাত্র পড়ালে কালে ভদ্রে একটা কলসী এবং দু এক খানা থালা পাওয়া যায়; কিন্তু ওদিকে পোড়োদিগকে খাওয়াতে২ ব্রহ্মত্তর জমী বিকিয়ে যায়, তাই দেখে শুনে বড় ছেলেটীকে ইংরেজী পোড়তে দিয়েছিলাম, পাঁচ ছ বচর পোড়চে, বিদ্যাও একটু জন্মেচে, পরে দশটাকা। এনে যে দুঃখ ঘুচাতে পারবে এমন গতিক বটে? ছেলেটীকে পড়াতে গিন্নির গায়ের গয়না গুলি সকল গিয়েছে, কেবল বা হাতে নোয়া গাছটী আর দুগাছী পিতলের বালা পোরে আছেন। এখন যে কাল পোড়েচে, ছেলেটী পাছে পাঁচ রকম বদখেয়ালিতে খারাপ হোয়ে যায়, সেইটীই আমার ভাবনা হোয়েচে। বালে কি? আগে থাকতে বিয়ে দিলে হয় না? তা হলেই গোড়া বাঁদা হবে, আর খারাপ হোতে পারবে না?

নিধিঃ ভায়া! অল্প বয়সে বিয়ে দিলেই যে ছেলে খারাপ হবে না, তাহা মনে স্থান দিও না।

কালের গতিক দেখে হোয়েছি অবাক।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে বাক।।
যৌবারণ্যে যুবাগণে বাড়ায়ে চরণ।
এক কালে হয় যেন উন্মত্ত বারণ।।
প্রথমতঃ তমমদ করিয়ে সেবন।
সদাই ক্রোধিত মন রক্তিম লোচন।।
মূঢ়তা শুড়েতে নাশি সত্য তরুচয়।
অজ্ঞতা সাহশে নাহি করে ধর্ম্ম ভয়।।
কলীর বলেতে বলী হোয়ে যুব দল।

একে কালে ছিঁড়ে ফেলে কর্ত্তব্যের ফল।।
অকর্ত্তব্য যে সকল তাই নিয়ে মাতে।
উচিত যে বলে তার মাথা কাটে হাতে।।
অনেক যুবাকে দেখি ইচ্ছা ভোগী হয়।
আহার বিহার ইচ্ছা মতে সমুদয়।।
দেবদেবি পূজা করে জনক যাহার।
ন্যাষ্টী পৌত্তলিক ধর্ম্ম ছেলে বলে তার।।
দেবালয় বলি পিতা সুদ্ধাচার করে।
জুতো পায়ে দিয়ে ছেলে ঢোকে সেই ঘরে।।
কাপড় পরার পাট কদিন বা রবে।
পেণ্টুলেন পরিতে ধোরেচি দেখি সবে।।
ফিরিতেছে যুবদের যে রকম চাল।
কদিন রহিবে আর হিঁদুয়ানি হাল।।
জাতির বিচার বল করিছে কজন।
আননে হোটেলে গিয়ে করিছে ভোজন।।
হিঁদু হোয়ে করিতেছে যবনী গমন।
হায় হায় যুবদের হোয়েছে কি মন।।
সুরাপান হইতে দেখ পাপ নাহি আর।
কিরূপ আদর আজ হোয়েচে সুরার।।
মদের বিষয়ে কটা ঘর আছে ফাঁক।
শনিবার হোলে হয় কি মদের জাঁক।।
ধনী কি নির্ধনী নাহি বিচার তাহার।
যেখানে সেখানে শুনি মদের ব্যাপার।।
সুরাপান কোরে দেখিয়াছি কতজন।
অচেতনে পথমাঝে কোরেচে সরন।।
ঝোলায় তুলিয়ে নিয়ে গেছে চৌকিদারে।
ফিরে এসেছেন দণ্ড দিয়ে রাজদ্বারে।।

কত লোক বেশ্যালয়ে করি সুরা পান।
মৃত্যুবৎ পোড়ে থাকে হারাইয়া জ্ঞান।।
মাছীগুলো হাগে মোতে মুখেতে বসিয়া।
গুয়ে মুয়ে কেহ, কেহ বমিতে পড়িয়া।।
গৃহেতে অবলাগণে গণে কড়ীকাট।
নাথের স্বভাবে হয় ভেবে ভেবে কাট।।
কত কত কুলধ্বজ বিবাহ করিয়া।
কুলটা লইয়া রহে বনিতা বর্জ্জিয়া।।
তাই বলি বাল্যকালে দিলে পরিণয়।
হবে না যে বেচাল এ কথা২ নয়।।
বরঞ্চ দোষের বটে বাল্যকালে বিয়ে।
আপুনি ঠেকেচি আমি বাল্য বিভা দিয়ে।।

বিধিবাম ভায়! আমার জ্যেষ্ঠ্যপুত্র কপিঙ্গলকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য আমি যে কি পর্য্যন্ত চেষ্টা পেয়েছিলাম তা তুমি জান? কপিঙ্গল ছোটবেলা পর্য্যন্ত পাড়ার কতগুলো মন্দ বালকদিগের সঙ্গে খেলা কোরে বেড়াত বোলে সেইগুলি তার কুসঙ্গ হোলো। কুসঙ্গ হইলে আর-তো অধ্যয়ন হবে না? বিদ্যাশিক্ষা না করিলে সহজেই দুশ্চরিত্র হয়। একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই, সঙ্গদোষে বেশ্যাগামী এবং নেশাখোর হোয়ে পোড়লো। বেশ্যাগামী এবং নেশাখোরদিগের সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন হয়। কপিঙ্গল একটী পয়সা উপার্জ্জন কোত্তে পাত্ত না বোলে, সহজেই হাতটানটা হলো। প্রথম প্রথম আমার পুঁথীগুলি চুরি কোরে নেগে বেচ্‌তে আরম্ভ কল্লে, দশ টাকার পুঁথীখানা দুই টাকায় ব্যাচে, দু টাকার পুঁথীখানা দুই আনায় ব্যাচে, আমি তার কিছুই জানিতে পারিনে। (পুঁথীরতো হিসাব নাই? দৈবাৎ যে খানার দরকার হোলো, খোঁজা গেলো) শেষে বাটীর থালাখানা ঘটিটে বাটিটে ও গহনাখানাও যেতে লাগলো। কপিঙ্গলের যে লেখাপড়া হয়নি আমি কেবল এইটী জানতেম? অমন যে এককালে উচ্ছন্ন গ্যাচে এবং ঐ যে দ্রব্যাদি চুরি কোরে নে যাচ্চে তা আমি একটী দিবসের জন্য মনে মনে ভাবিনে। অপর চোরে চুরি কচ্চে, এই জানতেম "চৌর্য্য বিদ্যাতে তস্করদিগের যেরূপ প্রবৃত্তি জন্ময়, সাধারণের শাস্ত্রবিদ্যায় সেরূপ

মন হয় না?" কপিঙ্গল প্রথমতঃ ঘরের দ্রব্যাদি অপহরণ কোরে সাহশ বেড়ে গ্যাচে, তারপর বাইরে বাইরে ঐ কাজটী কোত্তে লাগ্‌লো, ভায়া কথায় আছে, "দশদিন চোরের একদিন সেধের", একদিন ধরা পোড়ে গ্যাল। চৌকিদার ও জমাদারে বেঁধে নিয়ে যাচ্চে; লোকে যখন আমার কাছে এসে তার কথা বল্লে, তখন আমার মনটা এমনি হলো, যে গলায় দড়ী কিম্বা ছুরী দিয়ে প্রাণটা ত্যাগ করি। এক একবার পৃথিবীকে দু ফাঁক দিতেও বল্লুম। ছেলের অখ্যাতি এবং দুর্নাম হোলে, পিতার যে কি পর্য্যন্ত মন হয়, তাহা যাহার ছেলে বোয়ে গ্যাচে, তার পিতাই বোল্‌তে পারে। (মানুষের মনের মধ্যে শোক কিম্বা অপমানের ভাবনা সমভাব থাকলে, কেহই বাচতো না) ক্রমে ক্রমে আমার যে মনটী কমে এলো। তখন মেজ ছেলেটী কিসে মানষের মতন হবে, সেই ইচ্ছাটাই বলবতী হোয়ে উঠ্‌লো। "ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়" সেইরূপ কোনো বালকদিগের সঙ্গে মেজ ছেলেটীকে আর বেড়াতে দিলেন না। তাহার লেখাপড়া এক রকম বেশ হোতে লাগলো।

আমার মেজ ছেলেটীর নাম গণায়ক, তাহার বারো বৎসর বয়েস হোতেই একদিন ব্রাহ্মণী আমাকে বোল্লে যে, "গণনায়কের এইবেলা বিয়ে দাও, বাল্যকালে বিবাহ্ দিলে আর খারাপ হবে না।" স্ত্রীর কথাটী তখন আমার এক রকম মনে লেগেছিল। পাঁচ সাত দশ দিবসের মধ্য একটী দশ বৎসরের মেয়ে স্থির কোরে গণায়কের বারো বৎসর বয়েসের সময় বিয়ে দিয়ে ছিলুম। লোকে কথায় বলে "মেয়ে মানষের বাড় আর কলাগাছের বাড়", কেও বলে "বিয়ের জল মাথায় পোড়লে মেয়ে মানুষ বেড়ে উঠে", দুই কথাই মানতে হয়। দু বৎসর না যেতে যেতে বৌমা যেন প্রকোত একটী মাগী হোয়ে পোড়লেন; ঘর ঘরকন্নার সমস্ত কাজকর্ম্ম করেন, ও পাচজন মেয়েমানুষের মধ্যে একজন গণ্ণীয়া হোলেন। গণায়ক সেই সবে চোদ্দতে পা দিলে; লোকের কাছে বোস্‌তে পারে না, মন খুব চঞ্চল, ও ছোঁড়ার স্বভাব। চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে সকলের অধ্যয়ন কিছু ভাল হয় না? গণায়ক সে সময়ে উত্তম রূপে লেখাপড়া শেখেনি; আর যে লেখাপড়া শিখ্‌বে, এমত আর মন রইলো না। স্ত্রীবাধ্য হোয়ে কিসে দশ টাকা উপাজ্জন কোর্‌বে সেই চেষ্টায় ফিত্তে লাগলো। লেখাপড়া একটু ভাল রকম কোল্লে বুদ্ধি ভাল এবং ধীর

হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা কোত্তে পারে, এবং সহজেই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন কোরে সৎ ব্যয়ে ব্যয় এবং অসময়ের জন্য ধনরক্ষা করিয়া ধরাধামে একজন নরনামের যোগ্য হয়।

গণায়কের বাল্যকালে বিয়ে দিতে অধ্যয়ন ভাল হোলো না, বুদ্ধি এবং বিবেচনা খুব কম হলো, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনায় রহিত হলেন। যে কথঞ্চিৎ উপার্জন কত্তে লাগলো, তাহা বাল্যকালাবধি স্ত্রীবাধ্যর কারণ সমস্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণও অলংকারাদিতে ব্যয় করিতে লাগিলেন। আমাদিগের কষ্টের সীমা নাই। কোনদিন অর্দ্ধাশন কোনদিন উপবাসে দিন যেতে লাগলো, একটী দিন একটী পয়সা দিয়ে উপকার করেনি। একদিন ব্রাহ্মণী গণায়ককে আপনাদিগের দুঃখের কথা জানাতে কোন উত্তর না দিয়ে তাহার পরদিবসে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়া বাস কল্লেন।

ভায়া! বাল্যবিয়েতো ভাল নহে? বাল্যকালে বিবাহ দিলে প্রথমতঃ অধ্যয়নে অনাস্থা হয়, দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার প্রতি কিরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য তাহা না জেনে পূর্ব্বেই প্রেমদার বশীভূত হইয়া পড়ে।

আমার নিকটে যদি চাহ উপদেশ।
শুন ভাই তবে আমি বলি সবিশেষ।।
দিও না কুসঙ্গ হোতে বালকে কখন।
বাল্যকালে করাইবে বিদ্যা অধ্যয়ন।।
কুসঙ্গ না হয় আর যদি করে যত্ন।
অবশ্য লভিবে শিশু তবে বিদ্যারত্ন।।
কুসঙ্গ হইলে আর নাহিক নিস্তার।
কোন দিকে সুউপায় হইবে না তার।।
বাল্যকালে সঙ্গদোষে বিদ্যা নাহি হয়।
যৌবনে কুসঙ্গীগণে কুমার্গতে লয়।।
কুপথে যাইবে শিশু ভাবিয়া এমন।
বাল্য বিভা তনয়ের দ্যায় যেইজন।।
একেত তাহাতে হোলো বিদ্যায় বঞ্চিত।
দ্বিতীয়তঃ সঙ্গদোষে হলে উপস্থিত।।

অনল কি বসনেতে কভু ঢাকা থাকে।
কুপথে কুসঙ্গ দোষে টানিবেক তাকে।।
রাখিতে কি পারিবেক রমণী ধরিয়া।
কেবল একাকি ঘরে কাঁদিবে বসিয়া।।
মুখের একথা নহে কাজে হলো কত।
মনে ভেবে দেখিলে দেখিবে শত শত।।
নাহিক কুসঙ্গ আর দেহে বিদ্যা আছে।
কুচাল কি কখন এগোয় তার কাছে।।
বিদ্যালাভ জ্ঞানলাভ হইবে যখন।
বাল্যকাল দেহ ত্যাজি করিবে গমন।।
তখন উচিত হয় দিতে পরিণয়।
বাল্যকালে বিভা দেওয়া মম যুক্তি নয়।।

বিধি: মহাশয়! বাল্যবিবাহ কি তবে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে? আমি বোধ কোরেছিলাম যে বাল্যবিবাহ খুব ভাল; এক্ষণে মহাশয়ের নিকটে শুনে আবার খুব মন্দ বিবেচনা হোচ্চে।

নিধি: ভায়া। ওটা কেবল তোমার দোষ নহে, আজ কাল অনেকেরই অমনি মন হোয়েচে। কোন বিষয়ের বিবেচনা না কোরে পাতাল ফোঁড়া একটা কর্ম্ম কোত্তে যায়। যার একটু বিবেচনা আছে সে অপর লোকের নিকটে পরামর্শ চায়, যিনি আপনা আপনি আপনাকে মানী এবং জ্ঞানী বোধ করেন, তিনি কারেও কিছু না বোলে একটা কর্ম্ম কোরে ফ্যালেন। দেখলেন কত লোক কত বিষয়ে হস্ত দিলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিবেচনা কোরে কর্ম্ম করাই ভাল। নতুবা পাগলামো কোরে লোক হাসান ভাল নহে।

বিধি: মহাশয়! তা না হোলে আর আপনার কাছে আস্‌বো কেন? যে রকম দেশাচার হয়েছে, বোলতে গেলে আর কিছু থাকবে না, কত লোকই যে কুপথগামী হোয়েচে, তা আর বোলে জানাতে পারিনে। আবকারি, অসভ্যতা, বেশ্যা, অত্যাচার, যদেচ্ছা আহার, অন্যায় বিচার, অপব্যয়, উচু চাল ও অন্য প্রতি দ্বেষ, এই কএকটী দোষেই এদেশ উচ্ছন যাচ্চে। আবকারির কথা কি

বোলবো রাত্রে মাতালদিগের জন্য পথে চলা ভার হোয়ে উঠেচে, কতগুলো এমনি মাতাল আছে, মুখে একটু মদ মেখে পথে কেবল লোকের দ্রব্যাদি হরণ করে, রাত্রে তাহাদিগের নিকটে নামাবলী খানি পর্য্যন্ত পার পায় না। অসভ্যতার কথাই নাই। বেশ্যা যে পল্লীতে নাই এমত পল্লী নাই এবং যে বেশ্যালয়ে মদের ব্যাপার কিম্বা বিবাদ কলহ না হয়, এমত বেশ্যালয় নাই। অত্যাচার কোত্তে পেলে তারা আর কিছু চায় না। আহারের বিচার নাই। মিছে তর্ক করেন। অসৎ ব্যয়ে বিপুল বিভব ব্যয় হয়। একজন সামান্য মানুষের চাল দেখলে একজন নবাব সুবো বোলে বোধহয়। পরের মন্দ চেষ্টা করেন। কতগুলি লোকের এই সকল দোষেই এদেশ যেতে বোসেচে।

নিধি: ভায়া! এখন কি দেখ্‌চো, তোমরা আরো কত দেখবে, ভবিষ্য পুরাণের মধ্যে যে গুলি লেখা আছে তাতো ফোলবে?

বিধি: বলেন কি মহাশয়! এর চেয়েও কি আরো বাড়বে? এখন ভালোয় ভালোয় দিন কটা শেষ কোরে যেতে পাল্লে যে হয়? বাপরে! মন না মতি; কবে কি হবে কিছু বোলতে পারিনে। যে, কালের বল দেখচি? কত কত লোকেরা স্ত্রীর লোকে কিম্বা অন্য কোন মনের দুঃখে (মাথার চুল পেকেচে, দাঁত পোড়েচে, গায়ের মাংস লোল্‌ হয়েচে) তাঁরাও পাকা ঘুঁটী কেঁচে বসার মতন খাবার খেতে বোসেচেন।

নিধিরাম: তাই তো! এক একবার ভয় গো।

বিধি: মহাশয়! বেলা হোলো এখন স্নানপূজাদি করুন, এক্ষণে আসি।

নিধি: চোল্লে ভাই, এস তবে, তোমার পুত্রের বাল্যকালে বিবাহ কোনো মতেই দিও না আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে বারণ করিতেছি। বিদ্যা উপার্জ্জন হোলে বিবাহ দিও যে পরম সুখের বিষয় হবে।

বিধি: যা আজ্ঞে কোরবেন, তার কি আর কোন অন্যথা হবে? আমাদিগের আপুনি ভিন্ন মতামত দেবার আর কে আছে? মহাশয় আশী তবে।

(নিধিরামের প্রস্থান)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা।

প্রথম ভাগ।

বাদু মহেশ্বরপুর নিবাসী।

শ্রীপ্যারিমোহন সেন

প্রণীত।

কলিকাতা।

শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭০।

[1863]

রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল আড়খেম্‌টা।

যদি কেহ সুখী হতে চাও। হিত কথা বলি শুন উপদেশ লও।। পর স্ত্রী পর ধন, সদা করিবে হরণ, মিথ্যা কথা প্রতারণ, এই কার্য্যে রও।।
মিছে কাল কর গত, মদ্য পানে হও রত, সুখ পাবে বিধিমত, বেশ্যাসক্ত হও।।
হাস খেল অনিবার, ত্যজ পুত্র পরিবার, কহিলাম এই সার, ইথে মন দাও।।

সাধু লম্পটের প্রবেশ।

কোন সাধু সহর দর্শনার্থ কলিকাতায় আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় একটী গীত তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সেই গীত শ্রবণ করিয়া গায়কের নিকটে উপনীত হইলেন, এবং গায়কে কহিলেন, আপনি কে? গায়ক কহিল, আমি লম্পট।

সাধু। আপনি যে গীত গাইতেছিলেন, আমিত তার ভাব বুঝিতে পারিলাম না; বেশ্যাসক্ত মদ্যপান কি আবার সুখ?

লম্পট। (হাহা শব্দে হাস্য করিয়া) ওহে সাধুবর! তা বুঝি এদ্দিন টের পাওনি, আ, আমার পোড়া কপাল, তুমি বিশেষ রূপে অনুসন্ধান কর, তা হলেই জানিবে যে, সকল ব্যক্তিই উহাতে লিপ্ত হইয়া দিন রাত্র আমোদে কাল যাপন করিতেছে।

সাধু। হা রাম বল, সেকি, এমন কি কখন হয়।

লম্পট। ওহে সাধুবর তুমি কিছুই জান না।
মন দিয়া শুন সাধু করি নিবেদন।
সহরের চারিদিক কর নিরীক্ষণ।।
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি বুঝিবে।
মম সহ তর্ক তুমি আর না করিবে।।

সাধু। ইহা শুনি সাধুবর মনে মনে হেসে।

দেখিগে সহর বলি চলে অবশেষে।।
মনে ভাবে একি কথা বুঝিতে না পারি।
সত্য কি সহর সুদ্ধ সবে স্বেচ্ছাচারী।।
ভাবিতে ভাবিতে সাধু ধীরে ধীরে যায়।
কত রূপ অপরূপ দেখিবারে পায়।।
যে দিকে ফিরায় আঁখি সেই দিকে রাঁড়।
মারামারি হুড়াহুড়ি টানাটানি ভাঁড়।।
কেহ কার মেরে চূর্ণ করিতেছে হাড়।
তবু সে না ছাড়ে রোক যেন হট্ট যাঁড়।।
গোলমাল শব্দে হলো জড় কত লোক।
উহাদের জন্যে কেহ নাহি করে শোক।।
সবে বলে মার মার হই হই শব্দ।
দেখে শুনে সাধুবর হয়ে রয় স্তব্ধ।।

(স্বগত) রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা, এই কথা যে শুনিলাম পথে না আস্‌তে আস্‌তেই দেখিতে পাইলাম, আহা! উহাদের মেরে আদমারা কল্লে, তবু কেহই ধরিল না, আর উহারাওত কম নয়; (প্রকাশ্যে) যা হোক এত বিষম মাৎলামি কাণ্ড এখন পালাই কোথা?

লম্পট। ওহে সাধুবর! তোমার এরূপ অবস্থা দেখিতেছি কেন বোধ হয় অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ।

সাধু। হাঁ যথার্থই বটে, এক্ষণে কি উপায় করি? আর কোথায় বা যাই?

লম্পট। হাস্য করিয়া কহিল, কোথায় যাইবে তাহা আবার চিন্তা করিতেছ? আমার সহিত আইস, সোণাগাজি নামে প্রসিদ্ধ স্থান আছে ঐ স্থানে চল নে যাই!

সাধু। সে কিরূপ প্রসিদ্ধ স্থান, সেখানে কি কোন দেবালয় আছে? কিম্বা কোন আশ্চর্য্য বস্তুর দর্শন হইবে।

লম্পট। সেই স্থান কেমন আশ্চর্য্য তাহা শ্রবণ কর।
কি আশ্চর্য্য সোণাগাজি রমণীয় স্থান।

গেলে পরে সুশীতল হয় মন প্রাণ।।
আনন্দের সীমা নাই প্রতি ঘরে ঘরে।
সুখ ভয়ে দুঃখ যেতে নাহি পায় ডরে।।
অধর্ম্মের লজ্জা হয় ধর্ম্ম ভয় পায়।
দেখিবে কেমন স্থান চলনা তথায়।।

সাধু। চল যাই দেখিগে (ইহা বলিয়া গমনান্তর) দেখিল কোন স্থানে গাওনা বাজনা হইতেছে তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যাহারা গাওনা বাজনা করিতেছে উহারা কিরূপ মনুষ্য?

লম্পট। গীত বাদ্য যত লোক করিতেছে তথা।
কহে না ভুলেও সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা।।
রাঁড় ভাঁড় লয়ে সবে হয়ে আনন্দিত।
সর্ব্বক্ষণ রাখে চিত্ত করি প্রফুল্লিত।।
গালাগালি ঢলাঢলি মুখে কত বোল।
এইরূপ সারা নিশি করে ওরা গোল।।
দিনমানে যাঁরে দেখে নমস্কার করি।
রজনীতে তাঁরে দেখে লজ্জা পেয়ে মরি।।

এই কথা শেষ না হতেই দেখিল কোন এক মান্যমান বাবু রাঁড় সঙ্গে করিয়া মদের বোতল হস্তে লইয়া যাইতেছেন তাহা সাধুর ঐ স্থানেই প্রত্যক্ষ হইল।

রাঁড় ভাঁড় সঙ্গে রঙ্গে চলিতে চলিতে।
পড়িল দুড়ুম করে টলিতে টলিতে।।
হাহা করে হাসিয়া উঠিল কত জন।
অপার আনন্দ তায় প্রফুল্লিত মন।।
সঙ্গিনী ছিলেন যিনি তুলে অবশেষ।
ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা বলে বেস্ বেস্।।
আমরি হয়েছে ভালো চল২ চল।
টলিতে টলিতে বলে কোথা যাব বল।।
কি হইল বল প্রাণ আমার বোতল।

শুনিয়া হাসিল রামা খল খল খল।।
বলে কালামুখো তোর লজ্জা কিছু নাই।
আবার বোতল চাহ মুখে তব ছাই।।
যদি তুমি নাহি দেও বোতল আমারে।
এখানে থাকিব আমি না যাইব ঘরে।।
দিবরে বোতল তোরে চল ঘরে যাই।
হাত ধরে টানে বলে একিরে বালাই।।
কতরূপ রামা তারে ছল বল করে।
বহু কষ্ট পেয়ে পরে লয়ে গেল ঘরে।।

সাধু। এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া (স্বগত) কালের কি গতি যখন এখানেই এরূপ আড়ম্বর দেখিলাম না জানি আরো কিছু দূর গেলে কত দেখিব (প্রকাশ্যে) দেখা যাক্ আরো কি রকম হয় এই বলিয়া যাইতে যাইতে দেখিল।

ছোট বড় কত লোক দলে দলে দলে।
আনন্দেতে যাইতেছে টলে টলে টলে।।
ইংরাজী বাঙ্গলা হিন্দি মুখে কত বোল।
কেহ বা করিছে পথেঁ মিছে গণ্ডগোল।।
কেহ বলে য়ি ডিয়ার ভেরিগুড রম।
ভালা নহী হ্যায় বাবা নেশা বড় কম।।
কেহ বলে উহু মরি বুক ফেটে যায়।
বলিতে বলিতে টলে পড়িল তথায়।।
ইহা দেখি ইয়ারেরা হাত ধরে তোলে।
বলে বাবা কত মজা আছে লাল জলে।।
ইহার যে কত গুণ কি বলির হায়।
এইরূপে চলিতেছে কথায় কথায়।।

সাধু। এই সকল রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া লম্পটকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে, রাঁড় ভাঁড় ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলে তাহা সত্য বোধ হইতেছে. কিন্তু সহরের

সর্ব্ব স্থান না দেখিলে বিশ্বাস হয় না, অদ্য অধিক রাত্রি হইয়াছে অতএব অদ্য যাওয়া যাক্ চল কল্য সাক্ষাৎ হইবে। উভয়ে সহরের অন্যান্য সকল স্থান দেখিয়া ইহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিব।

পর দিন মধুবার (শনিবার) সন্ধ্যার সময় সাধু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে লম্পটের সহিত সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কথোপকথন করিতেছেন এক্ষণে কোথা যাওয়া যায়।

লম্পট। যাইবার ভাবনা কি, মেছুয়া বাজার নামে এক উত্তম স্থান আছে অগ্রে সেই খানেই চলুন, পরে আর২ স্থানে যাওয়া যাইবে।

সাধু। আচ্ছা তবে চল। (উভয়ের গমন)

সুখময় শনিবারে, চলে মেছুয়া বাজারে,
হেরিবারে হর্ষ হয়ে মনে।
হতেছে সুখ প্রসঙ্গ, দেখিতেছে বহু রঙ্গ,
পথে বসে আছে বেশ্যাগণে।।
কি করে গো কাযে কাযে, বসে আছে পথমাঝে,
যদি কেহ যোটে কোনমতে।
বারাণ্ডা ছাতেতে কত আধ বুড়ী মাগী যত
বসে আছে ওই আশয়েতে।।
পরিয়ে জল তরঙ্গ, করিছে কতেক রঙ্গ,
সর্ব্ব অঙ্গ যাইতেছে দেখা।
কেহ পরি শান্তিপুরে, নীলাম্বরী কালা ডুরে,
কেহ পরিয়াছে পেড়ে লেখা।।

লম্পট। কেমন হে সাধুবর কি দেখ্‌লে বল দেখি।

সাধু। কতকগুলি স্ত্রীলোক বসন ভূষণ পরিধান করিয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম, কিন্তু উহাদিগের মনের কি ভাব আর বয়স কত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

লম্পট। উহাদিগের বয়সের কথা কি বলিব আমার জ্ঞানের উদয় হওয়া পর্য্যন্ত

উহাদিগকে ঐ প্রকার দেখিতেছি তবে যে উহারদের অল্প বয়স বোধ হয়, তাহার কারণ এই।

শুকাইয়া গেছে কুচ,   কাঁচলিতে করে উচ,
বুড়ী যেন ছুঁড়ী হইয়াছে।
তাহে গিল্‌টির গহনা,   দূরেতে না যায় জানা,
সব বোঝা যায় গেলে কাছে।।
আর তাদের চরিত্র কেমন।
লূতা যথা পাতে জাল,   নাহি মানে কালাকাল,
বধিতে পতঙ্গ কীট গণ।
তাহারাও সেইমত,   জাল পাতা কর্ম্মে রত,
ধরিতে পতঙ্গ রূপ মন।।

সাধু। সে কি প্রকার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

লম্পট। হাঁ, তুমি বুঝ্‌দে পার্ব্বে না, কেন না তুমি ইহার মর্ম্মজ্ঞ নহ, অধিক আর কি বলিব।

সাধু। বলই না কেন শুনি তা হইলে যদি বুঝ্‌দে পারি।

লম্পট। বারাঙ্গনাগণ,   হয় হে কেমন,
কহি শুন কিছু তবে।
নাহি দয়া লেশ,   ধর্ম্মে করে দ্বেষ,
কিসে পরধন লবে।।
কথায় কথায়,   প্রণয় বাড়ায়,
কত বা বলিব আর।
আহা মরি মরি,   কতই চাতুরী,
বুঝে হেন সাধ্য কার।।

আর তাহাদিগের চরিত্র কি রূপ, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কাছে গেলে সকল জানা যাইতে পারে, অতএব তুমি চল তা হলেই জান্তে পার্‌বে।

সাধু। যাইলে ত সমাদর করিবে?

লম্পট। (হাস্যের সহিত) হাঁ সমাদর করিবে বই কি।

সাধু। হাসিতে হাসিতে বলিলে যে?।

লম্পট। হাস্‌লেম কেন তবে বলি শুন।

কেহ কার পাশে, আছে পরিহাসে,
যদি কেহ গেল আর।
তখন তাহারে, চিনিতে না পারে,
বসিল হইয়া তার।
যেন কেনা ধন, হইয়ে তখন,
করিবে ছলনা কত।।
যোগাইবে মন, করিয়ে যতন,
হয়ে তার মনোমত।।
কহিবে তাহারে, তোমারে না হেরে,
যে করে আমার মন।
বলিতে না পারি, গুমুরিয়া মরি,
তব লাগি প্রাণধন।।
না পারি সহিতে, বিস্তার কহিতে,
রাঁড়ের চাতুরী বাক।
কহিব যতই, বাড়িবে ততই,
কায নাই আর থাক।।

সাধু। বল বল আর কিছু শুনি।

লম্পট। হয়েছি অবাক, সাজে না তামাক,
কেহ কেহ হেন আছে।
কিন্তু দিনমানে, নিত্য ধান ভাণে,
গুমরে বসেনা কাছে।।

সাধু। এমন চরিত্র যদি তাহাদিগের তবে ঐ স্থানে লোকে যায় কেন?

লম্পট। (হাসিতে হাসিতে) মনুষ্য বিবিধ প্রকার আছে, তাহা জ্ঞাত আছেন, তবে যাহারা বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী এবং মিথ্যাবাদী তাহারাই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকেন।

সাধু। যে প্রকার তুমি তাহারদিগের গুণ বর্ণনা করিলে তাহা হইলে ঐ স্থানে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

লম্পট। পূর্ব্বে আপনাকে কহিয়াছি, মদ ও রাঁড় ইত্যাদি এই সকল সুখে নিমিত্ত হইয়াছে, আর ঐ স্থানে যাহারা সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকেন তাহারা ইয়ারলোক মধ্যে গণনীয়।

সাধু। তবেত ইয়ারলোক বড় মন্দ?

লম্পট। ইয়ারলোক মন্দ এমন কথা বলিবেন না, তাহারা সাধারণ লোকের মধ্যে গণনীয় নহে, তাহারা আশ্চর্য্য লোক এবং সর্ব্বলোকের উপর।

সাধু। সে কি প্রকার?

লম্পট। সে ইয়ার লোক, ছাড়া এ ভূলোক,
তারা সামান্যত নয়।
বলিব না আর, ইয়ার বেজার,
হইবে গো হয় ভয়।।
নতুবা সকল, করিয়া কৌশল,
লিখিতে যে পারি পাঁতি।
ভদ্র জাতি যত, কুকাযেতে রত,
এত নাহি অন্য জাঁতি।।

সাধু। ওহে লম্পট মহাশয় এই বলিলেন ইয়ারলোক সর্ব্ব লোকের উপর, তাহারাই শ্রেষ্ঠ তবে তাহারদিগের গুণ বর্ণনা করিতে এত ভয় পাইতেছেন কেন? তোমার এ সকল কথার ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না।

লম্পট। আপনি সাধুলোক, তাহারা ইয়ারলোক আপনি তাহারদিগের গুণাগুণ ও ভাব কি প্রকার বুঝিতে পারিবেন তবে যদ্যপি ইয়ারলোকে যাইতে পারেন তাহা হইলে সকল জানিতে পারিবেন, আর ইয়ারের যে ধর্ম্ম সে অতি বিচিত্র তাহাতে সুখ বই দুঃখ নাই; চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সেখানে গেলে পদবৃদ্ধি ও সকলের নিকট মহামান্য হইতে পারিবেন।

সাধু। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ইয়ার কি প্রকার হইতে হয় আর ইয়ারের ধর্ম্ম কর্ম্ম কি রূপ?

লম্পট। তবে সংক্ষেপে কিছু বলি শ্রবণ করুন

কর মদ্য পান, ঠাণ্ডা হবে প্রাণ,
বাড়িবে গৌরব মান।
মিথ্যা কথা কবে, পরধন লবে,
পরকালে পাবে ত্রাণ।।
শুন হে এমত, ইয়ারের মত,
এই পথ তবে ধর।
তা হলে মঙ্গল, হইবে সকল,
যদি তুমি ইহা কর।।
আর কিছু বলি, খাবে গাঁজা গুলি,
পরে হোটেলেতে যাবে।
কিনবে হে রুটি, মুর্গী এণ্ডা দুটি,
মাংস যত পার খাবে।।
দেহ ভাল হবে, সন্তোষেতে রবে,
আছে পূর্ব্বাপর রীতি।
ঘরেতে যেওনা, স্ত্রীকে ছুঁইওনা,
ইয়ারের এই নীতি।।
সংসার আশ্রমে, নাহি যাবে ভ্রমে,
বেশ্যার ঘরেতে বাস।
যোগাইবে মন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
হয়ে রবে তার দাস।।
মম বাক্য ধর, তাহে ত্বরা কর,
হও হও হে ইয়ার।
বৃথা যায় দিন, ক্রমে আয়ুঃ ক্ষীণ,
দিওনা যাইতে আর।।
কহিনু যে রূপ, কর এইরূপ,
রবেনা যমের ভয়।

ইয়ারের তরে, গোলোক উপরে,

বাস হয়েছে নির্ণয়।।

সাধু। তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি শ্রবণ করিলাম, কিন্তু শ্রবণে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম যে, এরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে পরকালে নিস্তার পায় (স্বগত) হায়! কি চমৎকার কাল এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য যে পথেই আছি, সেই পথেই থাকি কি ইয়ারলোকে গমন করি (প্রকাশ্যে) অদ্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে, চল যাওয়া যাক্ কল্য সাক্ষাৎ হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করা যাইবে।

লম্পট। আচ্ছা তবে চল। (উভয়ের গমন)

সাধু। ওহে লম্পট, কিসের শব্দ শুনা যাইতেছে না?

লম্পট। কই (কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া) সত্য বটে যেন কোন কামিনীর মলের শব্দ হইতেছে।

সাধু। এত রাত্রে মলের শব্দ হইবে, ইহা কি সম্ভব?

লম্পট। অসম্ভব বা কিসের? এ কলিকাতা, রাঁড় ভাঁড় ইত্যাদির কাণ্ড পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের রাত্রি দিন বোধাবোধ নাই, এই কথা বলিতে না বলিতেই দেখিতে প্াইল।

ঝমর ঝমর শব্দে ষোড়শী কামিনী।
আসিতেছে দ্রুতগতি যেন উন্মাদিনী।।
কেহ বলিতেছে প্রাণ কোথা তুমি যাও।
বারেক আমার দিকে চাও ওলো চাও।।
কেহ কহিতেছে বিবী কত দূর আছে।
বলে আর ঘেঁসে২ যায় তার কাছে।।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি তাহে একাকিনী।
কি ভাবে চলেছ কোথা না লয়ে সঙ্গিনী।।
কেহ বলে এ ছুঁড়ীর বড অহঙ্কার।
এখনি করিব আমি এর প্রতিকার।।
এইরূপ কথা শুনে নাহি করে ডর।

ঝমর ঝমর করি চলিল সত্বর।।
এক জন গিয়া দৌড়ে তাহারে ধরিল।
রাগত হইয়া রামা বাপান্ত করিল।।
বাপান্ত শুনিয়া বলে কি বলিলে বাপ।
শীতল হইল প্রাণ গেল মনস্তাপ।।
আর কিছু বল যাদু এই ভিক্ষা চাই।
মন প্রাণ ঠাণ্ডা করে ঘরে চলে যাই।।

এই সকল কথা শুনিয়া কামিনী আর কিছু না বলিয়া আরো দ্রুতগামিনী হইল।

দ্রুতগতি যায় রামা ত্রাসিত অন্তর।
ঝমর ঝমর মল ঝমর ঝমর।।
ঝমর ঝমর করে গেল এক বাড়ী।
তবে তারা হলো তার সঙ্গ ছাড়াছাড়ি।।

সাধু। ইহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কলিকাতা কি মজার স্থান, পূর্ব্বে শুনে ছিলাম যে, কলিকাতায় গেলে লোকের অবস্থা ফিরে যায়, তাহা আজ ঠিক মিলিল। কালের কি গতি কিছুই বোঝা যায় না, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গিয়েছে, জুয়া-চুরি, প্রতারণা মাত্‌লামি, এই সকল দিন দিন বাড়্‌চে, কলির করুণায় ক্রমে ক্রমে এই সকল যে ঘট্‌বে, এত আমাদের শাস্ত্রের লিখন। আর এ সকল কার্য্যে অবশ্য সুখ থাক্‌বে, তা না হলে সহর শুদ্ধ লোকেই কেন মুগ্ধ হয়েছে, ফলতঃ ধর্ম্মপথে আর সুখ নেই আজ কাল ধর্ম্মপথে থাক্‌লেই যেন দুঃখ এসে অমনি ধরেছে, আমি ক্রমে ক্রমে সাধুর পথে যাব স্থির করে ছিলাম, দূর হউক আর সাধুত্বে কায নাই, সহরের ভাব গতিক দেখে আমার মন কেমন২ করিতেছে একবার সহরের মজা লুটে দেখিইনা কেন।

সাধু। (প্রকাশ্যে) হে মহাপুরুষ লম্পটবর! তুমিই ধন্য! তুমি বিলক্ষণ সুখে আছ, আমি চিরকালটা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে অসুখে কাটাইলাম, আর আমি সাধুত্বও চাহিনা, চল একবার প্রমোদদায়িনী বারবিলাসিনীগণের সুখদ সহবাস দ্বারা অপবিত্র জীবন সফল করি।

লম্পট। (স্বগত) এমন বিষয়টি নয়, যে কেহ দেখে শুনে চুপ করে থাক্তে পারে, (প্রকাশ্যে) সাধুবর, আমি পুর্ব্বেই আপনাকে বলেছি যে, ইয়ারকিতে আজকাল বড় মজা আছে, তখন ত আমার কথাটা তুচ্ছ করেছিলে এখন টের পেলেন্ ত, তবে চলুন আর বিলম্ব করে কায নাই, ক্রমে রাত অধিক হচ্চে এর পর প্রেমবিলাসিনীদের আর পাবেন না। (উভয়ের গমন)

(সহরের ভাব সাধু করে দরশন।
ধর্ম্মরত্ন একেবারে দিয়ে বিসর্জ্জন।।)

সাধু। বলিতেছে লম্পটেরে বিনয় করিয়া।
থাকিতে না পারি আর দেখিয়া শুনিয়া।।
ধর্ম্মপথে চিরকাল থেকে কি হইল।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বৃথা জীবন কাটিল।।
চল গিয়া বারাঙ্গনা মুখশশী হেরি।
জুড়াই তাপিত প্রাণ করোনাক দেরি।।
অনন্তর সাধুবর লম্পটে লইয়া।
বেশ্যালয়ে যান তবে উৎসুক হইয়া।।
দুজনে তথায় তবে উপনীত হয়ে।
বেশ্যারে কহিছে কত হাসিয়ে হাসিয়ে।।
মধুর ভাষিণী কর প্রেম আলাপন।
আশু কর সুশীতল তাপিত জীবন।।
সাধুবর বারস্ত্রীব প্রেম আলাপনে।
বদ্ধ হয়ে রহিলেন সুখ পেয়ে মনে।।

এইরূপে সাধুবর বেশ্যাসক্ত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, পরে তাহার যে রূপ অবস্থা হইল তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ইতি প্রথম খণ্ড।

কি মজার কলের গাড়ি।

শ্রীমুন্সী আজিমদ্দীন প্রণীত।

শ্রী কাজী সফিউদ্দীনের আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা স্ট্রীটে
৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্রে
মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫।

এই পুস্তক চাঁদনীর ১নং গলিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
মূল্য ।০ আনা মাত্র।

[1863]

কি মজার কলের গাড়ি বাওহা কি বাওহা।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কি মজার কলের গাড়ি

গীত।

রাগিণী হাবড়ার ঘাট। তাল শিয়ালদহের মাঠ।

বানিয়েছে রেল, রোডের গাড়ি ধন্য সাহেব কারিকর।
এখন বিশ্বকর্ম্মার পূজা ছেড়ে ঐ সাহেবকে পূজা কর।।
কত সব বউরী ঝিউরী, কি ছুঁড়ী কি যুবা বুড়ী,
দেখতে যায় তাড়াতাড়ি, ঐ গো দিদি কলের গাড়ি।
লোহার চাকা লোহার গাড়ি, লোহার উপর রেখে ভর। ঐ
আয় গো দিদী বেলা গেল, মাথা বাঁধি গিয়ে চলো,
ইষ্টিসনে গাড়ি এলো, বঁধু আস্‌বার কথা ছিলো, আহ্লাদে
ঢলিয়া পড়ি, ধর গো দিদী ধর গো ধর।। ঐ

বয়েদের সঙ্গে শাশুড়ীর উক্তি।

শাশুড়ী। বলি ও গো বয়েরা, তোরা কি পাঁদাড়ে দাঁড়ায়েই থাক্‌বি গা? ঘরে কি আর কর্ম্ম নেই, বাপের বয়েসে কখন গাড়ি দেখিসনি না কি।

বউ। হেঁ বাবু আমরাই না হয় দেখিনি, তোমারি বাপ বউ দেখেছে তা কৈ, আই ঠাক্‌রোণকে জিজ্ঞাসি যাই দেখি কেমন তোমার কলের গাড়ি দেখেছেন।

আই বুড়ীর আগমন।

বয়েরা। প্রণাম আই আশীর্ব্বাদ করো।

আই বুড়ী। আশীর্ব্বাদ আর কি কর্‌বো লো, এখন তোদের অদৃষ্টক্রমে ইংরাজ বাহাদুরেরা কল বানিয়েছেন, সেই কলেতেই সকল কল চল্‌ছে।

বয়েরা। হাঁ গা আই, সকল কল চল্‌ছে কি গা, আরো কি কল আছে।

আই। (হাস্যরূপে) সে কি লো, তাও কি আর বুঝ্‌তে পারিস্‌নি নিত্তি২ তোদের কত্তা বাড়ীতে আস্‌ছে, এর চেয়ে কি আর সুখ আছে।

বয়েরা। ওরে বুড়ী বড় রসিক এক বল্‌তে আর বলে বসে, তোমার কি আর কত্তা বাড়ীতে আস্‌তো না।

বুড়ী। তা তো আস্‌তো, কিন্তু ঐ ন মাসে ছ মাসে তা আবার পথ চল্‌তেই ছেলের বয়েশ যেতো, তখন বারো বৎসর অন্তর একটা ছেলে হওয়া ভার হতো, এখন কলিকালে বৎসর ফিরতে দেয়নি, একটু করে সন্তান বাড়ে, তোমাদের তো এখন বৎসর ফাঁক যায় না।

বয়েরা। হাঁ গা আই বৎসর কাকে বলে, আমরা তো জানি না বোন্‌ এই তোমার কাছে শুন্‌লাম, কেমন রোজ রোজ বাড়ীতে আসে তাই জানি।

বুড়ী। তা জানবি কেন লো, তোরা খালি খেতে জানিস আর শুতে জানিস, তাকিই বলে, যাকে বলে ভাজা চাল তাকেই বলে মুড়ি।

বয়েরা। ও মা ভাল করে শুনি ভাই। কথায় বলে, তিন মামা যার, পরামর্শ নেবে তার, হাঁ গা আই অবৎসরে কি হয় না।

বুড়ী। তা হবে না কেনো লো, তা বলে কি আর আমাদের ছেলেপিলে হয়নি।

বয়েরা। তবে আর বৎসরে কায কি দিদী! আমাদের হলিই হলো ঐ যেমন মেছোনমানদের মোল্লারা বলে "মোরদা চাহে ভেঁস্তে যায়, চাহে দোজোকে যায়, হামারাছে কাম পুড়ি কচুড়ি।"

বুড়ী। তা তো বটে লো, তবু তো সময় অসময় আছে, ভাই কথায় বলে, আষাঢ়ে রোয় দলকে, শ্রাবণে রোয় ফলকে, ভাদ্রে রোয় শীষকে, আশ্বিনে রোয় কিসকে; সময় হয়ে গেলে কি আর সুখ আছে বোন্‌। আমাদের এখন আশ্বিন আস বল্লেই হয়।

যুবতীর উক্তি।

পয়ার।

তবে আই সাহেবেরা আমাদের পক্ষে।
বানায়ে কলের গাড়ি করিছেন রক্ষে।।
দিবা রাত্রি লয়ে পতি থাকি গো সর্ব্বরী।
প্রণাম প্রণাম করি বড় উপকারী।।

এমন উপকার আই কেবা কার করে।
নিজ পতি নিত্য নিত্য এনে দেন ঘরে।।
এমন না দেখি আই পৃথিবী ভিতর।
ধন্য ধন্য ধন্য বলি ধন্য করিবার।।

বুড়ী। তাতো বটে লো তার মধ্যে আর একটী মজা আছে, তা বল্‌ব না শিখে যাবি বোন্‌।

বউ। বল্‌না আই তোমাকে আমার দির্ব্বি তোমা হোতে যদি শিখি তবে তো তোমারি নাম।

বুড়ী। ওলো এখন পুরুষরা আর মেয়েদিগকে কিছু রুষ্ট বাক্য বল্‌তে পারে না।

বউ। কেন গা আই, ওলো তা কেমন করে বল্‌বে একটু ঘর কত্তে টক্‌ঝক হলে পরে অমনি চুপ করে তাড়াতাড়ি পরে সাড়ি, চেপে গাড়ি, মায়ের বাড়ি উপস্থিত হন।

বউ। হাঁ গা আই তবে আমরা বোধ করি বোন্‌ যে আমরা পূর্ব্ব জন্মে কত পুন্নি করেছিনু তাইতে এমন কলের গাড়ি আমাদের পক্ষে হয়েছে।

বুড়ী। হাঁ লো হাঁ! তোদেরি এখন দুদে চিনি তোরা এখন চাইকি একে আর কত্তে পারিস।

বউ। দুর বুড়ী তা যো কি, অমনি কারো সঙ্গে দুটো কথা কৈতে ভয় করে, কি জানি বোন্‌ যদি অম্‌নি ফক্‌ করে কত্তা এসে পড়ে।

অন্য স্থান বাসিনী নারীগণের গাড়ি দেখা পরামর্শ।

ননদী। ওলো বউ মাকে বলে চল্‌না লো, কেমন নাকি বোন্‌ কলের গাড়ি হয়েছে তা আপ্নি চলে, ও পাড়ার মেয়েরা কতকগুলি দেখ্‌তে যাচ্ছে।

বউ। হাঁ হাঁ? ঠাকুরঝি! তোমার এক কথা তাও কি হয় যা কখনো শুনিনি শুনিব না তোমার কাছে রোজ২ খবর আসে।

ননদী। হাঁলো হাঁ, আমার আর খেয়ে দেয়ে কায নাই তাই তোর কাছে মির্থে বল্‌চি, দেখ্‌গে না যেয়ে কল চল্‌চে কি না চল্‌চে।

বউ। তা চলুগ্‌গে বোন বাসনা থাকে যদি তবে দেখ্‌গে আপনাদেরি কে দেখে তার ঠিক নাই।

ননদী। তোর কি আর দেখ্‌তে মানস নাই লা?

বউ। থাকলেই কি করবো বোন্, গিন্নী কি যেতে দিবেন তা যাবো, অম্‌নি এক্‌লা জলের তরে গেলে কত মুক ঝাম্‌টা দেন, তা আর কলের গাড়ি দেখ্‌তে দিবেন।

ননদী। ওলো, তার এক বুদ্ধি বলি শোন, কলের গাড়ি কলে বলে দেখ্‌তে হয়। অম্‌নি কি যেতে দিবে কুটুম্বিতে যাব বলে যাই চল, তা হলে মা যেতে দিবেন।

বউ। হাঁ বোন্! বেশ বলেছ তা হলে পারি তবে চলো যাই।

এইরূপে কত শত কুলের কামিনী।
ছল করে এসে সবে দেখে কল খানি।।
কি কল বানালে কল কলে চলে কল।
দেখে কলে অঙ্গ টলে হাসে খল খল।।
কেহ বলে ওগো দিদী কে বানালে কল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কি সে দেখে আসি চল।।
এমন হিতাষী কল দেখি নাই দ্রহে।
সতী পতি নিত্য পায় যার অনুগ্রহে।।
কেহ বলে না গো দিদী দেবঁতা তো নয়।
বিলাতের পতি তিনি দেবতারি প্রায়।।
কেহ বলে ওগো দিদী আহা মরি২।
কল দেখে নাহি বল ঘরে যেতে পারি।।

নাগরদের গাড়িতে বাড়ী গমন।

ভাল মতে পরণেতে কালা পেড়ে ধুতি।
জামা গায় শোভা পায় পদে মোজা জুতি।।
লন হস্তে অতি ব্যস্তে ব্যাগ লয়ে জান।
ব্যাগের বাজার চীনে বাজার বাড়িল দোকান।।
পাড়াগেঁয়ে সকল ভেয়ে ভাবে মনে জ্বালা।

আপন ঘরে নাই পরে গাড়ির পোসাক তোলা।।
ভাবেন মনে পোসাক বিনে চড়িতে নারি গাড়ি।
যত করে রাখেন পুরে যাবেন যখন বাড়ী।।
যাইবেন বাটী পরিপাটী কেনে নানা দ্রব্য।
ভাবে ক্ষণে গাড়ী বিনে নষ্ট হবে সর্ব্ব।।
মিছরি কিনে মিঠাই আনে কেহ২ বেন্ধে।
চিনি সর্কর কিনে আতর না হয় সে নিন্দে।।
গিন্নিদের ব্যবহারের কারণ যাহা চাই।
শীঘ্র করে কিনে দরে দর করেন নাই।।
কেহ বলে দোকান খুলে শীঘ্র নাকি দিলি।
যায় গাড়ি তাড়াতাড়ি মোর মাথা খেলি।।
ক্লেশেতে বাটী যাইতে রাস্তা হাটা দায়।
দেহ বস্ত্র হয় রুষ্ট দেখেন টাইম যায়।।
কেহ কেনে আল্‌তা আনে আর যাহা চাই।
দর করে যায় ফিরে মনে লাগে নাই।।
কেহে কেনে দেখে শুনে মাজন মিসি ভাল।
এই ভাবে বাটী যাইবে সকল দ্রব্য নিল।।

বাবুদের টিকিট লওন।

বাবু। বলি কে আছ হে আমাদের এই সময়ে শীঘ্র করি চলো না যাই আর একদণ্ড গউন হলে তো আর বাড়ী যাওয়া হবে না।

সঙ্গি। হেঁ গো এই সময়ে যাই চলো ভিড়ভাড় নাই চারদণ্ড পরে আর ইষ্টিসনে ঢোকা ভার, ঐ যে কে বলেছিল, শুনেছি "মালাদের জাত, কে কার দেয় পোঁদে হাত।" তাই হয়ে পড়বে বেলাবেলি যাওয়াই ভাল।

পয়ার।

ছাড়ে গাড়ি রলে পরে বাঁশী ঘন বাজে।
অগ্নি জলে কল চলে যায় রেল মাঝে।।
অগ্নি জলে চলে গাড়ি বিলাতের কল।

কত শক্তি ধরে তাতে বলে মহাবল।।
রলওয়ের দুই দিগে দেখে সকলেতে।
ছাড়ে বিলাতের কল চলে আচম্বিতে।।
স্ত্রী পুরুষ দেখে চেয়ে যদি হন সতী।
এ কল দেখিতে মনে না ভাবেন ক্ষতি।।
দেখিছে কোনের বউ ঘোমটা টানিয়া।
এক চক্ষু রহে ঢাকা আর চক্ষু দিয়া।।
কুলের কামিনী দেখে কপাট আড়ালে।
দোতলা উপরে কত দেখে চক্ষু মেলে।।
দেখিছে ছাতের পরে উঠে আর বৈসে।
বিলাতের কলখানি কি প্রকার আইসে।।
দূরে হৈতে দেখে গাড়ি ভাবে মনে মন।
সাধ করি নিকটেতে করি দরশন।।
কত শত স্ত্রী পুরুষ দেখে কলখানি।
হায় মরি কি দেখিনু মনে মনে গণি।।
দণ্ডাইয়া দেখে কেহ মাথে দিয়া হাত।
মুখখানি বাঁকা যেন পাইল আঘাৎ।।
বুড়া বুড়ি যুব ছেলে দেখিছে সকলে।
কি কল করিল কল জলে জলে চলে।।
ছেলে গুলো কহে মাগো বাজে কলে বাঁশী।
কোলে তুলি লইয়া চলো গাড়ি দেখে আসি।
বালিকা যে দুগ্ধ ছাড়ে দেখে চক্ষু আড়ে।
চলিতে না পারে সেহ ঢলে ঢলে পড়ে।।
যুব নারী দেখে চেয়ে না ফিরায় আঁখি।
দেখিয়া কলের গাড়ি মনে হয় দুঃখি।।
কেহ বলে ওগো দিদী দেখ সবে চেয়ে।
কি রূপেতে মূর্ত্তিকায় যায় গাড়ি বেয়ে।।

শাশুড়ীকে কহে বউ ওগো ঠাকুরাণী।
সঙ্গে করে লয়ে চলো দেখি কলখানি।।
দুই দিগে দেখে সবে আছে দণ্ডাইয়া।
কেহ কার গায়ে পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া।।
গালে হাত রাখে কেহ হাসে খল খল।
কেহ কেহ ভাবে মনে পরম মঙ্গল।।
কেহ বলে ওগো দিদী স্থির হইতে নারি।
যখন বাজে কলে বাঁশী দেখিতে সাধ করি।।
ভাত বাড়ে খাইতে কেহ আসন পাতি বৈসে।
হেন কালে কলের গাড়ি শব্দ করে আইসে।।
অন্ন রাখি দাণ্ডাইয়া দেখে রসবতী।
ভাবে প্রাণে কত সতীর যায় ঘরে পতি।।
দুগ্ধের বালক কান্দে ডাকে ওগো মা মা।
রেগে কহে মাগী তখন দিবে না মা থামা।।
ইষ্টিসনে আইসে গাড়ি স্থির হয়ে কল।
স্ত্রী পুরুষ সর্ব্ব লোক করে কল বল।।
এ পড়িছে উহার গায় মুখের উপর মুখ।
গুমরিয়া রহে কেহ ভাবে কত দুঃখ।।
নীচ লোকের যত নারী কৌতুক বা কত।
দাণ্ডাইয়া আছে লজ্জা খেয়ে কত শত।।
সহর বাসি যাহার পতি ধৈর্য্য নহে তার।
শুনিয়া কলের শব্দ চাতকিনী প্রায়।।
নারীগণে মনে মনে কত কথা বলে।
দেখ গো দিদী দেখনা তোরা দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
অনেক দিবস হৈল ছেড়ে গেলেন সখা।
দিবা নিশি আইসে গাড়ি অদ্য নহে দেখা।।
দুই মাহা গত হইল গাড়িতে না চড়ে।

এ অভাগীর মন দুঃখ মনে নাই পড়ে।।
কেহ কহে দিদী তোমার কপাল ভাল।
চারি মাহা গেলেন পতি অদ্য নাই এলো।।
কেহ কেহ দুঃখ ভাবে বলে ওগো দিদী।
প্রাণপতি সনে আমার দেখা হয় যদি।।
কহিব মনের দুঃখ যত আছে মনে।
প্রতি দিবস আইসে গাড়ি না আইলেন কেনে।।
কোন নারী স্বামী প্যারী শুন গো দিদী তোরা।
প্রতি মাসে আইসেন পতি তবু প্রাণে মরা।।
কেহ বলে ওগো দিদী শুন মন খেদ।
বিদেশে গেলেন পতি করিয়া বিচ্ছেদ।।
শুন গো দিদী যাহার পতি আছেন জীবনে।
অবশ্য চড়িবেন গাড়ি ভাব মিথ্যা কেনে।।
এইমতে ক্ষেদ করে যায় সবে বাড়ী।
টাইম মধ্যে উপস্থিত বিলাতের গাড়ি।।

উপপতি-অসতী ধনীদের বিলাস।

যুবতী। ওহে প্রাণনাথ! বলি এখন বাড়ী যাও হোথা মাথা খেয়েছে যে, গাড়ী আস্‌চে কি জানি সে মুকপোড়া যদি এসে পড়ে।

উপপতি। কি কি প্রাণপ্রিয়ে এমন নিষ্ঠুর উক্তি ব্যক্ত কি প্রকার কল্লে্য হে।

যুবতী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রাণনাথ আর কাটা ঘায়ে লবণ দিও না।

গান।

যাও যাও হে প্রাণনাথ ঐ এলো এলো গাড়ি।
কি জানি সে সর্ব্বনেশে পড়ে যদি এসে বাড়ী।।
টাইম ছেড়ে অটাইমে, ধসো হে অধিনীর ধামে।
টাইম গেলে, তুমি এলে, সমর্পিব মধুর হাঁড়ি।।

গাড়ি উপস্থিত।

উপস্থিত হইলেন যাইয়ে বাড়ীতে।
সকলে যাগিয়ে আছে দেখে নয়নেতে।।
জল যোগাইয়া দিই পথে দেন জল।
মুখে জল দেন ভাবেন পরম মঙ্গল।।
জল পান করি বৈসেন উল্লাশে হৃদয়।
বন্ধুগণে সনে কথা সাক্ষাতে তথায়।।
এ দিগের ও দিগের কথা কহে কত শত।
গিন্নীকে না লাগে ভাল রাগান্বিত কত।।
কর্ত্তা সে কথায় মগ্ন গিন্নী নহে স্থির।
বিছানা বিছান তিনি হইয়া অস্থির।।
ঝাড়িলো শীতল পাটি শীতল সুইতে।
সর্বাঙ্গ শীতল করে সুস্থ শরীরেতে।।
ঝাড়িল পালঙ্গপোষ গালিচা সহিত।
নরম সে তুলা পোরা সুইলে মোহিত।।
ডাহিন বামেতে গ্রেদা ঝাড়িল রুমালে।
অলস রাখিতে ভাল রাখিল বগলে।।
কেহ কেহ তক্তপোষ ঝাড়িয়া আপনা।
যে যাহার মন মত করিল বিছানা।।
আস্তে ব্যস্তে ভোজন করয়ে তৎপরে।
শয্যাপরে জান কর্ত্তা আবেশ অন্তরে।।
এই মত বাঙ্গালাতে সকলে মোহিত।
ধন্য দেখি কল খানি বাঁচিবার হিত।।
ধন্য সেই বিলাত পতি ধন্য কারিগরী।
কি কলে করিলেন কল বুঝিতে না পারি।।
ধন্য সেই কলের কর্ত্তা ত্রিযুগের পতি।
ধন্যা সেই মহা কল পৃথিবীর স্থিতি।।

বিরচিত আজিমর্দ্দিন জেলা বর্দ্ধমানে।
খড়ি নামে আছে ধাম মেমারির দক্ষিণে।।

ত্রিপদী।

দেখিতে কলের গাড়ি, করে সবে হুড়াহুড়ি, স্ত্রী পুরুষ সকলেতে ধায়। এমন কলের কল, সর্ব্ব কলের মহাকল, এ কল দেখিল কে কোথায়।। আপ্ত কুটুম্ব যারা, দূরে বাটী আছে তারা, কিরূপে দেখেন কলখানি। মনে২ সাধ রাখে, কি প্রকার চক্ষে দেখে, মন সাধ পুরিবে তখনি।। দেখিতে কলের গাড়ি, যান কুটুম্ব বাড়ী, ধৈরজ হইতে কেহ নারে। আপ্ত বন্ধু আনন্দিত, হন প্রাণে হরষিত, আদোরিয়া আদরে সবারে।। সঙ্গে করি রঙ্গ রসে, যান সে গাড়ির পাশে, দাণ্ডাইয়া দেখেন নয়নে। স্ত্রী পুরুষ সবাকার, এইরূপ ব্যবহার, না দেখিলে ক্ষান্ত নহে প্রাণে।। এমনি কলের ধ্বনি, করে সবে কানাকানি, আই মাগো কি হলো ২। কি কাল করিল কলে মৃত্তিকা উপরে চলে, কত শত প্রাণ দান পাইল।। কাহার প্রাণের পুত্র, যায় সে হইয়া শত্রু, গাড়ি ভাবে ভাবে কত শত। শীঘ্র সে আইসে ফিরে, তুষ্ট করে জননীরে, স্তুতি ভক্তি করে মনোমত।। গাড়ির উপকার কথা, লিখিলে অনেক পাতা, কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি তার। বিদেশে হইয়া পোয়াতি, পুত্র প্রসবেন সতী, বাটী জান আটক কি তারে। রোগ হয় কত লোকে, দুঃখ নহে ক্ষণতাকে, গাড়ি ভাবে হাটিতে না হয়। বিপদ আপদ যদি, উপস্থিত হয় বাদি, যইতে বাটী নহে মহা দায়।। সর্ব্ব উপকার হইতে, মহা উপকার ইথে, নারীগণের রঙ্গ রস বাড়ে। বৎসর কি দশ মাসে, না বসিল স্বামি পাশে, গাড়ি ভাবে সদা মনে পড়ে।। উড়ু২ নহে মন, তুষ্ট রহে সর্ব্বক্ষণ, মিষ্ট আলাপন মিষ্ট কথা। রুষ্ট নহে স্বামি সঙ্গ, কত মত করে রঙ্গ, বিবারিয়া বলে মন ব্যথা।। আর যত মন্দ নারী, বন্ধু ভাবে ভাব ভারি, গাড়ি হইয়া নহে উপকার। উপপতি সঙ্গে মজে, স্বামির স্বভাব ত্যজে এ কলে কলঙ্ক ঘুচে তার।। এইমত কত নারী, বলে কলের বলিহারি, সপ্তাহ২ দেন দেখা। আর নাকি পাবি সই, যায় গাড়ি দেখ ওই, কখন আসিবেন প্রাণ সখা।। কত নারী স্বামি প্যারী, বলে আহা মরি২, কিরূপে করিল কলখানি। সহরে না করেন বাসা, আশা পূর্ণ মম আশা, প্রতি দিন দেখি গুণমণি।। আমিও তাহার ভাবে, তিনিও আমার ভাবে, গাড়ি ভাবে এ ভাব

ঘটিল। বৎসরে ছয় মাস পরে, দেখা না দিতেন মোরে, মনবাঞ্ছা সকল পুরিল।। কোন রমণীর সখা, মাসান্তরে দেন দেখা, তাহে তুষ্ট সদা রহে প্রাণ। রমণীর পতি বিনে, শান্ত নহে রহে প্রাণে, গাড়ী ভাবে পাণ পরিত্রাণ।। পতি নিন্দে যত নারী, ভাবে কি উপায় করি, গাড়ি হইয়া সকলি ঘুচিল। বুদ্ধি নাই চলে কলে, কি কল করিল কলে, অন্য মন তাহারা ছাড়িল।। স্বামি সনে রঙ্গ রসে, রহিল স্বামির বসে, ধন্য২ বিলাতের কল। বন্ধু সনে কুতুহলি, বিকশিত মুদিত কলি, হাস্য বদন হাসে খল২।। বন্ধুর ভাবের ভাব, রাখিতে পারিলে লাভ, এ ভাবে সে ভাব দেখা যায়। ভাব ভক্তি না ছাড়িবে, সময়ে নষ্ট না করিবে, সে গাড়িতে চড়া মহা দায়।। রাখিতে প্রিয়সী মন, কত কর আকিঞ্চন, রাখা চাই সে প্রিয়সীর ভাব। কি মজার কলখানি, করিল বিলাতের জ্ঞানি, এ দেশেতে কত মতে লাভ।। সমাপ্ত করিলাম হেথা, লিখিলাম কলের কথা, কে কোথা দেখিলেন হেন গাড়ি। অধীন আজিমর্দ্দিন রচে, এ সংসার ধর্ম্ম মিছে, রঙ্গ রসে যাও সবে বাড়ী।।

সমাপ্ত।

ইয়ং বেঙ্গল্ ক্ষুদ্র নবাব।

কলিকাতা।

হিন্দু প্রেস।
নং ৯২ আহিরীটোলা

শকাব্দা: ১৭৮৫।

[1863]

ইয়ং বেঙ্গল্ ক্ষুদ্র নবাব

নাটক নাটক কোরে ক্ষেপে উঠে যারা।
বিশ্বের এ নাট্য কেন নাহি দেখে তারা।।
এমন কি রঙ্গ ভূমি কভু হবে আর।
এমন কি নাট্য আর হবে চমৎকার?।।
প্রকৃতি হোয়েছে নটী বিভু নট যায়।
কত সাজ সাজাইয়ে জীবেরে নাচায়।।
আমরাই এ বয়সে কত সং সেজে।
ঢং কোরে নাচিয়াছি লোক লাজ তেজে।।
দেখায়েছি রঙ্গ কিন্তু দেখিয়াছি যত।
রকম রকম নাট্য নিন্দিত লোকত।।
বলিলে হইবে কুচ্ছ না বলাও যায়।
দেশাচার দোষে দেখি দশে মজে তায়।।
ইয়ং বেঙ্গল্ এই হোয়েছে কি কাল।
চাল চুলো নাহি যার তারো লম্বা চাল।।
মানুষ কোরেছে মাতা কত কষ্ট পেয়ে।
অপরের ছেঁড়া বাস পরায়েছে চেয়ে।।
খাইয়ে পাতের ভাত দেহ যার গড়া।
পরের যে পড়া বই ধার কোরে পড়া।।
জন্মাবধি কষ্ট সহ্য করি অবিরত।
হোয়েছে কিঞ্চিৎ বিদ্যা টুং টাং মত।।
তাতেই হইতে পারে মানুষের হাল।
বুঝে যদি চলে আর না বাড়ায় চাল।।
সে বোঝা বিষম বোঝা বহে সাধ্য কার।
মুখে বলা যায় কিন্তু কাজে করা ভার।।

কাজেতে যদ্যপি হবে সে রকম সবে।
কাহারে নবাব ক্ষুদ্র বলা যাবে তবে।।
সামান্য উপায়ী হোলে কেবা তারে পায়।
একে কালে ডিঙ্গাইয়ে উঁচু হোতে চায়।।
ঘরের সে নীচু চাল ঘুচেনা তখন।
দুসন্ধ্যা আঁচানো মাত্র না যায় লঙ্ঘন।।
জননীর টেনা পোঁদে শত ছেঁড়া তায়।
রমণীর লোহা মাত্র ত্রয়ত্ব দেখায়।।
বাহিরের বাবুআনা কে দেখে তখন।
কোঁচা কাচা দিয়ে আর পরেনা বসন।।
পেন্টুলেন পোঁদে আঁটা মোজা পরা পায়।
ওরেফ আস্তেন কাটা চাপকান গায়।।
নাহিক ওয়াচ্ কিসে গার্ড হবে তার।
কারের কি গার্ডেনন তাহার বাহার।।
চুলের কি কেতা আহা! বলিহারী যাই।
সম্মুখেতে যত ঘাড়ে শিকি তার নাই।।
দুদিকে বাঁকান সিঁতে আলবার্ট কেতায়।
চুরুট মুখেতে প্রায় সদা দেখা যায়।।
ভিতর হইলে ভোয়া চলিলে এচেলে।
অকস্মাৎ মনে হয় পিঁদরুসের ছেলে।।
চাপ্‌কান্ দেখিলে পর সেই সন্ধ যায়।
তথাপি দোআঁশ্লা এক রকম দেখায়।।
ঝাড়েন ইংরাজী বুলি কথায় কথায়।
ইংলন্ডে বরণ যেন এমন জানায়।।
মুখেতেও বলা আছে সদা সর্ব্বক্ষণ।
বাঙ্গালা কহিতে আমি পারিনে কখন।।
এমনো বলেন আমি যদি করি মনে।

উত্তম কহিতে পারি সামান্য যতনে।।
ফর্‌নথিং টাইম্ লাস বিবেচনা করি।
ন্যাষ্টীভাষা বেঙ্গালি এ কেয়ারে না ধরি।।
বাঙ্গালার বইগুলো রাবিস ও ছাই।
ইমপ্রুভ হইবার কিছু তাতে নাই।।
দোকানিরা পড়ে তাহা ঘুমুবার তরে।
মরেল্ কি আছে বল তাহার ভিতরে।।
নিউস-পেপার গুলো দেখিয়াছি ধোরে।
হলওয়ে সাহেবের বটিকায় পোরে।।
বাঙ্গালা বিদ্যার প্রতি ঈর্ষা অতিশয়।
কিন্তু কোন সমাজেতে যদি যেতে হয়।।
বোবার মতন কোন বাক্য নাহি ভাষে।
ভেকা গঙ্গারাম যেন বোসে এক পাশে।।
ইংরাজেরা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া।
সাজাইয়া দ্যায় মুখ কালী চুন দিয়া।।
এমনি বেহায়া লজ্জা নাহি হয় তায়।
শোভা যেন হইয়াছে অপরে দেখায়।।
কি করিয়ে বলে পুনঃ লোকের সাক্ষাতে।
লজ্জা পাওয়া গেছে আজি অমুক সভাতে।।
বাঙ্গালা বিদ্যায় একি করা অধিকার?।
ইংরাজিতে মন্দ নয় আছে কিছু ধার।।
তবে এক কথা আছে আমাদের সনে।
মাথা নেড়ে কথা কয় ভয় নাই মনে।।
আমরা ধরিলে দোষ মিছে গোল করে।
সাহেবের কাছে হোলে নাথি খেয়ে মরে।।
এদিকেতে দেমাকেতে দেহ আছে ভরা।
পৃথিবীকে দেখে যেন মৃণময় শরা।।

মানুষ বলিয়া কোন মানবে না গণে।
আপনা আপনি উচ্চ হয় মনে মনে।।
চলন ধরণ দেখে হয় অনুমান।
যমের অরুচি যেন কলির দেওয়ান।।
বাহু দ্বয় দেখে চলে ফুলাইয়া ছাতি।
চাল্ দেখে বোধ হয় খাঞ্জাখাঁর নাতি।।
তাইত নবাব ক্ষুদ্র নাতি বোলে বলা।
দ্বিতীয়তঃ ভিতরেতে আছে চোঁয়া তলা।।
ডেবিল রাস্কেল গোটু হেল ইউকুলি।
সর্ব্বদা ঝাড়েন এই বিলাতের বুলি।।
যে না বুঝে দেহে রক্ত নাহি যার।
তারাই করয়ে সহ্য এ বোল তাহার।।
তেমন লোকের কাছে বলিলে এমন।
শিখাইয়া দ্যায় আর বলেনা কখন।।
একবার এ বিষয়ে ঠেকে যার কাছে।
আর তাকে বলে নাকো তাই ঘটে পাছে।
ক্ষুদ্র নবাবের হয় মেজাজ যেমন।
ফলে কিন্তু কাজে কভু না হয় তেমন।।
রাজা উজিরের লয় কথায় গদ্দান।
কথায় কথায় করে লক্ষ টাকা দান।।
কাহার সুখ্যাতি নাহি করেন কখন।
আপুনি সবার সেরা ভাবেন এমন।।
বিদ্যাতে নাহিক কেহ তাহার সমান।
বুদ্ধিতে তাহার সম নাহি বুদ্ধিমান।।
ব্যয়েতে কেমন বাবু বলিতে পারিনে।
হাতে নাই টাকা তাই ও কাজ দেখিনে।।
যেখানে হইবে পার্টি যুটে যায় আগে।

খাবার সময় কিন্তু খাওয়া ইতে ভাগে।।
গতিবিধি আছে প্রায় সকল সভায়।
বিশেষতঃ মহোদয় বাবু দেখে যায়।।
নাম মাত্র মহোদয় ফলে তাহা নয়।
কালের গতিকে লোকে বলে মহোদয়।।
মহোদয় বোলে যদি সবারে ডাকিব।
মহোদয়ে তাহা হোলে বল কি বলিব।।
মহোদয় শব্দ অর্থ কম অর্থ নয়।
উত্তম অন্তর হলে মহোদয় কয়।।
দেশের চিন্তয়ে হিত ধর্ম্ম পরায়ণ।
স্বধর্ম্মের দিকে যার সতত দর্শন।।
তাহারেই জ্ঞানি লোকে মহোদয় কয়।
শতেকের মধ্যে এক হয় কি না হয়।।
আমরা যাহারে মনে জানি মহোদয়।
ইয়ং বেঙ্গলে তারে বুড়ো ফুল কয়।।
সুরা পান খানা খাওয়া পব স্ত্রী হরণ।
মিথ্যা কথা বলা আর পরধনে মন।।
হিঁদুদের এর চেয়ে পাপ নাহি আর।।
প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে আছে শাসন তাহার।।
এ সকলে আমাদের যিনি মহোদয়।
বঞ্চিত বলিয়ে তাঁরে কত কথা কয়।।
কেহ বলে মিথ্যা জন্ম কোরেছে ধারণ।
ঐহিকের সুখ নাহি জানিল কেমন।।
কেহ বলে ও সকল কপালের ভোগ।
কপালে না থাকিলে কে করে যোগাযোগ।।
কেহ বলে বুড়ো কিন্তু বিষম মর্কেল।
বিধবার বিবাহেতে মারিয়াছে শেল।।

যে কটা হইয়ে গেছে মিথ্যা বলা যায়।
যত দিন বুড়ো আছে চলা বড় দায়।।
কত লোকে কত বলে যার যাহা মন।
ইয়ং বেঙ্গলে শেষে ভরিল ভবন।।
যেখানে কলির করে রাজ্য অধিকার।
অধর্ম্ম হোয়েছে মন্ত্রি উপযুক্ত তার।।
দেখে শুনে আমাদের যিনি মহোদয়।
উদ্যানে করিল বাস ত্যজিয়া আলয়।।
ইয়ং বেঙ্গলে যারে মহোদয় কয়।
সকলে তাহারে নাহি বলে মহোদয়।।
কলির সচীব পদে মহোদয় বলি।
কলির বলেতে তিনি হন মহাবলী।।
এক্ষণেতে মদ খানা রাঁড়ে যেই জন।
অনর্থক বহু অর্থ করে বিতরণ।।
ইয়ং বেঙ্গল্ ক্ষুদ্র নবাব যাহারা।
প্রথমতঃ রবাহুত হোয়ে মেনে তারা।।
যাতায়াতে ক্রমে শেষে ভাল বাসা পায়।
সং সেজে বাবুজীকে কৌতুক দেখায়।।
হাঁড়ির মতন শরা আছয়ে যেমন।
তাহারা যেমন তার বাবুও তেমন।।
কহারো কামায়ে ভ্রূরু বক্‌সিষ শাল।
কাহারে উলঙ্গ কোরে দেখেন না৷কাল।।
কাহারো বা সুরাপানে চেতন হরায়।
কাহারে তামাক বোলে চরস খাওয়ায়।।
দিন২ এ রকম করিতে ব্যাভার।
জন্মে গেল ঐ এক মন্দ সংস্কার।।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ যদি এসে।

টিকি কেটে নিয়ে দ্যান পুরস্কার শেষে।।
সন্দেশের সঙ্গে কেক্ বিষকুট দিয়ে।
দ্বিজগণে খেতে দেন কৌতুক করিয়ে।।
যবনের হুঁকো দ্যান ব্রাহ্মণের বোলে।
বারেক ভাবেনা মনে কি হইবে মোলে।।
কি বলিব মাথা মুণ্ড হায়! হায়! হায়!
এমন লোকের লোকে তবু যশ গায়।।
অর্থই হয়েছে দেখি সবাকার মূল।
অর্থের সকলে বশ অর্থ মানকুল।।
অর্থই জীবন রক্ষা ঘোর দায়ে করে।
অর্থ না থাকিলে লোক অল্প দোষে মরে।
এমন অর্থের যেবা না করে যতন।
মানুষ বলিয়ে তারে কে করে গণন।।
সঞ্চয় নাহিক যার হবে হে অর্জ্জন।
চারি অংশ করিবেক লয়ে সেই ধন।।
দুই অংশে করুক সে জীবন যাপন।
ধর্ম্মর্থে করুক ব্যয় এক অংশ ধন।।
এক অংশ রাখুক সে বিপদের তরে।
এইত উচিত কার্য্য বুদ্ধিমানে করে।।
বিপুল বিভব আর থাকিবেক যার।
তাহাতে হইবে যাহা উপায় তাহার।।
তাহারো কর্ত্তব্য ঐ পূর্ব্বমতে চলা।
অধিক ধনের জন্য তবে পুনঃ বলা।।
ধর্ম্মার্থে করুক ব্যয় অর্দ্ধ অংশ ধন।
এক অংশে করুক সে জীবন যাপন।।
আমোদ করুক নিয়ে এক অংশ তার।
অযোগ্য হবে না এতে মানব সভার।।

বিপুল বিভব আয় উড়ে তাহা যায়।
আসল ধরিয়া টানা এত বড় দায়।।
গড়াইলে ফুরাইবে কলসির নীর।
আসলে না দায় হাত যেবা হয় ধীর।।
বিবেচনা খরচের নাহিক যাহার।
কদিন আসল টাকা থাকিবে তাহার।।
সমভাবে যায় কাল বুঝে যদি চলে।
বুঝালে বুঝেনা কেউ ভাল যদি বলে।।
কে বলিল পূজায় করিতে তত জাঁক।
এক বর্ষ বই নহে পর বর্ষে ফাঁক।।
তাতেও তো বাই গুলো মাথা খুঁড়ে মরে।
মজরার টাকা পেলে কতদিন পরে।।
ইহাতেও নিন্দা কেউ করে না এমন।
যখন যেমন ভাব তখন তেমন।।
কত টাকা গেল বলো হোটেলের বিলে।
সুঁড়িদের বল দেখি কত টাকা দিলে।।
এবার দেখেছি আর নাহি ভাঁড়াভাঁড়ি।
মনে কোরে দেখ সেই উকিলের বাড়ী।।
তবে তুমি কি কারণে লেখনী ধরিয়া।
দোষিলে আপন দোষ গোপন করিয়া।।
সহজ কি দেশাচার সংশোধন করা।
তার কি একর্ম্ম যার দোষে মন ভরা।।
তোমার যা ইচ্ছো কর কে কি কবে তায়।
অপরেরে চোরাশের ক্ষুর কি বিধায়।।
সখ্যতা রাখিতে হয় সকলের সনে।
ক্ষণ ভঙ্গু দেহ এই ভেবে দেখ মনে।।
সন্দেহ সদাই তাতে কখন কি হয়।

পদে পদে আছে যার বিপদের ভয়।।
বৈরঙ্গ যাহার সঙ্গে বিপদে পড়িলে।
আরো যেন চেপে ধরে মস্তক তুলিলে।।
সহজেতে বুদ্ধিমানে বিবাদ না করে।
না কেটে বল কেবা জল আনে ঘরে।।
যথার্থ বলিলে যেবা করিবেক রোষ।
দ্বিপদ বিশিষ্ট পশু বলিতে কি দোষ।।
উপদেশ দিলে যেবা ক্রোধে উঠে ফুলে।
উপদেশ আর তারে দিবেনাক ভুলে।।
আর এক কথা আমি বলি মহোদয়।
আপুনি যাকর তুমি সাজে সমুদয়।।
ধন বলে জনবলে কিনা বলো হয়।
যাকরিবে সেই ভাল কিছু মন্দ নয়।।
তুমি যদি পরিধেয় বসন লইয়া।
বোসে থাক মহাশয় মস্তকে বাঁধিয়া।।
সব লোট বাবু বোলে বলিবে সকলে।
আমি তা করিলে কেউ কভু কি তা বলে?।।
পাগল বলিয়ে লোকে গায়ে দিবে ধুলো।
কেহ বা পিছনে আসি বাজাইবে কুলো।।
সাজাইবে দ্রব্য সং গায়ে দিয়ে রং।
করিবে সকলে রং দেখে মোর ঢং।।
যাহার যা ইচ্ছা হবে বলিবেক সবে।
তোমারে কাহার সাধ্য কেবা কিবা কবে।।
হোটেলে বসিয়ে যদি তুমি খাও খানা।
মন্দ বটে তবু কেউ করিবে না মানা।।
ইয়ং বেঙ্গলে তুমি তাতে আছে ধন।
সকলি তোমার সাজে যখন যেমন।।

আপনার যাহা ইচ্ছা তাই তুমি খাও।
গরিবের ছেলেদের কিজন্যে মজাও।।
কচু কুম্‌ড়ো চিংড়ি মাচে যারা পেট ভরে।
জবাবি আনিস দেশী রসে নেশা করে।।
তাহারাও পোকা ঝাড়া হ্যাম পেলে খেতে।
স্যাম্পেন লিকর ব্রান্ডী খেয়ে উঠে মেতে।।
বাহিরে তোমার কাছে উত্তম আহার।
বাটীতে বোলেছি যাহা সেই মাত্র সার।।
পৌরষ প্রকাশ করে খেতে২ তাই।
বলে কি রেঁধেছো মাথা উনুনের ছাই।।
হোটেলে কি রাঁধে মুখে লেগে আছে তার।
একবার খাইলে কি ভোলা যায় আর।।
তোমাদের ভাল মাচ দেওয়া যায় এনে।
ঘণ্ট ঘেঁটে ফেলো নাহি খাওয়া যায় টেনে।।
সুয়রের ঠ্যাং এসে বিলেত হইতে।
পোচে গিয়ে পোকা ধরে কদর্য্য দেখিতে।।
কুকেরা আমরি কিবা কুক করে তাই।
কিবা তার তার আহা! বলিহারি যাই।।
কাঁচা বেলা এত পচা ছুঁলে যেন ছাড়ে।
রাঁধিলে রবার যেন যত টান বাড়ে।।
অথচ সে শক্ত নহে কেমন নরম।
ডিসে ফেলে খেতে মজা গরম গরম।।
এ রান্না কি ভাল লাগে মাথা মুণ্ড ছাই।
রশুন কি পিঁয়াজের গন্ধটুকু নাই।।
হয়ত না খেয়ে বাবু উঠেন রাগিয়া।
হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙ্গে যান বাহির হইয়া।।
কচু কাঁচকলা মাত্র আহার যাদের।

খানার কি আস্বাদন জানায় তাদের।।
মাসের অর্দ্ধেক দিন বাবুর রাগেতে।
বাটীর মেয়েরা পেটে নাহি পায় খেতে।।
পাতের প্রসাদ তুমি কেন খেতে দিলে।
তুমি ত খাবার চাল এত বাড়াইলে।।
নবাবী মেজাজ পূর্ব্বে গেছে তাহা বলা।
ভিতরেতে অষ্টরম্ভা উচু চেলে চলা।।
দেব দেবী দেখে আগে নোয়াইত ঘাড়।
নাহিক সে ভাব আর কামড়ায়ে হাড়।।
পুতুল বলিয়ে সদা উপহার করে।
জুতো পায়ে দিয়ে যায় ঠাকুরের ঘরে।।
ফোর্জ হিঁদুয়ানী ইহা মুখে আছে বলা।
ধরা পোড়ে গেছে জাল আর ভার চলা।।
কর্ত্তাভজা খ্রীষ্টীয়াণ ভণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানী।
ধরিয়াছে ওয়ারেন্ট কোরে হিন্দুয়ানী।।
কতই বলিয়ে থাকে কি বলিব আর।
এঁটোপাত চেটে নয় মন্দ সংস্কার?।।
বাবুর প্রসাদী বেস পরিয়া যখন।
গাড়িতে বাবুর সঙ্গে করেন গমন।।
আপনা আপনি মনে উচু হয় যত।
দর্শকেরা মনে মনে নীচু ভাবে তত।।
ক্ষুদ্র নবাবের কিন্তু যা থাক ভিতরে।
বাহিরে দেমাকে ফুলে উচ্চ চাল ধরে।।
তেমন লোকের দিকে ফিরিয়ে না চায়।
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা নাহি দ্যায় সায়।।
না হয় গম্ভির শব্দে হুঁটা টুঁটা মেরে।
জিজ্ঞাসার কথা দ্যান একেবারে সেরে।।

পুনঃ কথা যেবা কয় তাহার উপরে।
চক্ষু লাল কোরে বাবু কন ক্রোধ ভরে।।
কি জন্যে বকাও এত মিছে বার বার।
মাথা ধোরে গেল ক্ষেন্ত তবু নাহি তার।।
মুখের ভঙ্গিমা দেখে কেহ পুনর্ব্বার।
জিজ্ঞাসা করেনা তারে কোন কথা আর।।
তাই বলি এমন কি মানুষের মন।
কি জন্যে মানব দেহ কোরেছে ধারণ।।
ধরিলে মানব দেহ পর উপকার।
করাই মানব দেহ ধারণের সার।।
ধরায় আসিয়ে যশঃ নাহি হোলে যার।
মিছে তার দেহ ধরা মিছে আসা তার।।
সুখ দুঃখ ভোগ যত সকলি ধরায়।
কর্ম্মক্ষেত্র ধরণীরে বলে এ বিধায়।।
মানব জন্মের চেয়ে জন্ম নাহি আর.
চৌরাশী লক্ষের মধ্যে জনমের সার*।।
এমন জনম পেঁয়ে আসিয়া ধরায়।
যেজন না কর্ম্ম করে ধিক্২ তায়।।
কর্ম্মই মানব দেহ ধারণের সার†।
পাইয়ে মানব দেহ কর্ম্ম কর তার।।
জ্ঞানচক্ষু একবার কর উন্মিলন।

* যথা কালী বিলাস তন্ত্রে।
চতুরশিতি লক্ষেষু শরীরেষু শারীরিনাং।

† যথা ভগবদ্দগীতা।
নকর্ম্মনা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহন্নুতে।
নচ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধি গচ্ছতি।।

কেমন এ রঙ্গ ভূমি কর দরশন।।
পূর্ব্বেই বোলেছি নটী প্রকৃতি সুন্দরী।
দৃশ্যের অন্তরে বিভু নটরূপ ধরি।।
ভূতের সহিত ছটা কুসঙ্গ লইয়া
নাচিতেছি এ সংসারে মোহিত হইয়া।।
কি নাচিব কি গাইব বোলে আসিলাম।
রঙ্গভূমে নাবিয়েসে সব ভুলিলাম।।
জঠর নেপথ্যে ছিল সকল স্মরণ।
তত যে যন্ত্রণা তবু ভুলিলে তখন।।
এখন বেতালে নাচি মিছে গাই গান।
কি হইল হায়২! কিসে থাকে মান।।
সবে মাত্র মনে এই আছয়ে নিশ্চিত।
রিপু ছটা বলী হোলে হবে না সংগীত।।
নিতে হবে বিবেকের আশ্রয় তখন।
শম দম সহ তথা হবে দরশন।।
দেখা হবে বিদ্যা নাম্নী দুহিতার সনে।
রিপু গণ নষ্ট হবে যার দরশনে।।
হইবে প্রবোধ চন্দ্র উদয় তখন।
দেখায়ে দিবেন তিনি বেদান্ত দর্শন।।
দর্শন করিলে তাহা হবে দিব্য জ্ঞান।
সে নাট্য করিলে জীবে পায় মুক্তি দান।।
ভুলে থাকি ভুলে থাকা অতি অনুচিত।
সে নাট্য করা দেখি সবার উচিত।।

সমাপ্ত।

কি মজার শনিবার।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শিকদার
প্রণীত।

শ্রীগঙ্গাধর শীল দ্বারা
প্রকাশিত।

শ্রীমধুসূদন শীল দ্বারা
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।
৩১৯ নং চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

১২৭০ বঙ্গাব্দ।
১৮৬৩।

[1863]

কি মজার শনিবার

রাগিনী ক্রোর প্যাঁক। তাল ডঙ্কফোঁস।

ধন্য কল্কেতার সহর ধন্য শনিবার।
বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যাবাহার।।
সোণাগাজি উড়্‌ছে ধ্বজা, বড় ধূম পুড়্‌ছে।
গাঁজা, মদ খেয়ে করছে মজা, মেছুয়া বাজার।।
হাড়কাটা হেসে খেলে, গ্ল্যাস ধরে মুখে ঢেলে।
অবশেষে বল্‌ছে বুলি, ক্যায়ছা মজেদার।।

ধন্য বলি ধন্য কলি, ধন্য বলী তুমি।
ধন্য তব কলিকাতা, ধন্য তার ভূমি।।
তাহাতে শোভিত কত, তীর্থ রাশি রাশি।
তার কাছে তুল্য নন, মূল্য নন কাশী।
শাস্ত্রে বলে কাশী গেলে, মোলে হয় শিব।
এসব তীর্থেতে বেঁচে, শিব সদা জীব।।
তায় যদি রবিসূত, দেন গিয়া যোগ।
স্বশরীরে সকলের, সুখে স্বর্গভোগ।।
আসিয়াছে শনিবার, নাশিয়াছে দুঃখ।
রসিয়াছে মধুরসে, মাতালের মুখ।।
উড়িছে প্রফুল্ল ভাবে, বোতলের ধ্বজা।
ঢালাঢালি গালাগালি, কত মত মজা।।
এ সময় হাড়কাটা, রসময় কিবা।
শোভাময় নিশি তার, বিষময় দিবা।।
রিদিক সুরসিক, সুপ্রেমিক যত।

মদে মত্ত প্রেমতত্ত্ব, করিতেছে কত।।
রাধাবাজারেতে বল, কত গোরা জমে।
কত মদ খায় তারা এক এক দমে।।
সোণাগাজি হাড়কাটা, সিদ্ধেশ্বরী তলা।
কার সাধ্য নিশিযোগে, পথ দিয়া চলা।।
একে সব তীর্থস্থান, তাহে শনিযোগ।
আরোগ্য করিতে লোকে, ছেলেধরা রোগ।
প্রেমরূপ গঙ্গাস্নানে, চলে একজাই।
সন্ধ্যাবধি দ্বিপ্রহর, নাহিক কামাই।।
কেহ বা উন্মাদ প্রায, দাঁড়ায়ে রাস্তায়।
ঘোর প্রেমদায় পড়ি, ডাকে প্রেমোদায়।।
কোথায় বদনমণি, বদনটা তুলে।
পায় ধরি দিয়ে যাও, দরজাটা খুলে।।
বদন রদন কুল, করি কড়মড়।
মদনের জোরে তার, মুখে মারে চড়।।
নাগর বিঘোর খুসি, হাসি খলখল।
চলেন বলেন "আজ, কি হয়েছে বল।।"
দাঁড়াইয়া দ্বারে কেহ, করিতেছে শোর।
কাম্ ছুন মিডিয়ের, ওপেন্‌দি ডোর।।
থাক বলে থাক বাবা, রাখ মোর কথা।
ফিরে যাও সেইখানে, কাল ছিলে যথা।।
যত ভাব তত আমি, নোইনেকা মেয়ে।
ফাঁকি দিয়া মধু খাবে, মধুবার পেয়ে।।
এ হেন কঠোর বাণী, শুনিতে পাইয়া।
লম্পট চম্পট দেন, গালাগালি দিয়া।।
হরি বলে হররম, হরি কোথা তোর।
হর শুনে বলে কেটা, হরি বুঝি মোর।।

অনেক দিনের পর, আছিস্ ত ভাল।
আয় রে ওদিক দিয়া, ধরিয়াছি আলো।।
এই মত সম্ভাষণ, হয় কোন স্থলে।
কোথাও বা হদ্দ মজা, কার সাধ্য বলে।।

সকল তীর্থের চেয়ে, অহি দেখ চেয়ে।
সাজিয়াছে সোণাগাজি, শনিবার পেয়ে।।
কিবা অপরূপ রূপ, করেছে ধারণ।
কেবল কি হইয়াছে, কারণ কারণ।।
তা নয় তা নয় সুধ, তা নয় তা নয়।
সাধের মদের সঙ্গে, অনঙ্গ উদয়।।
মধুবারে মধু খেয়ে, বারবধূ গণ।
কৌতুকে যৌতুক দেয়, প্রেম আলিঙ্গন।।
নগর নিবাসী কত, নাগর নিকর।
শনি সমাগমে সবে প্রফুল্লিতান্তর।।
কেহ যুড়ি কেহ ঘুড়ী, কেহ চড়ে ঘোড়া।
গায়েতে রুমাল শাল, বড় বড় যোড়া।।
পদব্রজে চলে কেহ, কেহ যানে যান।
ফুটে পড়ে ছুটে পড়ে, কারু কারু তান।।
সিমিলার কমিলার, কালাপেড়ে কত।
যাহার যা হইয়াছে, নিজ মনোমত।।
তাহাই লইয়া সুখে, করি পরিধান।
চলিছেন চিবাতে চিবাতে সাঁচি পান।।
কার পায় শোভা পায়, শোভাময় বুট।
রয়েছে পকেটে পোরা, রুটী বিষকুট।।
চরণে দিয়াছে কেহ, চিনের বিনামা।
গায়েতে কামিজ কোট, বনাতে জামা।।

মস্তকেতে কমফোর্ট, রহিয়াছে আঁটা।
ডানি বাঁয় কত তায়, বাঁকা সিঁতা কাটা।।
ধোলাই দোলাই গায়, কাহার বা লাল।
এষ্টাকিন ছাড়া কিন্তু, নহে তিলকাল।।
পায়েতে বার্ণিস জুতা, গরাণ হাটার।
দেখিলেই বোধ হয়, নব অবতার।।
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি দেখা, চুরটেতে টান।
কাহার পেটের মধ্যে, মদের দোকান।।
দেখাদেখি নুটেরাও, দিনে টেনে মোট।
সন্ধ্যাকালে গায় দেয়, চায়নার কোট।।
সহরের মজা বল, কার সাধ্য বোঝা।
দিনে বয় বোঝা যেই, রাত্রে তার মোজা
এই মত কত লোক, কত করি বেশ।
তীর্থ ভ্রমি মিটাতেছে, মনের আবেশ।।
প্রথমেতে মদ্যরস, করি আস্বাদন।
প্রেমরসে ভাসে শেষে, অসাধ্য বর্ণন।।
দুঃখের না আসে লেশ, পুলকিত চিত।
সোণায় সোহাগা যেন, হয়েছে মিশ্রিত।।
কোথাও আশ্চর্য্য কাণ্ড, গ্ল্যাস ছড়াছড়ি।
ঘড়ি ঘড়ি বোতল, ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি।।
মদ্য পানে বাবু বিবি, কেহ নন কাবু।
বাবু ঢালে বিবি খায়, বিবি ঢালে বাবু।।
শেষে সুখে দিয়া মুখে, কচুরির চাট।
বিবি গিয়া পড়ে যেন, সারসার মাঠ।।
অমনি তখনি তার, গায়ে দিয়ে থাবা।
চুর হোয়ে বলে বাবু, এই চাই বাবা।।
কোন খানে বেশ্যাগণ, মদ্য দিয়ে পেটে।

একেবারে অহঙ্কারে, পড়িতেছে ফেটে।।
কত বেটা লাল ছেলে, শাল দিয়ে গায়।
পায়ের তলায় পড়ি, গড়াগড়ি যায়।।
মনের ওজন তবু, বুঝে উঠা ভার।
হয়েছে মারাণী যেন, রাণী অবতার।।
কোথাও বিবিরা সব, বাবুদের লয়ে।
মাতিয়াছে মদ খেয়ে, দিগম্বরী হয়ে।।
কিছুতেই নাহি ভয়, নাহি পায় লাজ।
তাই বলি কি মজার, শনিবার আজ।।

———

ইস্কুলের ছোঁড়াগুলো, আনন্দেতে টোলে।
ছুটাছুটি করিতেছে, ছুটি পাব বোলে।।
কিলেকিলি গালাগালি, হাতে তলি কার।
পড়ায় না আছে মন, পড়াপড়ি সার।।
কেহ বলে কতক্ষণে, বাজিবে চারিটে।
বাড়িতে মারিব পাড়ি, রাখালেরে পিটে।।
হিরে বলে ছিরে ছিরে, তা করিস্ পাছে।
টের পাবি সোমবারে, মাষ্টারের কাছে।।
এদিকেতে শিক্ষকেরা, ছাড়িতেছে বোল।
কারু সিস্ কারু ঈস্, ভয়ানক গোল।।
কেহ কন পঞ্চানন, টৌকিওর সিট।
কমিয়ার রামচাঁদ, কিপ্‌কোয়াইট।।
কোথাও পণ্ডিতে চলে, নস্য লয়ে নাকে।
পড়াচ্ছেন কত পাঠ, একে ওকে তাকে।।
ছেলেরাতো ছেলে নয়, বুড়াদের বাবা।
পান খেয়ে এ উহার, গালে দেয় চাবা।।
কেহ গিয়া মনোসুখে, খুলে কারু কাছা।

বলে বাবা বেঁচে থাক, খুব তোর পাছা।।
ফাঁসি ফুঁসি করি কেহ, এ কানে ও কানে।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসা করে, শৃঙ্গারের মানে।।
পণ্ডিত দণ্ডিত প্রায়, মগ্ন মনোদুঃখে।
কহেন কি কহ ছিছি, মম অভিমুখে।।
ছোঁড়ারা হাসিয়া বলে, বুঝেছি মশায়:
পড়িয়াছ দায় বড়, পড়িয়াছ দায়।।
শৃঙ্গার শব্দের অর্থ, নারিলে কহিতে।
আমাদের তাইতে এসেছ শিক্ষা দিতে।।
যা হোক তা হোক, আজি রহিল অন্তরে।
একথা জানাতে হবে, পেরোপ্রাইটরে।।
মাস গেলে মাহিনাটি, আগে তার চাই।
শিক্ষা দিতে কিছু মাত্র, মনোযোগ নাই।।
কেহ কয় উনি এই, কেবল নূতন।
তোমাদের শিক্ষা দিতে, উপযুক্ত নন।।
যাক্ আগে দিনকত, টের পাবে শেষে।
জিজ্ঞাসা করিবে যাহা, কহিবেন হেসে।।
হইতেছে এই রূপ, মিষ্ট আলাপন।
ইতি মধ্যে বাজে ঢন্, ঢন্, ঢন্, ঢন।।
ছুটি পেয়ে ছেলেদের, আনন্দ অপার।
ছুটাছুটি বই লোয়ে, চলিল যে যার।।
বাজিল চারিটা বেলা, কুঠীয়ালা যত।
ঠিক যেন হাল ছাড়া, বলদের মত।।
আপিস হয়েছে বন্ধ, আনন্দ উদয়।
দ্রুতগতি চলে সব, নিজ নিজালয়।।
তার মধ্যে সমধিক, পাড়াগেঁয়ে লোক।
ধূলাভরা নাক মুখ, কাদা ভরা চোক।।

হাজার হাজার সব, বাজারেতে গিয়া।
কিনে লয় কত দ্রব্য, কত দাম দিয়া।।
সন্দেশ মিঠাই খাজা, ক্ষীর চিনি ছানা।
আঙ্গুর খোপানি পেস্তা, বাদাম বেদানা।।
কমলা খর্জ্জূর কুল, ফলাদি বিস্তর।
এক লয় মোট বেঁধে, আর করে দর।।
দরকারি তরকারি ক্রয় করি কত।
মাগুর মাগুর লয়, নিজ মনোমত।।
কেহ লয় পাণ গুয়া, লবঙ্গ কর্পূর।
গিন্নির কারণ চলে, চিনার সিন্দুর।।
চিরুণী কিনিছে কেহ, কেহ কেনে জাঁতি।
কেহ নারিকেল তেল, কেহ কেনে বাতি।।
পুত্তল লইছে কেহ, ছেলেদের তরে।
বোতল দিতেছে দেখা, কারু কারু করে।।
রবিবারে সহরের, লোকে পায় টের।
দেড়টাকা কোরে হয়, সন্দেশের সের।।
দুই আনা হোয়ে পড়ে, কমলার যোড়া।
আনায় না আনা যায়, সাধারণ গোঁড়া।।
পয়সায় কুড়ি কুড়ি, থাকে যেই কুল।
পাঁচ কুড়ি দিতে হয়, দুই কুড়ি ভুল।
সে কুল না দেবে কাল, দশটার বেশী।
বারটা তেরটা করে, হয়ে যাবে দেশী।।
মূলগুলো পাই পাই, আলু দুই দুট।
তিন্টে দেবে ছোট ছোট, চাট্রে হলে শুঁটো।।
কে যাবে মাছের কাছে, বেগুণ আগুণ।
সকল দ্রব্যের দর, হবে কত গুণ।।
এমত জিনিস যত, ক্রয় করি সুখে।

চলে কত পাড়াগেঁয়ে, ভবনাভিমুখে।।
কেহ বোটে কেহ হেঁটে, কেহ করে গাড়ি।
বগলে বান্ধিয়া জুতো, কেহ মারে পাড়ি।।
কেহ বা শ্বশুর বাড়ি, কেহ নিজালয়।
কত স্থল চলে লোক, প্রফুল্ল হৃদয়।।

———

পল্লীবাসী নারীগণ, শনিবার পেয়ে।
প্রাণেশের আশে আছে, আসাপথ চেয়ে।।
কতক্ষণে যাবে দিন, হইবে রজনী।
নিকটে পাইবে নিজ, নিজ গুণমণি।।
এ বলে উহারে দিদি, আসিয়াছ যদি।
দয়া কোরে ঝাড় দেখি, অই দুটো গদি।।
দুকুর অবধি ভাই, লেপের ওয়াড়।
সেলাই করেছি বসি, ধরে গেছে ঘাড়।।
কি কহিব অভাগির, এমনি কপাল।
ভাল কথা কহিলেই, তিলে হয় তাল।।
আজ প্রায় তিন দিন, করিয়া বিরোধ।
মূলযোড়ে গিয়াছেন, শাশুড়ী ননোদ।।
দোষের মধ্যেতে সুধু, বলেছিনু এই।
আমারে আমার বলে, এমন তো নেই।।
ভেয়েরা তো একেবারে ফেলিয়াছে পুঁছে।
ভেবেছে মরেছি বুঝি, জ্বালা গেছে ঘুচে।।
যা নাই যাহার তার, জনম বিফল।
এ পোড়া সংসারে ঢুকে, যাতনা কেবল।।
শুনিয়া আমার কথা, মায়ে ঝিয়ে রুখে।
বলে গেল কত কথা, যত এলো মুখে।।
তাই বলি শুনিনি তো, কপালের লেখা।

করিতে কি পারি আমি, এত কায একা।।
কি জানি যদ্যপি আজ, কর্ত্তা এসে বাড়ি।
বেলা নাই তাই ভাই, করি তাড়াতাড়ি।।
কেহ বলে বিনোদিনী, বলি শোন্ শোন্।
তোদের চিরুণী খানা, দিয়ে যানা বোন্।।
ভয় নাই হারাবে না, পালাব না নিয়ে।
চুল বাঁধা হলেই, আসিব আমি দিয়ে।।
কেহ কয় পদ্মমুখী, আয় দেখি দেখি।
আহা মরি দিদি মোর, বুঝিবার ঢেঁকী।।
প্রেম যদি জানিতিলা, আমাদের মত।
এত দিনে ছেলেপুলে, হোয়ে যেত কত।।
আই মা গলায় দড়ি, নাহি পায় লাজ।
ভুলাতে পতির মন, এই কি লো সাজ।।
কোন খানে শিখেছিস্, হেন চুল বাঁধা।
এ নয় মুগের ডাল, লাউ দিয়া রাঁধা।।
দেখেছিস্ চুল বাঁধা, চেয়ে দেখ এঁই।
তোরেও এমন কোরে, বোস দেখি দেই।।
উপপতি আছে যার, তার কিবে দুঃখ।
বিষম বিষাদে আজি, বিদরিছে বুক।।
কোথাকার চুল বাঁধা, কোথাকার বেশ।
মলিন বসন পরা, এলো থেলো কেশ।।
অধরে না ধরে কথা, মজার মজার।
পতির রতির ভয়ে, বড়ই বেজায়।।
শাশুড়ী কহেন বউ, কেনে লা এমন।
মুখে নাই হাসি টাসি, ভার ভার মন।।
রেগে বলে বধূ তার, মুখ পানে চেয়ে।
করে মোরে খুসি দেখ, রত চোখ খেয়ে।।

কেহ বলে মতির মা, হেথা যা লো দেখে।
কোথা গেছে ঠাকুরঝি, লোয়ে আয় ডেকে।
হয় তো আসিবে আজ, ঠাকুর জামাই।
এই বেলা বেলাবেলি, যোগাড়টা চাই।
এই মতে নারীগণ, কত কথা কয়।
কত করে বেশ ভূষা, প্রফুল্ল হৃদয়।।
চিরুণী ধরিয়া কেহ, চিকুনিয়া চুল।
মনাবেশে কেশে শেষে, দেয় রৌপ্য ফুল।।
সিঁতায় বিরাজে কিবা, সিন্দুরের টীপ।
অনুমানি অভিমানি, জ্বলন্ত প্রদীপ।।
নাশায় মুকুতাযুত, মনোহর নথ।
রুপেতে করেছে আলো, অন্ধকার পথ।।
উজ্জ্বল হয়েছে নেত্র, কার বা কজ্জলে।
খঞ্জন খঞ্জনী যেন, শতদলে দলে।।
বঞ্চিতে স্বামির সঙ্গে, সুখময় নিশি।
দশনে দিয়াছে কেহ, হুগলির মিসি।।
কার গলে দোলে চিক, কারু কারু হার।
পাঁচনরি সাতনরি, কতেক প্রকার।।
কেহ বা দিয়াছে কর্ণে, স্বর্ণ কর্ণফুল।
কাহার বা কর্ণমূলে, সুবর্ণের দুল।।
ভূজেতে তাবিজ বাজু, করে কতগুলি।
পৌইছা বাউটী বালা, মুড়কি মাদুলি।।
উচ নিচ কত কুচ, কত তার শোভা।
কারু কারু হেন যেন, পদ্মে মধুলোভা।।
ভেয়ের সংসারে যারা, গিন্নিপনা করে।
মেটে গর্ব্বে হয়ে গর্ব্বী, গর্ব্বে ফেটে মরে।।
আকাঁড়া আহ্লাদ আর, ধরে নাহি গায়।

হাতনাড়া মুখনাড়া, কথায় কথায়।।
বেহায়ার এক শেষ, লজ্জা নাই মোটে।
ভাশুর শ্বশুরে দেখি, ঘোমটা না ওঠে।।
কাপড় পরেন যত, কাপড় তো নয়।
উহাপেক্ষা উলঙ্গ হইলে ভাল হয়।।
একে শান্তিপুরে তায়, অতি সুচিকণ।
অনায়াসে সর্ব্ব অঙ্গ, হয় নিরীক্ষণ।।
তাহাতে বাহিরে আছে, অর্দ্ধ পয়োধর।
লাল কালা কত পাড়, তাহার উপর।।
লাল দেখে ভাবোদয়, ভাবকের চিতে।
নখাঘাতে উরোভব, ভাসিছে শোণিতে।।
ভাল কোরে কাল হেরে, হেন মনে লয়।
ঘনতর ঘন মাঝে, বিধুর উদয়।।
কুলের কামিনী যারা, কলুষ বিহীন।
শ্বশুর আলয়ে বাস, করে চিরদিন।।
তাহাদের কুচ নয়, উচতর বোধ।
পরণে বসন হেন, দৃষ্টি করে রোধ।।
কোটীদেশে কারু গোট, কারু চন্দ্রহার।
কেহ বা পরেছে বিছা, অতি চমৎকার।।
পাঁজোর কাহার পায়, রহিয়াছে সাঁটা।
শোভাময় তাহে মল, ডায়মন কাটা।
এই মত বেশ কত, করি সমাপণ।
গড়ান পানের খিলি, মনের মতন।।
ক্রমশঃ দিবস গত, নিশি দিল দেখা।
বাঁধা হয় কত দ্রব্য, কার সাধ্য লেখা।।
কেহ করে শড়্শড়ি, কেহ রাঁধে ঝোল।
মনোসুখে ভাজে কেহ, চিতলের কোল।।

কেহ সূক্তা কেহ শাক, টক কোন জন।
জ্বাল দিয়ে দুগ্ধ কেহ, মুগ্ধ করে মন।।
কেহ বা পায়েস রাঁধে, প্রাণেশের তরে।
ইতিমধ্যে যার যার, স্বামি আসে ঘরে।।
হেরিয়া প্রবাসী পতি, আনন্দে চঞ্চল।
তাড়াতাড়ি দেন কেহ, পা ধোবার জল।।
কেহ দেয় চৌকি লোয়ে, কেহ বা আসন।
তামাকু সাজিয়া কেহ, করিছে অর্পণ।।
কেহ কয় উঠ তবে, হইয়াছে রাত।
এখুনি যুড়ায়ে যাবে, বালামের ভাত।।
শুনিয়া জায়ার কথা, স্বামী চলে খেতে।
অন্ন গিয়া দেয় ধনী, যেতে নয় যেতে।।
তদন্তর হলে পরে, পতির ভক্ষণ।
ভোজন করিয়া নার, মদনে মগন।।
এমতে বঞ্চন হয়, সুখে শনিবার।
বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার।।

সমাপ্তঃ।

হদ্দ মজা রবিবার।

বাঘাডাঙ্গা নিবাসী
শ্রীশ্যামাচরণ শান্যাল
প্রণীত।

“সাধিতে দেশের হিত করিয়াছি পণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।।”

কলিকাতা।

শীল এন্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭০।

[1863]

হদ্দ মজা রবিবার!!!

(হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় একজন মস্তরাম মাতালের প্রবেশ)

[মস্তরামের গীত।]

রাগিণী সখের প্রাণ। তাল গড়ের মাঠ।

ধন্য কল্কেতা সহর ধন্য রবিবার।
ঘরে ঘরে লুটচে মজা গাইয়ে বাহার।।
অলিগলি যথা যাই, কত মজা দেখ্‌তে পাই,
এমন সহর দুটি নাই, রসের আধার।
স্থানে স্থানে নৃত্য গান, কিবা সুর কিবা তান,
রাগিনী সখের প্রাণ, বড় চমৎকার।।

বাবু। (গীত শুনিয়া সহাস্যে) ওহে মস্তরাম! আজ কাল তুমি বড় রসাল পাবাল গীত গাইতে শিখেচ, তবু ভাল বাপের নামটা রাখ্‌তে পার্ব্বে।

মস্তরাম। (গললগ্নি কৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া) ধর্ম্মাবতার! আমার তো (আপনাদের মত) বাপের কুপুত্র নই, যে বাপের নামটাও রাখ্‌তে পার্ব্বনা।

বাবু। আমরাই কি বাপের কুপুত্র?

মস্তরাম। না, না, আমি কি মশায়কে বাপের কুপুত্র বল্‌তে পারি, তবে নেশার ঝোঁকে যা দুই একটা কথা বলে থাকি, সেটী আমার পাগ্‌লামী ভিন্ন আর কিছুই নয়, (কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে) মশায় গো! মনঃ অগোচর পাপ নাই।

বাবু। ওহে! রূপান্তরে তুমি তো আমাকে বাপের কুপুত্র বলে সম্বোধন কর, আমি সত্য সত্যই বাপের কুপুত্র নাকি?

মস্তরাম। একপ্রকার বটে!

বাবু। সে কেমন।

মস্তরাম। তবে শুনুন্।

ছিলেন তোমার পিতা বড় দয়াময়।
সদয় হৃদয় তাঁর সদয় হৃদয়।।
অনাথের নাথ তিনি ব্যক্ত চরাচরে।
করিতেন অর্থ ব্যয় সদা অকাতরে।।
বিশেষতঃ রবিবারে সেই মহাজন।
লুটিতেন কত মজা লয়ে বন্ধুগণ।।
তুমিত তেমন নহ কৃপণ প্রধান।
এক টাকা ব্যয়ে হয় ওষ্ঠাগত প্রাণ।।
হায়! রে দুঃখের কথা! কহিব কি আর।
খুরে নমস্কার তব খুরে নমস্কার।।

বাবু। ওহে! বাপের ল্যাজ ধরে কে কবে স্বর্গে গিয়েচে, আমরা বাপের নাম রাখব কি তাঁর চেয়ে যে আমরা এক কাটি সরেস আছি, অধিক কি? কর্ত্তারা দাঁড়িয়ে মুতে গিয়েচেন বৈত নয়, আমরা যে গাছের আগায় বসে পাক দিয়ে মুত্তে শিখেচি, ফলতঃ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে কার ভার্য্যার ন্যায় তুমি যে আমাকে বাপের কুপুত্র বল্লে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তুমি কেন আমাকে গুখেগোর ব্যাটা বল্লে না? তাতে আমার দুঃখ হতো না!

মস্তরাম। মহাশয়! আপনি যে অল্প কালের মধ্যেই তাঁদের কাঁদে উঠেচেন, ইহা আমি জান্তেম না, সুতরাং দুই একটা বেলয় কথা কয়ে ফেলেচি, মশায় কি আমার উপর রাগ কল্লেন?

বাবু। রেগে আর আমি তোমার কি ফেলবো? তবে তুমি রাগ কল্লে আমার সব ফেল্তে পার, ইহা আমি বিলক্ষণ রূপেই অবগত আছি, সুতরাং সেয়ানায়২ কোলাকুলী মুটম হাত্ তফাতের ন্যায় তোমার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি।

মস্তরাম। (স্বগত) পেটে খেলেই পিঠে সয়, অতএব হরিহর বাবুর কথায় চোট্লে কোন কায পাওয়া যাবে না (প্রকাশ্যে) মশায় গো! আপনি বড় সুচতুর

লোক, তাই ডুবে২ জল খান, অথচ শিবের বাবাও তা টের পান্না। সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে মশায়ের গুপ্তাচরণ পরিজ্ঞাত হওয়া দূরে থাক, আপনকার বুদ্ধির গোড়াতেও জল দিতে পারে না।

বাবু। ওহে! ও সকল বাজে কথা দূরে থাক, এখন তোমার অভিপ্রায় কি তা বল।

মস্তরাম। আমার অভিপ্রায় এই যে আপনি পতিতপাবনী, সর্ব্ব শোক বিনাশিনী মোক্ষ প্রদায়িনী শ্রীশ্রীমতী সাধ্যাসতী কামিনীদেবীর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্মের সার্থকতা লাভপূর্ব্বক মাদৃশ ব্যক্তিকে তদারাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়া স্বীয় সদাশয়তা গুণের পরিচয় দেন।

বাবু। ওহে! আমার কি উহাতে কোন ক্রুটি আছে, আমি যে দিবা রজনী কামিনীদেবীর পাদপদ্মের ভ্রমর হয়ে পড়ে রয়েচি এবং বান্ধবগণকেও তদনুরূপ হইবার জন্য অনুরোধ করে থাকি এবং তন্নিবন্ধন অর্থব্যয় করিতেও ক্রুটি করি না।

মস্তরাম। সাধু! সাধু! সাধু! আপনি যে সর্ব্বগুণে গুণময় হয়ে পড়েচেন, ইহাই যথেষ্ট, আমরা তোমার পিতৃবান্ধব, সুতরাং আপনকার সকলেই আমাদের মঙ্গল। যাহা হউক রবিবারটা কি নিষ্ফল কাটাইবেন? না রকমারি চল্‌বে?

বাবু। তার ভাবনা কি? রবিবার কি নির্জ্জলা কাটাইতে পারি? আমি তো প্রাণ থাক্তে তা পার্ব্ব না, তবে যে এখনও শাদা চোখে গাধার মত চুপ্ করে রয়েচি তার একটী নিগূঢ় কারণ আছে।

মস্তরাম। কারণ কি? "শুভস্য শীঘ্রং" অর্থাৎ শুভ কার্য্যে কাল বিলম্ব করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে, অতএব রকমারি চলুক্ না?

বাবু। ওহে! বিয়ে হলে কি আর ঘর চলে না? ধৈর্য্য ধর ক্রমে বন্দোবস্ত করা যাচ্চে।

মস্তরাম। মশায় কি দশ সালার বন্দোবস্ত কর্ব্বেন তাই ধৈর্য্য ধরে বসে থাক্‌বো, আহা! অদ্য পরম পবিত্র রবিবারের শুভাগমনে সহরের বাবুভেয়েরা চাঁদের হাটে বসে কত মজাই কচ্চেন, কোথায় বা ডজন২ মাল শেষ হয়ে গেল, কোথা বা উইলসনের বাড়ীর বিবিধ প্রকার খানা চল্‌ছে,

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মশায়ের এখানে তার কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পাচ্চিনে, শেষ কি সুদু মুখে ফিরিয়ে দিবেন?

বাবু। এখান্ থেকে আর সুদু মুখে ফিরে যাবেন না, (এই বলিয়া এক বোতল ব্যান্ডি ও একটা গ্ল্যাস প্রদান পূর্ব্বক) মস্তরাম বাবু! আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি তাই তোমার দুই একটা রঙের বোল শোন্‌বার জন্য রকমারি চালাতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব কচ্ছিলেম্।

মস্তরাম। (বোতলটী গলায় ঢালিয়া) বাবা হরিহর বাবু! তোমার সদাশয়তা-গুণে অদ্য আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হোলেম বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আপনি আজও সহুরে বাবুআনার ধার ধারলেন্ না এবং বাপেরও নামটা রাখ্‌তে পাল্লেন না, পরন্তু হদ্দ মজার রবিবার শব্দেরও ভাবার্থ বুঝতে পারেন নাই।

বাবু। ওহে! হদ্দ মজার রবিবার কাহাকে বলে ও কি কল্লেই বা বাপের নাম রক্ষা কর্ত্তে পাবা যায় এবং সহুরের বাবুআনাটাই বা কি, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমি তদনুরূপ কার্য্যের দ্বারা ত্বদীয় মনোভীষ্ট সংসাধনে যত্নবান্ হইতে পারি।

মস্তরাম। মশায় বুঝি থুতু দিয়ে ছাতু ভিজিয়ে খাবেন? অগ্রে আমাকে মালটাল খাইয়ে চুরচুড়ে করে তুলুন, তবেত মন খুল্‌বে।

বাবু। (একটা খাঁটি ধানেশ্বরী প্রদান করিয়া) ওহে! এবার তো মন খুল্‌বে।

মস্তরাম। (মদ্য পান করিতে করিতে) হাঁ, এতক্ষণের পর মনটা কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হলো বটে। (পরিধেয় বসন মস্তকে বন্ধন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে গীত)

রাগ রাবণ। তাল রাম।

হায়! রে মজার রবিবার। ছেড়ে বুড়ো মাগি মদ্দ লুটতে হদ্দ মজার তার।। মদ্য পানে মত্ত হয়ে, বাবুরা বিবী লয়ে, ক্রমে ক্রমে যাচ্ছেন বোয়ে, বিবর্ণ সুবর্ণাকার। পরিবারে দিয়ে ফাঁকি, বাস্তুভিটে বাঁধা রাখি। প্রেমদা প্রেমের পাখি, হচ্চে যত কুলাঙ্গার।।

বাবু। (গীত শুনিয়া বিমোহিতচিত্তে) মস্তরাম! য়্যাদ্দিনের পব তুমি এক জন

বিষ্ণুর মধ্যে গণ্য হয়েচ বটে, এক্ষণে হদ্দ মজার রবিবার বর্ণন পূর্ব্বক আমাকে পরিবাধিত কর, আমি প্রত্যহই তোমাকে এক একটা খাঁটি ধানেশ্বরী প্রদান করিব।

মস্তরাম। যে আজ্ঞে মশায়! শেষ যেন বিয়ে ফুরুলে ছালনায় লাথি মারার গোচ না হয়।

পদ্য।

ধন্য কল্কেতা সহর ধন্য রবিবার।
ধন্য ধন্য সোণাগাজি ধন্য শোভা তার।।
বিবীদের ঘরে নিত্য মহোৎসব হয়।
কি কব তাহার ঘটা কথনীয় নয়।।
কল্পতরু পল্লী ইহা পুণ্যময়ী স্থান।
দেবলোকে দীপ্যমান সদা যশমান।।
গৌরবের সৌরভের মনোহর বাস।
মানস উদাস করে মানস উদাস।।
বিশেষতঃ শনিবারে বড় সন্ধিক্ষণ।
আমোদের নদনদী বহে অগণন।।
মহাসমারোহ হয় সকলের ঘরে।
নৃত্য গীত নানাবিধ চিত্ত তায় হরে।।
বিবিধ বাজনা বাজে মন্দিরা সহিত।
আহা! তার তালে মুনি মন বিমোহিত।।
যে বলে অমরাপুরী চারু শোভা ধরে।
দেখুক্ সে আঁখি মেলি এ পল্লী ভিতরে।।
যে বলে দামিনী খেলা গগনেই হয়।
দেখুক যে একবার স্বর্ণপল্লীময়।।
যে বলে অপ্সরী রূপ বন অপরূপ।

দেখুক্ সে এ পাঠের বিবীদের রূপ।।
যে বলে স্ত্রীক্ষেত্র তীর্থে সর্ব্ব পাপ হরে।
দেখুক্ সে এক দণ্ড হেথা বাস করে।।
যে বলে কলিতে গঙ্গা ত্রিতাপ নাশিনী।
সেতো কভা নাহি জানে ইহার কাহিনী।।
শান্তিপুর খরদহে যে বলে শ্রীপাঠ।
দেখুক্ সে একবার এ পাঠের নাট।।
গোস্বামীর পূর্ব্বে আছে তিথী পক্ষ বার।
এ পাঠের বার নাই অবারিত দ্বার।।
পরম পবিত্র এই পল্লী মনোহর।
দরশন আশে আসে দেবাদি কিন্নর।।
শনিবারে সদাশিব ত্যজিয়া কৈলাস।
এখানে আসিয়া সুখে করেন বিলাস।।
সুরসিক কৃষ্ণচন্দ্র ত্যাজি বৃন্দাবন।
নিত্য হেথা অবতীর্ণ লীলার কারণ।।
এমন দুর্ল্লভ স্থান কোনখানে নাই।
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি হাতে হাতে পাই।।
সহরের বাবু যাঁরা তাঁরা পুণ্যবান।
মধুবার শনিবার সুখেতে কাটান।।
সেরি চেরি ব্র্যাণ্ডি রমে রমারম হয়ে।
করেন কতই মজা বিবীর আলয়ে।।
সপ্তাহের শোধ এক শনিবারে লন।
সদয় হৃদয় তাঁরা নিদয় ত নন।।
পর দিন প্রাতে উঠি লয়ে বরাননে।
উদ্যানে করেন গতি বন্ধুগণ সনে।।
আমোদ প্রমোদ তথা নানা রূপ হয়।
বিস্তার বর্ণন তার যুক্তি যুক্ত নয়।।

অতএব সাবধানে শুন মহাজন।
কিঞ্চিৎ বর্ণনে তার হইয়াছে মন।।
যাহারা প্রসিদ্ধ বাবু সুরসিক জন।
রতি মহোৎসবে মাতি ব্যয় করে ধন।।
মদ্য মাংস নানাবিধ রকমারি সনে।
একে একে চলে গেল নানা আলাপনে।।
পরিশেষে সকলেই মাতিয়া নেশায়।
যেখানে সেখানে পড়ি আয়েসে ঘুমায়।।
এদিকে আনন্দে মাতি কুকুর শেয়াল।
চুম্বিয়ে চুম্বিয়ে সবে করে দেয় লাল।।
কোন কোন বড় বাবু বিবীকে লইয়ে।
করেন বিবিধ মজা মদেতে মাতিয়ে।।
মধ্যবিৎ বাবু যারা সুরসিক অতি।
রবিবারে তাহারাই ভুঞ্জে নানা রতি।।
কিছুতেই অপ্রতুল তাদের না হয়।
গা মতন নেশা করে নানা মজা লয়।।
বড় সুরসিক তারা বড় সুরসিক।
রসনার রসে সবে করয়ে বেঠিক।।
দম দিয়ে অবলার হয়ে মনোচোর।
চিত্ত সুখে নিত্য নিত্য নিশী করে ভোর।।
বিশেষতঃ শনিবারে কুঠি হতে আসি।
মদে ভাতে খেয়ে মজা লুটে রাশি রাশি।।
অতঃপর সুখে করি শর্ব্বরী যাপন।
পরদিন কালীঘাটে করেন গমন।।
সেখানেও রকমারি চলে নানা মত।
মদ্য মাংস গাঁজা গুলি যেবা যাহে রত।।
কেহবা বিবীর সহ গঙ্গা পারে গিয়ে।

করয়ে দার্জ্জির নেশা উদর পূরিয়ে।।
প্রত্যাগত কালে পথে হয়ে ভিস্তী প্রায়।
থেকে থেকে বেঁকে বেঁকে সলিল ছিটায়।
হেন রূপে সহরের যত বাবুগণ।
সাধ্য অনুসারে করে বাসনা পূরণ।।
নাম-মাত্র বাবু যারা সহর ভিতরে।
অথচ অশেষ মজা ধন বলে করে।।
তাঁহাদের ব্যবহার অতি চমৎকার।
হদ্দ মজা করে তারা পেয়ে রবিবার।।
শনিবারে মধুপান প্রাণ ভরে করি।
বঞ্চিয়াছিলেন সুখে সাধের শর্ব্বরী।।
রবিবারে খোঁয়ারির তেজ অতিশয়।
পিপাসায় ফাটে ছাতি হেচ্‌কি উঠয়।।
ঘন ঘন জল পান করিতে বাসনা।
অথচ সে জলে কিন্তু পিপাসা যায় না।।
অগত্যা আনায়ে মদ সেই বাবুগণ।
পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা করে আরম্ভন।।
এক পাত্র দুই পাত্র ক্রমে যত খান।
মনে মনে নানাবিধ মনোকলা খান।।
ক্রমে ক্রমে নেশা যত সুপ্রবল হয়।
ততই আনন্দ বাড়ে নানা কথা কয়।।
সহসা খুলিয়া যায় মনের দুয়ার।
উথলিয়া উঠে তাহে সুখ পারাবার।।
কুতর্কের ঝড় ক্রমে হয় প্রবাহিত।
বাসনার ঢেউ তায় উঠে বিপরীত।।
তখন ভদ্রতা তরী করে টলমল।
লজ্জা রূপ নাবিকের চক্ষে পড়ে জল।।

পরিশেষে প্রাণভয়ে তরী পরিহরি।
অকূলে পড়িয়া বলে শ্রীহরি শ্রীহরি।।
তখন বাবুরা ঠিক ধর্ম্ম ষাঁড় প্রায়।
শিঙ্ নাড়া দিয়ে সবে গুঁতিয়ে বেড়ায়।।
এ বাড়ী ও বাড়ী ঢুকে করে মহাসোর।
কেহ বলে বিধুমুখী ওপেনদি ডোর।।
কেহ বলে কোথা ওহে কমলিনী প্রাণ।
মাথা খাও কথা কও ত্যজ অভিমান।।
কেহ বলে কোথা প্রিয়ে! ও গোলাপমণি।
কিস্ দিয়ে পিস কর সুচারু লোচনী।।
নলনা ছলনা তব ভাল না দেখায়।
অরসিক লোক আমি মুতে দিই তায়।।
গিয়াছে যৌবন তব নাহি শোভা ছাঁদ।
আছয়ে সম্বল মাত্র বেজীমারা ফাঁদ।।
সুচতুর বেজী আমি সুচতুর জানি।
ধরি যদি মাছ তবু নাহি ছুঁই পানী।।
কেহ বলে কোথা প্রিয়ে কুসুম কুমারী।
দ্বারে দাঁড়াইলে তব বিপীন বিহারী।।
কেহ বলে গুণমণি! কি কর শুইয়ে।
কতক্ষণ দ্বারে প্রিয়ে রব দাঁড়াইয়ে।।
কৃপা করি প্রাণেশ্বরি! উঠ ত্বরাকরি।
দারুণ বিচ্ছেদ বাণে উহু মরি! মরি!।।
কেহ বলে কেন প্রাণ রাম হলে দীনে।
আশা করে আসিয়াছি আজ আমি দিনে।।
কেহ বলে ওরে মণি একি আচরণ।
দিনে রাতে ফিরে কত যাব যাদুধন।।
কেহ বলে ওরে বাবা পেশা যাদুমণি।

শুনিতে এসেছি তোর সুধামাখা ধ্বনি।।
আশার আশ্রিত আমি তোমার অধীন।
কৃপা করি এ দীনে কি নাহি দিবে দিন?।
প্রতিদিন আমি আমি সুদিন ভাবিয়ে।
ফিরাইয়ে দাও তুমি চরণে ঠেলিয়ে।।
অদ্য প্রিয়ে! রবিবার খোঁয়ারির মুখ।
ফিরিবার ধন নহি পেয়ে এত দুঃখ।।
কেহ বলে কেন রাধে করিয়াছ মান?।
শনিবারে হয়েছেত সুখে অবসান।।
অদ্য প্রিয়ে! রবিবার চূড়ামণি যোগ।
স্নান করি সীতাকুণ্ডে মুক্তি হবে ভোগ।।
তুমি রাধে আমি শ্যাম একই জীবন।
মিছে মানে মান কেন করিবে ভুঞ্জন?।।
কেহ বলে নিস্তারিণী বিশ্বাস নাশিনী।
সাপিনী কামিনী তুই সাপিনী কামিনী।।
এইরূপে সহরের যত ষণ্ডাদল।
সুরা মাতি মাতামাতি করয়ে কেবল।।
সুরাদেবী তাহাদের মাথাটী খাইয়ে।
রেখেছেন রঙ হেতু সঙ্ সাজাইয়ে।।
বারণ না মানে এরা বিশাল বারণ।
হিতে করে বিপরীত অধার্ম্মাচরণ।।
ধৈর্য্যতা অঙ্কুশ যাতে ধৈর্য্যে নাহি হয়।
পাপ রূপ পঙ্ক নদে সদা পড়ে রয়।।
লঘু গুরু বোধাবোধ কিছু মাত্র নাই।
অজা সম মজা লুটে এমনি বালাই।।
খলতা-কাননে সদা করয়ে ভ্রমণ।
মিথ্যারূপ অলঙ্কার অঙ্গ আভরণ।।

জুয়াচুরি বিদ্যা প্রতি যত্ন অতিশয়।
সত্য সুধাপানে কভু ইচ্ছা নাহি হয়।।
বড় দুরাচার এরা বড় দুরাচার।
সদা কদাচার করে সদা কদাচার।।
সতের মতের পথে কভু নাহি চলে।
সুসার সংসার এরা ভাসায়েছে জলে।।
শ্রীমতীর পাদপদ্মে সমর্পিয়া মন।
অবিরত করে সবে অবৈধাচরণ।।
দেশাচার কুলাচার কেহ নাহি মানে।
ম্লেচ্ছাচার শীলে সদা শ্রদ্ধা অস্ত্র শানে।।
দেবদেবী ব্রাহ্মণের পদে নাহি মতি।
রতি মহোৎসবে কিন্তু অচলা ভকতি।।
বিশেষ সুরার প্রেমে মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
সুরা ব্রহ্ম সুরা ধর্ম্ম জীবন যৌবন।।
শুনিলে সুরার নাম রক্ষা নাহি আর।
দিশেহারা হয়ে সবে লয় তার তার।।
সদ সদ বিবেচনা নাহি থাকে তায়।
দ্বারে দ্বারে বারে বারে জুতালাথি খায়।।
কভু বা খানায় পড়ি পাঁকাদি মাখিয়ে।
ছুঁচারে শিকার করে আনন্দে মাতিয়ে।।
এইরূপে সহরের যত বাবুগণ।
রবিবারে স্বস্ব ইচ্ছা করয়ে পূরণ।।
কেমন কালের ধর্ম্ম মর্ম্ম বুঝা ভার।
সকলেই করিতেছে সদা কদাচার।।
সদাচার ব্রতে কেহ ব্রতী নাহি হন।
অথচ দেশের হিতে সকলের মন।।
ভুলিয়ে অফিস কার্য্য রবিবার পেয়ে।

নানাবিধ রঙ্ করে চতুরঙ্ খেয়ে।।
এদিকেতে রবিবার হল পরিশেষ।
চুকে গেল বাবুদের অশেষ আয়েস।।
তাড়াতাড়ি ধড়াচূড়া পরিধান করি।
অফিসেতে যান সবে স্মরিয়ে শ্রীহরি।
বেতন কর্ত্তন ভয়ে না করে আহার!
দ্বিজ কয় কি মজার হদ্দ রবিবার।।

শুনেছ?

হনুমানের বস্ত্রহরণ!!

একটী উপকথা মাত্র।

অজ্ঞতা কুসংস্কার প্রবল যাহার।
নিয়ত উথলে তার দুঃখ পারাবার।।

হিতৈষী জানায়ে লোক করিতেছ ছল।
আকাশে চরিল মীন ত্যজিয়া কমল!!

কলিকাতা।

সাহসযন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭০।

মূল্য /১০ আনা মাত্র।

[1863]

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই, যে, এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি যে কোন মহাশয়ের হস্তগত হইবে তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার শেষ পংক্তিটি পর্য্যন্ত পাঠ করেন অন্যথা আমার অভিপ্রায় ভাল কি মন্দ তিনি কখনই জানিতে পারিবেন না।

কলিকাতা
১২৭০ সাল
২০ আষাঢ়

শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী।

শুনেছ?

হনুমানের বস্ত্রহরণ!!

একটী উপকথা মাত্র।

প্রথম সন্ধি।

বর্দ্ধমানের অন্তঃবর্ত্তী একগ্রামে গবাসুর নামে কোন ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন; তাঁহাকে দেখিতে খর্ব্বাকার কিন্তু তাঁহার উদরটী একটী ক্ষুদ্র জালার সদৃশ ছিল এবং তাঁহার চেপ্টা নাসিকামূল ভ্রূহীন। নয়নদ্বয় থাকাতে জনরব উঠে যে, পুস্তক ক্রয় করিবার পয়সায় আতসবাজী কিনিয়া পোড়াইতে নাকি তাঁহার কপালে আগুণ লাগিয়াছিল। আর গবাসুরের মাতাও অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন, যেহেতুক ঐ দিবস অবধি পাঠশালায় যাইতে তিনি তাঁহার পুত্রকে নিষেধ করেন, কি জানি যদি আবার পাপ পুস্তক উপলক্ষে সন্তানের শারীরিক কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অতএব গবাসুর যে সরস্বতীর বরপুত্র তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক গবাসুর মহা কুলীন ছিলেন কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ কুলীনের লক্ষণ-কটা তাঁহাতে ছিল না, তা না রহিল বা, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান ফুলের মুখটী— ইহাতেই তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছিল এবং তাহারই দাপটে আচোট মাটি ফাটাইয়া বেড়াইতেন। গবাসুরের এক বিষমুখী নাম্নী স্ত্রী ও চারিটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। বিষমুখির বিষয়ে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে তিনি দেবর্ষি নারদ মুনির ভগিনী, কন্যা চারিটী কনিষ্ঠা হইতে ক্রমান্বয়ে ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বয়োবিশিষ্টা ইহাঁদিগের বিবাহের নিমিত্ত যোগ্য পাত্রাভাবে গবাসুর সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত থাকেন।

একদিন রাত্রিকালে ভোজন করিতে বসিয়া গবাসুর আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে বেশভূষণে ভূষিত দেখিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে "অবিবাহিতা যুবতী কন্যাগণের বেশভূষা করা অতি মন্দ, অতএব পুনশ্চ তোমাকে এরূপ দেখিলে ভাল হইবে না" এতাবৎ শ্রবণে বিষমুখী, যেমন

সর্পের লেজ দৈবাৎ চাপিয়া ধরিলে নেউটিয়া দংশিতে আইসে সেইরূপ গর্জ্জিয়া উঠিয়া গবাসুরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করাতে গবাসুর বলিয়া উঠিলেন "কিও তুমিও যে একেবারে গিয়াছ দেখ্‌তে পাই; মেয়ে ছেলেকে দমন করা কি মা বাপের পক্ষে অন্যায় কায?"

বিষমুখী। এম্নি করে বুঝি দাবন করিতে হয় বিশেষতঃ মেয়ে গুলিনের বয়স হয়েছে, উহাদের বিবাহের চেষ্টা গেল, অন্য কথা গেল, কিনা পরিচ্ছন্ন হইয়া বেড়ায় তাতেও আবার রাগ; দেখে শুনে গা জ্বালা করে।

গবাসুর। আরে মলো আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, রাত্রিদিন কেবল আমি ঐ ভাব্‌চি তা পাত্র না পেলে করি কি; কুল রাখ্‌তে ত হবে?

বিষমুখী। আহা কি ভাব্‌না গো! ভাব্‌না থাকলে আর দুবেলা দুরেক চাউল সেঁটে গাফুলায়ে বেড়াইতে না? ভাব্‌না যা আমার, দেখ দেখি ভেবে২ যার দড়ী পাকিয়ে গেলেম।

গবাসুর। (ক্রোধে) কি আমারই এত বড় পেট, সকলে শুকিয়ে গেলেন আর আমিই ফুলে উঠেছি— সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর এই কথা! আমি চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ না করে যদি গৃহ প্রবেশ করি আমি অব্রাহ্মণ।

বিষমুখী। ইস্‌! বড় রাগ যে দেখ্‌তে পাই— মাথায় কতকটা জল ঢেলে দিব নাকি?

এই কথা বলিবামাত্র গবাসুর গাত্রোত্থান করতঃ বর্হির্বাটীতে আসিয়া একবার ত্বরিতানন্দকে স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ প্রস্থান করিলেন। বিষমুখী তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে যত্ন পাইলেন বটে, কিন্তু সে গবাসুরের ক্রোধবহ্নিকে ঘৃতাহুতির স্বরূপ আরও উদ্দীপিত করিয়াছিল।

পাঠকগণ! এক্ষণে বৃদ্ধাব্রাহ্মণীর নিকটে থাকিয়া কিছুই আমোদ পাইবেন না, চলুন মজার দিগে যাই।

দ্বিতীয় সন্ধি।

"পা টলে২ খানায় পড়ে এত বড় মজা" এই সুর অতি চীৎকার করে ধরিয়া বিহুল সিদ্ধ নামে মাতাল গমন করিতেছে। ঐ চীৎকারে গ্রামস্ত প্রায় সমস্ত লোকেরই নিদ্রা ভঙ্গ হইল;— কেহ উঠিয়া আপনার শস্যাদি অপচয়াশঙ্কায় দ্বারদেশে যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান রহিল, কোন কুলবালা ত্বরান্বিতা হইয়া ঝাঁপের হুড়কা উত্তম রূপে আঁটিয়া দিল, মাতৃ ক্রোড়স্থিত শিশু চমকিয়া উঠিবায় তাহার মাতা ষাট্২ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, ফলতঃ বিহুল-সিদ্ধের গমনেতে গ্রাম মধ্যে সকলেই স্ব২ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এদিগে সিদ্ধ মহাশয় ঐ গান গাহিতে২ মধ্যে২ শৃগাল কুক্কুরের ডাক ডাকিতে২ যাইতেছে ইতোমধ্যে একটা ডোবায় পড়িয়া গেল পড়িবা মাত্রই গোটা দুই শৃগাল বেগে গর্ত্ত হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল। সিদ্ধঠাকুরের নাকি চক্ষুঃদ্বয় প্রায় মুদিত এ নিমিত্ত শৃগাল যে গর্ত্ত হইতে পলাইল তাহা তাহার দর্শন পথে আসিল না কিন্তু তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেক সজ্ঞান থাকায় সে শব্দ শুনিয়া এই স্থির করিল যে, চোরেরা কাহারো সর্ব্বনাশ করিয়া এই নিভৃত স্থানে অপহৃত দ্রব্যসমূহ আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিতে ছিল, আমার আগমনে তাহারা পলাইল, যাহা হউক, এই স্থানে তাহাদের চৌরীকৃত দ্রব্য সমস্ত অবশ্যই আছে, অতএব অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব,—মনে২ এই সিদ্ধান্ত করিয়া ঝোঁকে ঝাঁকে হামাগুড়ি দিয়া গর্ত্তময় হাতড়াইতে লাগিল কিন্তু অভিলাষিত মুদ্রালঙ্কারাদির পরিবর্ত্তে দুইটা নৃমুণ্ড (যাহা ঐ শৃগালেরা ভক্ষণ করিতেছিল) তাহার করতলে ঠেকিলে সে ভয়ে গোঁ২ করিয়া উঠিল কিন্তু তৎক্ষণেই হাস্য করিয়া (মাতলস্য নানাভঙ্গি) নরশিরঃ দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল "বাবা তোমরা কে? কোন ঘর আঁধার করে এসেছ? সত্য বল বাবা! না হলে তোমাদের থানায় নে যাব; (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) বলি এখন যে উত্তর কল্যে না হে! বাবা বুঝেছি; তা বল্যিই ত হয় যে আমরা বেঁচে নাই— তাহালেই ত চুকে যায়, কিন্তু বাবা যখন এ কথাটাও বল্‌তে পাল্যে না আমি যদি যথার্থ বিহুল সিদ্ধ হই তবে তোমাদের বাবা কথা কহাবই; আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কালী মায়ের চেলা এই দেখ শব সাধন করি। এই কথা বলিয়া একটা মুণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া অপরটা হস্তে ধারণ করত, এলুয়া মেলুয়া বকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ছন্দ মিলাইতে নাকি বিহুল সিদ্ধের

বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, এই নিমিত্ত পাঠকগণের গোচরার্থে একটী মন্ত্র নিম্নেলিখিত হইল, যথা—

"কালি করাল ধ্বনি শবমুণ্ড দুটো।
নাহি যদি কথা কয় ঢেঁকী তলে কুটো।।
হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা শীঘ্র লাগ লাগ।
কালীমা তুমি আবার তুলসী বনের বাঘ।।
ত্বং কালী অহং নাস্তিকাস্যেয়ং তরুণী প্রপা।
আপদ উদ্ধারং দেবী সদাশিবশ্চ নন্দিনী।
মহামায়া তুমি আমি একই সমান।
শম্ভু যবে মরে গেল ছুড়িয়া কামান।।
তখন, তারে দিলা বর, কঙ্কালী মা লম্বোদর,
ওঁ হ্রীং ঝং ক্রীং ম্রীং ইত্যাদি অনেক বকিতেছে।

এমন সময়ে সেই যে গবাসুর স্বীয় কলত্রের সহ কলহ করিয়া মহা দেবকে স্মরণ করে কন্যাগণের যোগ্য বর পাত্র অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাটী হইতে বর্হিগত হইয়াছিলেন দৈবাৎ এখন, তিনি ঐ দিগে যাইতেছেন এবং যাইতে২ বিহুল সিদ্ধের বীজোচ্চারণ তাঁহার শ্রবণ গোচর হওয়ায় তিনি শনৈঃ২ ঐ ডোবার নিকটবর্ত্তী হইলেন পরে উকি দিয়া দেখিলেন একটু মনুষ্য তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে। গবাসুর নাকি একটান টেনে যাত্রা করিয়াছেন সুতরাং বিহুল সিদ্ধের প্রলাপ বাক্য সকলকে যথার্থ কালীর স্তোত্র ও বীজ মন্ত্র জ্ঞানে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ স্থির করিলেন এবং নিজ দুহিতা দিগের পাত্রানুসন্ধানের কোন উপায় বিহুল সিদ্ধ হইতেই যে উদ্ভাবিত হইবে (কারণ সিদ্ধ পুরুষের বাক্য অব্যর্থ) ইহা তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীত হইল এবং সেই হেতুক তিনি বিহুল সিদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহাশয় প্রসন্ন হউন", বিহুল সিদ্ধ শুনিতে পাইয়া কহিতেছেন

"কে বাবা 'তুই অন্ধকারে, স্বর্ণলতা প্রতিমারে,
ফলে ঘরে, কে বাবা তুই অন্ধকারে?
কালী মায়ের পায়ে ধরে, রাখে শিব হৃদি পরে,
যত্ন করে, কে বাবা তুই অন্ধকারে?

"স্বর্ণলতা প্রতিমারে, ফেলে ঘরে" এই কথা গুলি শ্রবণ করিয়া গবাসুর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন আহা! সিদ্ধ পুরুষেরা যথার্থই অন্তর্যামী, মহাশয়! আমার স্ত্রীর সহিত সত্যই আমি কলহ করিয়া আসিতেছি কিন্তু সে যাহা হউক আমার কন্যা চারিটীর নিমিত্ত পাত্র অনুসন্ধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

বিহ্বল। পাত্র অনুসন্ধান! কি পাত্র? জলপাত্র না ভোজন পাত্রের জন্য এই অন্ধকারে বেড়াচ্যে; সিদ কাটী আছেত বাবা?

গবাসুর। মহাশয় বঞ্চনা কর্ব্যেন না উপযুক্ত বরপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে মহাশয়কে বলিয়া দিতে হবে, নতুবা আপনকার সাক্ষাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বিহ্বল। তুমি জীয়ন্ত মানুষ মরিবে কেন বাবা? যে শ্যালারা রোজ মরে সেই বেটারা মরুক্।

গবাসুর। মহাশয়! আমি আপনাকে চিনেছি, প্রতারণায় ভুলিব না, এক্ষণে অনুগ্রহ করে বরপাত্র কোথায় পাব তা বলুন।

বিহ্বল। তবে বাবা এই মদনমোহনকে ঘরে লয়ে যাও? সভা উজ্জ্বল জামাই।

পবাসুর। আপনি বিদ্রূপই করুন আর যাহাই করুন আমি ছাড়িব না বরপাত্র কোথায় পাব বলিতেই হবে নতুবা (এক ইষ্টক লইয়া) এই ইটের আঘাতে আমার মাথা চূর্ণ করিয়া প্রাণত্যাগ করি এই দেখুন।

বিহ্বল। একান্তই ছাড়িবে না, তবে যাও এই মাথাটার সঙ্গে যাও, এটা যেখানে থাম্বে সেই স্থানে ভাল করে দেখ্‌বে কোন দিগে ইহার মুখ,— তার পর সেই দিগে যাবে, অবশ্য পাবে। (বলিয়া হস্তস্থিত শবমুণ্ড বেগে ত্যাগ)

গবাসুর। যে আজ্ঞা মহাশয়, পরম উপকৃত হইলাম। (বলিয়া মুণ্ডের পশ্চাৎ ধাবণ)

বিহ্বল। পাপ গেল; বেটার সঙ্গে বকে২ নেশাটাই ছুটে গেল, এখন প্রভাত হলে বাঁচি—এখন কি করি;—এট্টু শুয়ে থাকি—(বলিয়া শয়ন)

পাঠক! ঘুমন্ত মাতালে রং নাই চলুন আর কোথাও যাই।

তৃতীয় সন্ধি।

পূর্ব্বে বাগবাজারে যেমন পক্ষির দল ছিল সেই প্রকারে গবাসুরের বাসস্থান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে একটী গ্রামে তদপেক্ষা বড়২ গেজেল পক্ষীরা বাস করিতেন। তথাকার জমিদার ঐ দেব২ মহাদেবের চেলাদিগের অধিনায়ক ছিলেন, বলিতে কি গেঁজেলরা সদাশিবকে নিবেদন না করে অধিনায়ক লোহিতাক্ষকে (জমিদারের নাম) ভাগাগ্র নিবেদিত করিত। লোহিতাক্ষ যে কেবল গাজাঁতে সুশিক্ষিত ছিলেন এমন নহে কারণ উহার ধূম কেবল মাত্র তাঁহার ফুসফুসে সদত পূর্ণ থাকাতে তাঁহার শিরাস্থ শোণিত রাশিই নির্ম্মল স্রোতে প্রবাহিত হইত কিন্তু সেই রক্ত প্রবাহের যে বোতল পাহাড় হইতে উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ বিরহ এতদ্ভিন্ন অহিফেণ তাঁহার অস্থি স্থিত মজ্জা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক তিনি (যেমন অনেক ধনী সন্তানেরা এক্ষণে করিয়া থাকেন) বালক কালে দুই চারি খান পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রভাবে তাঁহার মনে দেশের কুসংস্কার ও অবনতির বিষয় কখন২ উদিত হইত। একদিন সভাপতি লোহিতাক্ষ সভ্যগণ সমভিব্যহারে নেশা মণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া কুলীন কামিনী গণের দুরবস্থার বিষয় আন্দোলন করিতে ছিলেন কিন্তু ঝোঁকেতে তন্নিরাকরণের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া এই মাত্র স্থির করিলেন যে, কুলীনদিগের কুল গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিলেই উত্তর কালে আর যুবতী স্ত্রী দলের সহিত জীর্ণকায় বৃদ্ধের পরিণয় হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে, অতএব আমাদিগের নিকটস্থ গ্রাম সকলের মধ্যে যে২ ব্যক্তি কুলীনাগ্রগণ্য সেই২ ব্যক্তির ঘরে নীচ কুলোদ্ভব পাত্র যোজন করিতে পারিলেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সভাপতি লোহিতাক্ষ ইহা স্থির করিলে পর তাঁহার প্রধান সহচর অধর্ম্মকেতু তাহাতে অনুমোদন করত সেই ক্ষণেই লোহিতাক্ষের অনুমতি লইয়া একটী পাত্র (কেন না ধর্ম্মের ঘরে কুঠের মত কুলীনের ঘরে মেয়ের অভাব নাই) অনুসন্ধানার্থ কোথায় যে গেলেন দুই তিন দিবস তাহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। লোহিতাক্ষ এক দিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতঃ অধর্ম্ম কেতুর অদর্শন জনিত দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্য২ পক্ষিগণকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইত্যবসরে গবাসুর ঐ স্থানে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে [গবাসুরকে] কোন মঠের প্রধান পক্ষী বিবেচনায় সভাস্থ সকল পক্ষী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানন করিলেন, কেবল

লোহিতাক্ষমাত্র উপবিষ্ট থাকিয়া ইঙ্গিত দ্বারা আসন নির্দ্দেশ করাতে গবাসুর শিষ্টাচার অনন্তর উপবেশন করিলেন। পরে আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসিত হইলে গবাসুর আপনার নাম, ধাম বিশেষতঃ কুলের পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনার ভ্রমণের হেতু আদ্যোপান্ত বিদিত করিলেন তচ্ছ্রবনে লোহিতাক্ষ আপনাদিগের উদ্দেশ্য প্রায়ঃ সিদ্ধ বিবেচনায় পরমানন্দে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন যে, সিদ্ধ পুরুষ দিগের বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না, আর আপনিও যখন সেই মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এখান পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন তখন আপনকার বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ অদূরবর্ত্তী হইয়াছে, যে হেতুক আমার প্রিয় পাত্র অধর্ম্মকেতু অদ্য দুই তিন দিবস অনুপস্থিত; তিনি অনেক বার আমাকে তাঁহার দেশস্থ একটী কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই আনিবার সংকল্প করিয়া দুই তিন দিবস হইল গমন করিয়াছেন। যদি বলেন কুলীন পাত্র আনয়নে আমার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই সৎপাত্র অভাবে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, প্রতারক ঘটকের কুহকে পতিত হইয়া পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিয়াছেন—একারণ আমার জানিত পাত্র দুইচারি জন আমার নিকটে থাকিলে অন্ততঃ এই চতুঃপার্শবর্ত্তী গ্রাম সকলে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব।

গবাসুর। আহা? মহাশয় যথার্থই পরোপকারী। এই পুণ্য বলে আপনকার অক্ষয় সুখ লাভ হইবে,—এই বলিতেছেন, এমন সময়।

রাগিণী যা ইচ্ছা তাই, তাল ঢেঁকুচ্ কুচ্।

"হরি সদয় বুঝি এবে, কুল বালা সবে
মনোমত পাবে বর।
এবরের কুল শীল, যে জানিবে,
কুলীনেরে, নাহি দিবে, কন্যা অতঃপর,"

এই সুর শুনিতে পাইলেন।

অমনি বিদ্যুৎ গমনে লোহিতাক্ষ আড্ডার বাহিরে গিয়া গবাসুরের বৃত্তান্ত অধর্ম্ম কেতুকে সমস্ত বিদিত করিয়া উভয়ে একত্রে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গবাসুর তদ্দর্শনে কহিলেন, আপনি এত ত্রস্ত বাহিরে গেলেন যে!

লোহিতাক্ষ। (হাস্য করিয়া) মহাশয়! কার্য্য সফল। এক্ষণে আমার মিত্র অধর্ম্মকেতু

যা বলেন তা শ্রবণ করুণ।

অধর্ম্ম। কি মহাশয় পাত্রের কথা বলিতেছেন ত? তা আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে হয়! অধর্ম্মকেতু যখন যে কার্য্যে হস্তার্পণ করেছেন তখন তার আর কিছু বাকি রাখেন নাই, ধনে, মানে, কুলে, শীলে তবে কি না এট্টু কুরূপ।

গবাসুর। কুরূপ তা আবার কি? কুল শীল ত ভাল?

অধর্ম্ম। (স্বগত) কুলের আঁঠি আর উপলের শিল (প্রকাশ্যে) সে সব কি আর বলিতে হয়—আর আমরা কিছু ঘটক নহি যে দুপয়সা পাবার প্রত্যাশা করি, কেবল পরদুঃখ কাতর জমীদার মহাশয়ের পরোপকারীতা পরিতৃপ্তির নিমিত্তই এই পরিশ্রম স্বীকার।

গবাসুর। (প্রফুল্লিতান্তঃকরণে) তবে পাত্র আনায়ে শীঘ্র একটা দিন স্থির করে বিবাহ দিলে হয় না?

লোহিতাক্ষ। তার আশ্চর্য্য কি? আর পরশ্বও বিবাহের উত্তম দিন অতএব আপনি উদ্যোগ করুন গে ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে আমরা পাত্র সহিত আপনকার বাটীতে উপস্থিত হইব, এ কথা অন্যথা হবে না।

গবাসুর। মহাশয়ের জয় হউক, আশীর্ব্বাদ করিতেছি চিরজীবী হউন, আহা কি দয়ার শরীর!।

লোহিতাক্ষ। আচ্ছা তবে আপনি আসুন এক্ষণে,—বেলা অধিক হইয়াছে আমাদিগেরও অন্য২ কায কর্ম্ম আছে।

গবাসুর। যাহা ইচ্ছা আপনার—তবে আমি চলিলাম।

লোহিতাক্ষ। আজ্ঞা হাঁ আসুন—(গবাসুরের প্রস্থান) অধর্ম্মকেতু! ওহে ভাই কি রকমটা বল দেখি।

অধর্ম্মকেতু। মহাশয় অনেক কথা. নীচকুলোদ্ভব পাত্র আমি স্থির করেছি, আপনি মনে করিতেছেন, কিন্তু তা নয়। এ তা হতেও অধম; রং-এর কথা ক্রমে বলা যাবে আসুন এখন নেশা টেশা করা যাউক।

লোহিতাক্ষ। অবশ্য২ বাবা তোমায় আজ নেশায় বুঁদ করে দিব। তুমি ভাই বড় পরিশ্রম করেছ।

পাঠকগণ! আপনাদিগকে আড্ডার ভিতর রাখিতে আমার আর ইচ্ছা নাই, কি জানি আপনাদিগের মধ্যে অল্প বয়স্ক যদি কেহ থাকেন, পাছে তিনি সঙ্গে ভিড়ে যান, অতএব উহারা আমোদ ও পরামর্শ করুক আমরা চলুন পলাই।

চতুর্থ সন্ধি।

আইল যামিনী সতী শিরে শশি মণি।
চন্দ্রিকা শুভ্র বসনে পরিধিয়ে ধনী।।
অসংখ্য তারকা লয়ে করি আভরণ!
শোভিলা নবযুবতী সুচারু দর্শন।।
বেশ গৃহে নারী যথা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
দেখেন আপন মুখ নির্ম্মল দর্পণে।।
গতিহীন বায়ু হেতু সুস্থির কমলে।
রজনী দেখিছে মুখ মুকুরের ছলে।।
তাই চাঁদ তারা আদি যত সকলেতে।
শোভা করে মনোহর জলের নীচেতে।।
ক্রমে ক্রমে জীবকুল নিস্তব্ধ হইল।
নিশাচর পক্ষিগণ গান আরম্ভিল।।
প্রস্ফুটিত পুষ্প গন্ধ বাহিত হইল।
দিবসের ক্লেশ যত আনন্দে নাশিল।।
হেন কালে লোহিতাক্ষ বরপাত্র লয়ে।
প্রবেশ করিল দেখ গবাসুরালয়ে।।

পাঠক! বরের চন্দনাক্ত মুখরবিন্দ দৃষ্টি করিয়া গবাসুর পুলোক-পূর্ণান্তঃকরণে লোহিতাক্ষকে সভার সর্ব্বপ্রধান স্থানে বিনয় সম্ভাষণানন্তর বসাইলেন। বর ও বরযাত্রীগণ যথা স্থানে উপবিষ্ট হইলে কন্যাযাত্রীর মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন "এ কেমন বর গো"! অধর্ম্মকেতু বলিলেন "কেন? অল্প বয়ঃক্রম বলিয়া কি ঝোল পলাইল কুলীনের অমন হয় না বটে?"

কন্যাযাত্রী। বলি তা নয়, বরের মাথাটী এত ছোট কেন? আর ওষ্ঠাধর ও নয়নদ্বয় যেন কেমন কেমন ঠেকে!!

অধর্ম্ম। ওহে সকলেই যদি সমান সুশ্রী হইত, তা হলে আর পবনদেবের সন্তান হনুমান হইত না—শুন, স্ত্রী, শ্রী, ধন প্রভৃতি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে—হাত বাড়াইলে কিছু পাইবার যো নাই।

কন্যাযাত্রী। আচ্ছা তাই যেন হলো,—বরটী কথা কহিতেছে না কেন?

অধর্ম্ম। ওহে উহাই ত বরের একটী গুণ, যদিও ঈশ্বর উহাকে সমধিক রূপসম্পন্ন করেন নাই তথাপি লজ্জাশীলতা শিষ্টতা প্রভৃতি বহুগুণে তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে ভেটির টাকার নিমিত্ত বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল, বরযাত্রীগণ বলিতে লাগিল "কুলীনের বর কোনকালে কোথা ভেটি দিয়াছে" কন্যাযাত্রীরা উত্তর করিল "বর যখন এত উত্তম বসন ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, তখন ভেটী না দিলে ছাড়াছাড়ি নাই।" এদিগে অধর্ম্ম কেতুর সহিত যে একজন কন্যাযাত্রী কথা কহিতে ছিল সে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল "অহে এ বরটা বানর হে মনুষ্য নহে!!!" ইহা শুনিয়া মাত্র সকলের- -য়া! সত্য! বল কি! না! প্রভৃতি নানা রবেতে সভা প্রতিধ্বনিতা হইল। গবাসুর ওমনি গললগ্ন কৃতবাসে সর্ব্বসমক্ষে .গুায়মান হইয়া কহিলেন "আপনারা স্থির হউন, ক্ষমা করুন";—ঘটকেতে বর আনে নাই অতুল ধনেশ্বর লোহিতাক্ষ মহাশয়ের করুণা মাত্র! পাঠকগণ! কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে এমন সময় অন্ধ প্রায় হইয়া কার্য্য করেন তাহা আপনাদিগকে বোধ করি আর বিশেষ করিয়া জানাইবার আবশ্যকতা নাই যখন অনেক স্থলে অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত ভণ্ড ঘটকের উপরে তাঁহারা সকল ভার অর্পণ করেন, তখন জমীদার লোহিতাক্ষের উপর গবাসুরের দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক "বানর বানর" এই শব্দ হওয়াতে পক্ষির দল ক্রমেতে পাতলা হইতে লাগিল; বরযাত্রীর ভিড় অল্প হইলে কন্যা যাত্রীরা ক্রমশঃ বরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে একজন গোঁয়ার রকম চটাস শব্দে বরের মস্তকে একটা চপেটাঘাত করাতে অঞ্জনানন্দন যতই গৃহপালিত হউক না কেন, বজ্রসম চড়ে অধীর হইয়া দন্ত কড়মড় করত লম্ফ প্রদান করিয়া পলাইতে যায়,

কিন্তু তখনই অন্য পাঁচ সাত জন শণ্ডাগোচ তাহার বস্ত্রালঙ্কারাদি টানাটানি করিলে হুড়ামুড়িতে সকল গুলিই খসিয়া পড়িল এবং ছিন্ন লাঙ্গুল (বেঁড়ে) হনুমান বহির্গত হইয়া লম্ফ প্রদান করিল। গবাসুর, দূর হইতে জামাতার দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া তন্নিরাকরণ (কারণ এখনও তিনি ল্যাজের দিগ ভাল করে দেখেন নাই) অভিপ্রায়ে যেমন সম্মুখস্থ হইলেন, অমনি রামদাস ঠাস শব্দে একটী চাপড় মারিয়া এক কামড়ে গবাসুরের সেই থেবড়া নাসা ছেদন করত পলায়ন করিল ও গবাসুর ছিন্ন নাসিকার জ্বলনে সমস্ত রাত্রি ছটফট করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! আমাদের দেশের শিল্পীদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ! কিম্বদন্তির অনুগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে যে বানরটা যে যে বস্ত্রালঙ্কার ফেলিয়া যায়, সে সকল গুলিই নূতন রকমের; আপনারা জ্ঞাত আছেন এক শান্তিপুরে তাঁতি বিধবা বিবাহ পেড়ে কাপড় প্রস্তুত করাতে কেমন প্রশংসা ভাজন ও বিখ্যাত হইয়াছে! তৎকালেও নাকি অনেক শিল্পী ঐ প্রকারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং লোহিতাক্ষ পূর্ব্বোক্ত বরের নিমিত্ত উহারই অনেক গুলি ক্রয় করিয়া আনেন যথা "বড়বিয়ে তার দু পায় আলতা" পেড়ে ধূতি, "উরৎ বহে রক্ত পড়ে চোক গেল রে বাপ" পেড়ে উড়ানী, "যমের মায়ের গঙ্গাস্নান" অঙ্কিত উষ্ণীষ, "ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ" এই কায করা কটিভূষণ, "ঘর দেখেনা পরকে বলে। দেখে শুনে অঙ্গ জ্বলে" অঙ্কিত পাদুকা দ্বয় ইত্যাদি কতইবা আর নাম করিব;—কিন্তু যদিও এই সকল বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া শিল্পকরেরা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন তথাপি ঐ সমস্ত যে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী হয় নাই এইটীই অত্যন্ত দুঃখ।

অবশেষে প্রিয় পাঠকগণ! আমি আপনাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে বিদায় হইলাম, যদি বিরক্ত করিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। পুনশ্চ এমন বেশে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব না কারণ ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবনতি, মুদ্রাযন্ত্রের অপমান এবং সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন কোন ফলই ফলে না,—অতএব এমন কর্ম্মে কায কি?